বিমল কর

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা ৯

প্রকাশক : শ্রীফণীভূষণ দেব
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৯

মুদ্রক : শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু
আনন্দ প্রেস এন্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড
পি-২৪৮ সি. আই. টি. স্কীম নং ৬ এম
কলিকাতা ৫৪

প্রচ্ছদ : সমীর সরকার

শ্রীশিশির লাহিড়ী

বন্ধুবরেষু

যদুবংশ

ওরা রাস্তায়। সদরের দরজা আধাআধি ভেজিয়ে রত্না তখনও ওদের দেখছিল। ওরা চারজন; রাস্তার মাঝমধ্যিখানে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে; সাইকেল-গুলো কোমরের কাছে হেলানো। কাছাকাছি কোথাও আলো নেই। ওপাশে কদমতলার দিকে আলো একটা ছিল, ক'দিন ধরে আর জ্বলছে না। চাঁদের আলোয় যতটুকু দেখা যায় ওদের, রত্না দেখছিল।

ফাঁকা সরু গলির মধ্যে এলোমেলো বাতাস রয়েছে বর্ষার। আকাশে ছোট ছোট মেঘ ভেসে যাচ্ছিল বলে চাঁদের আলো কখনও ফুটছে কখনও নিবছে, যেন গলির মাথার ওপর দিয়ে জ্যোৎস্নার বাতি হাতে ঝুলিয়ে কেউ আসা-যাওয়া করছে। রাস্তা বেশ ভিজে, সন্ধ্যের মুখে এক পশলা বৃষ্টি হয়েছিল। ভিজে খোয়ার গন্ধ, কাদার গন্ধ। পেছনের পুকুরভরা পানার জংলা গন্ধও বাতাসে ঘন হয়ে আছে। কান পাতলে ঝিঁঝি আর ব্যাঙের ডাক শোনা যায়। বাদলা, স্যাঁতস্যাঁতানি, গন্ধ, অন্ধকার, চাঁদের আলো, ঝিঁঝির ডাক—সব মিলেমিশে গলিটা কতকালের পুরনো মরা গলির মতন মনে হচ্ছিল।

সদরে দাঁড়িয়ে রত্না রাস্তার চারজনকে খুব পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল না। কদমগাছের একটু আড়াল আছে। আলো ফুটলে চারটি মানুষ এবং তাদের জটলা খানিকটা স্পষ্ট; আলো মরে এলে, ছায়ায়, ওদের অন্য রকম দেখাচ্ছিল. ঠিক যেন অন্ধকারে গলির মাথায় ফেলে-রাখা ধাঙড়-গাড়ি। ওরা রাস্তার মাঝ-মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে কি যে বলাবলি করছে রত্না শুনতে পাচ্ছিল না। না পেলেও বুঝতে পারছিল, রত্নাদের বাড়ির দিকে তাকিয়ে এখনও ওরা গজরাচ্ছে, গালি-গালাজ করছে। গজরাবার কথাই। আজ নিয়ে পর পর তিনদিন ওদের বাড়ির মধ্যে ঢুকতে দেয়নি বড়দি। ফিরিয়ে দিয়েছে। দুদিন বড়দি নিজেই সদরে এসে ওদের আটকে ছিল; আজ রত্নাকে পাঠিয়েছিল : 'যা, বলে আয়, গণনাথ নেই।'

দমকা বাতাসে কদমের পাতা সরসর শব্দ তুলেছে, গলি দিয়ে কে যেন যাচ্ছে, হঠাৎ রত্নার চোখে পড়ল, চারজনের একজন তাদের বাড়ির দিকে আবার এগিয়ে আসছে। বেশ জোরে পা ফেলে ফেলে আসছিল। রত্না তাড়াতাড়ি আধ-ভেজানো দরজা ঝপ করে বন্ধ করে দিল। দিয়ে আগলটা তুলে দু' পা সরে দাঁড়াল। কি হয়, কি করে দেখার অপেক্ষা করল।

সদরে বার কয়েক ধাক্কা পড়ল, তারপর লাথি। শেষে ওপাশ থেকে একটা

গালাগাল শোনা গেল। অনেকক্ষণ আর কোনো সাড়াশব্দ নেই। চলে গেছে তবে।

রঙ্গা আর দাঁড়াল না; সদরের ছিটবিনিটাও এবার তুলে দিল; দিয়ে ভেতরে চলে গেল।

রাস্তায় তিনজন দাঁড়িয়ে ছিল।

বুলালি ফিরে এসে বলল, "হুড়কো দিয়ে ভেগে পড়ল রে!...আচ্ছা শালা, কাল দেখব।"

অভয় বলল, "কি দেখবি, কালকেও একই ধুয়ো গাইবে।"

বুলালি বলল, "ও মেয়েছেলের আঁচলের তলায় শুয়ে আছে মাইরি! আমার বেট্ থাকল। শালা গণাদাটা কাওআর্ড!"

সূর্য বলল, "হারামী!" বলে থামল, পরে আবার বলল,..."...ভাল রামনা পেয়েছে, খুব চরছে। চরুক, আমার টাকা আমি আদায় করে নেব।"

কৃপাময় কিছু বলল না, হাসল।

আর দাঁড়াল না, চারজনেই হাঁটতে লাগল। সাইকেল তিনটে। আজ অভয়ের সাইকেল নেই। সাইকেল ঠেলে নিয়ে ওরা এগুচ্ছিল। গলির এপাশ-ওপাশ বাড়িতে টিমটিমে বাতি জ্বলছে, কেরোসিনের বাতি। পাড়াটা ছোট, বাসিন্দেরাও অতি সাধারণ। দু' পাঁচটা এতকলা পাকাবাড়ি কায়ক্লেশে খাড়া করা, কয়েকটা মাঠকোঠা, বাকি কিছু বস্তি ধরনের বাড়ি। পাড়ার আশেপাশে এখনও ঝোপ-ঝাড়, ডোবা, এবড়ো-খেবড়ো জমি, মরচে-ধরা ভাঙা টিনের বেড়া দেওয়া কাঠ-গুদোম। শহরের বিজলীবাতি গলি পর্যন্ত এসেছে, ঘরদোরে যায়নি। এই কাঁচা রাস্তাতে আলো আসার কথা ছিল না, নিতান্ত সূর্যর বাবা, কামাখ্যাবাবু, মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, ভোটের আগে সদলবলে ডুবতে ডুবতে কথা দিয়েছিলেন, 'রাস্তায় পিচ আর আলো, আর নালি-নর্দমা সাফের ব্যবস্থা করে দেব—', সেই দেওয়া-কথা রাখতে গোটা চারেক ফালতু পুরনো পোস্ট এনে এদিকে বসিয়ে দিয়েছেন; কাঁচা-ব্যবস্থায় ক'টা বাতিও মাথার ওপর ঝোলে। মাসের মধ্যে পাঁচসাত দিন হয়ত দু' একটা বাতি জ্বলে, বাকি জ্বলে না। বিজলী-তারের গোলমালের জন্য যতটা ঠিক ততটা সূর্যর জন্যে নয়। এ-গুলির আলোর ওপর সূর্যর তেমন নজর নেই। সূর্যর হাতের টিপ নিখুঁত. গুলতিতে কাঁচের মার্বেল পুরে নিশানা করে রাস্তার আলো ফাটাতে সে খুব পছন্দ করে। এই শহরের ফাঁকা, নিরিবিলি রাস্তায় একটু রাত করে সূর্য তার দলবল নিয়ে মাঝে মাঝে আলো-ফাটানোর খেলা খেলতে খেলতে ঘুরে বেড়ায়। কখনও কখনও বাজি ধরে : 'কিরে বুলালি, ওই যে—ওই বালবটা, খুব রোশনাই মারছে, নিউ আমদানী—ওটা ঝেড়ে দি?' 'দে...।' 'এক শটে ঝাড়ব। কি খাওয়াবি?' '...ছোট বিবি।' 'যা রে যা। ছোট বিবি! বড় কিছু খাওয়া! বিবি খেতে আর ভাল লাগে না, যা তেতো শালা।' 'পয়সা নেই।' 'দারোগার বাচ্চার

আবার পয়সা কি রে! তুই তো রাজা রে বুলুলি...।...আও মেরে রাজা, রা—জা...।'

গলির রাস্তা প্রায় সবটুকু জুড়ে চার বন্ধু হাঁটছিল। এখনও বেশি রাত হয়নি। বাঁ-হাতি একতলা বাড়িটায় খুব খেলো গোছের একটা রেডিয়ো বাজছিল। বোধহয় ব্যাটারি ফুরিয়ে এসেছে, স্বর মিইয়ে এসেছিল। অভয়ের কানে গানের সুরটা খুব হাস্যকর লাগল। অভয় বলল, "হ্যাঁরে, গান গাওয়ার সময় রেডিয়োতে গলায় কি পুরে দেয় রে?"

"ব্যাম্বু!" বুলুলি জবাব দিল।

কৃপাময় বলল, "শুধু গলায় দেয় নাকি রে...?" সকলে হেসে উঠল। হাসি থামলে কৃপাময় বলল, "আমাদের তুলসীকে জিজ্ঞেস করবি। ও বলতে পারবে।... তুলসীই আমাদের কলকাতা-সংবাদ।"

সূর্য হঠাৎ বলল, "তুলসীটা এবার মরে যাবে।"

"মরে যাবে! কেন?" বুলুলি শুধলো।

"মনে হচ্ছে। কিরকম রঙ হয়ে গেছে গায়ের দেখেছিস? একেবারে মাছের মতন। ব্লাড নেই বেটার।"

"ওর বাবাটা মাইরি সৎ-বাপের মতন।"

"মাইরি! অ্যায়সা বাপ দেখা যায় না।...নিজের ছেলে তোর, তবু..."

"তুলসীর এই মা'র দোষ। নিজের তিনটে। তিনটেই যেন সমুদ্রমন্থন থেকে উঠে এসেছে। কী চেহারা রে! বাপ্।" কৃপাময় বলল।

"সমুদ্র মন্থনটা কি রে কৃপা?...কোন সমুদ্র?"

"ক্ষীর সমুদ্র—!" জবাবটা অভয়ই দিল। দিয়ে হাসল!

"তুলসীর সেই মাকে তোর মনে আছে সূর্য?" কৃপাময় বলল, "ছেলেবেলায় আমরা গিয়ে গোলোকধাম খেলতাম।"

"একটু একটু", সূর্য বলল, "নিজের মাকেই মনে নেই তো তুলসীর মা।"

"গোলোকধামে একটা ঘর ছিল, তেলে-ভাজা ঘর, নরকের সাজা রে, গরম তেলে মানুষ ফেলে দিচ্ছে! সাংঘাতিক ছবি! তুলসীর মা ঝপাঝপ তেলে পড়ত।"

"আর তুই?"

"আমার শালা ডেনজার ছিল শূল।...মাইরি, সেই শূলেই গেঁথে গিয়েছি।" কৃপাময় হাসল।

গলি পেরিয়ে ওরা চওড়া রাস্তায় এসে পড়েছিল। একদিকে চুন সুরকির একটা ঝাপ-ফেলা দোকান, অন্য দিকে হাড়ি কলসি মালসার আড়ত। এখানে দাঁড়িয়ে আকাশ চোখে পড়ে। আর খানিকটা এগুলেই পর পর কয়েকটা দোকান: মুদিখানা, চা-পান, সাইকেল সারাইয়ের। কাদা জমেছে বলে এখানটায় যত রাজ্যের জঞ্জাল, ছাই, ইটের টুকরো, দু' এক আঁটি খড়ও ছড়ানো আছে। ওরা চার বন্ধু পানের দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল। পাশেই লম্বা বেঞ্চিপাতা চায়ের

দোকান। দু' চারজন বসে বসে চা খাচ্ছিল, আর মাছ, চার, ছিপের গল্প করছিল।

সূর্য বলল, "বুলালি, সিগারেট কেন।"

কৃপাময় পানঅলার কাছে জরদা দেওয়া পান চাইল।

পানের দোকানের আলোয় চার বন্ধুকে মোটামুটি দেখা যাচ্ছিল। সূর্যর গায়ের রঙ ফরসা; ও মাথায় বেশ লম্বা, মুখের গড়নও লম্বা ধরনের, চোয়াল শক্ত, হাড় ফুটে না উঠলেও ধারালো ভাবটা চোখে পড়ে। নাক মোটা, কপাল চওড়া। ঠোঁট খুব পুরু। মাথার চুল কোঁকড়ানো। সূর্যর চোখ দুটো সামান্য কটা। চোখের তলায় অস্পষ্ট কালচে দাগ ধরেছে। ওর পরনে খয়েরী রঙের ট্রাউজার্স, কোমরে বেল্ট, গায়ে কালো-লালের ডোরা কাটা মোটা একটা টি শার্ট। বুলালির গড়ন মাঝারি, গায়ের রঙ কালচে। স্বাস্থ্যবান ছেলে, হাত বুক ঘাড়ের পেশী ফুলে আছে। মুখের আদলটা গোলগাল, চোখ খুব ঝকঝকে, দাঁতগুলো নিখুঁত। গালের পাশে বড় একটা আঁচিল। বুলালির পরনেও প্যান্ট শার্ট, ওর গায়ের জামাটা পাতলা, নীলচে ধরনের। বুকের বোতাম খোলা। অভয় ছিপছিপে, চেহারার মধ্যে রুক্ষতাই বেশী, মাথায় বেঁটে, চোখ দুটো হলদেটে; অল্প করে গোঁফ রেখেছে; ঠোঁট চিবুক নাক খুব পরিষ্কার। অভয় পাজামা পাঞ্জাবি পরে ছিল। দলের মধ্যে কৃপাময়কে প্রথম নজরে সামান্য বেমানান লাগে। সূর্যর সমান সমান লম্বা, কিন্তু স্বাস্থ্য তেমন মজবুত নয়, চোখেব দৃষ্টিটাও ময়লা, নাক সামান্য বাঁকা। কৃপাময়ের হাত দুটো যেন অপেক্ষাকৃত লম্বা দেখায়, গলাও লম্বা। সিঁথি রেখে উল্টে চুল আঁচড়ায় কৃপাময়। ধুতির সঙ্গে শার্ট পরে। পায়ে চটি। গলার স্বরটাও ভাঙা ভাঙা। গায়েব রঙ মোটামুটি শ্যামলা।

কৃপাময় হাত বাড়াল। "অ্যাই সুপারি দিয়া কি নেতি দিয়া রে পারোয়াল? সুপারি দো।"

পানঅলা কয়েক কুচি সুপুরি দিল। কৃপাময় সুপুরিব কুচি মুখে ফেলে চিবোতে লাগল। বুলালি সিগাবেট পেয়েছে, সূর্য আর অভয়কে বিলি করে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালল।

কৃপাময় বলল, "কিরে, আমারটা?"

বুলালি বলল, "তুই পান খাবি, সিগারেটও খাবি?" ডবল্ মারবি?"

"পরে খাব, ভাগটা তো দিবি।"

"শালা ভাগের বেলায় ঠিক আছে। পরে নিবি, নে চল।"

পয়সা মিটিয়ে দিয়েছিল বুল্‌লি, কাদা বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে ওরা এগিয়ে চলল।

খানিকটা এগিয়ে ডান হাতি একটু পথ, নালার ওপব কাঠের তক্তা বিছানো, বেশ পিছল হয়ে রয়েছে; নালা পেরিয়ে ওরা বড় রাস্তায় এসে উঠল। পথের দুপাশে গাছ, অনেকটা তফাতে তফাতে বাতি, বাতাসে গাছের পাতায় জমা জল মাঝে মাঝে দু'চার ফোঁটা ঝরে পড়ছে, আকাশে প্রায়-গোল চাঁদ, চাঁদের তলা দিয়ে একটা পাতলা মেঘ সরে যাচ্ছে, মেঘের দু'পাশ কালো, মাঝখানটায় চাঁদের আলো পড়ে নীলচে রেশমের মতন দেখাচ্ছে। পেছনে বড় একটা কালো মেঘ, গায়ে

গায়ে আসছে।

ওরা সাইকেলে উঠল না, হাঁটতে লাগল।

হাঁটতে হাঁটতে অভয় বলল, "গণাদার কাছে তুই টাকা পাবি না, সূর্য।"

"পাব না! কেন?"

"দেবে না।...ঝপ করে তুই টাকাই বা দিতে গেলি কেন?"

"বলল, একটা বিজনেস পার্টি মামলা করার চিঠি দিয়েছে।"

"গুল। তোকে গুল মেরেছে!...কত টাকা দিয়েছিস?"

"পঞ্চাশ।"

"তুইও গুল মারছিস। একবার বলিস চল্লিশ, একবার পঞ্চাশ। প্রথম দিন বলেছিলি ষাট-সত্তর।" অভয় সন্দেহের গলায় বলল।

সূর্য সঙ্গে সঙ্গে কোনো কথা বলল না, পরে বলল, "পঞ্চাশ।"

"ঠিক?" অভয় একটু হেসে ঠাট্টার সুরে জিজ্ঞেস করল, "টাকা সত্যিই দিয়েছিলি তো?" কথাটা বলার পর সামান্য শ্লেষের মতন শোনাল।

সূর্য হঠাৎ চটে উঠল, "আমি শালা লায়ার?"

বুলালি অভয়কে বলল, "তোর খালি খুঁচোনো স্বভাব। পঞ্চাশ দিক ষাট দিক—সেটা কোনো কোশ্চেন নয়। টাকা দিয়েছে।"

সূর্য অভয়কে দেখছিল। বলল, "আলবাত দিয়েছি। তুই দে না, পাঁচটা টাকা দে। ..দেনেঅলা দিল তোদের কত আমার দেখা আছে বে।"

অভয় টিটকিরি মেরে জবাব দিল, "তুই তো দিলবাহার। আমাদের দিল কোত্থেকে থাকবে রে, আমি তো শালা দিলদারের বাচ্চা নই, আমার বাপ বয়লারে কয়লা মারে।"

সূর্য দাঁড়িয়ে পড়ল, পা বাড়িয়ে অন্য তিনজনও থমকে দাঁড়াল।

সূর্য হঠাৎ বলল, "তুই আমার বাপ তুললি?"

"না," অভয় বলল। সে সূর্যকে সতর্ক চোখে দেখছিল।

"আলবাত তুলেছিস।"

"না। আমি তোর বাবার কথা একবারও বলিনি।"

সূর্য এক পা এগিয়ে এল, "আমি শালা বোকা নাকি? কিছুই বুঝি না? তুই কোথায় ঠুকছিস আমি বুঝি না?"

"তুইও ঠুকেছিস।"

কৃপাময় দুজনের মাঝামাঝি এসে পড়ল। এখুনি একটা হাতাহাতি লেগে যেতে পারে। কৃপাময় সূর্যকে ঠেলে দিল, বলল, "কি হচ্ছে তোদের! লড়ে যাবি নাকি?...শালা যত দামড়া হচ্ছিস তত ছেলেমানুষি বাড়ছে। নে চল্...."

বুলালি হাত ধরে টানল অভয়ের। "তোকেও বলি, তুই শালা খচড়া। ফালতু কাঠিবাজি করবি। ওর টাকাটা গচ্চা গেল আর তুইও সমানে খোঁচাচ্ছিস।...মামলা খতম কর। চল্...চল্।"

অভয় বলল, "ও কথায় কথায় এত গরম হয় কেন?"

সূর্য জবাব দিল, "তুই আমায় ইনসাল্ট করবি আর আমি জল হয়ে থাকব।"

কৃপাময় সাইকেলের সামনের চাকাটা সূর্যর সাইকেলের মুখে মুখে রেখে-ছিল, এবার আস্তে করে ধাক্কা মারল, বলল, "তোর একটু গরমীর ধাত আছে, সূর্য।...থাক্, এখন চল্।...ঝপ্ করে আবার বৃষ্টি এসে পড়বে।"

আর কোনো কথাবার্তা হল না। সূর্য সাইকেলে চাপল, কৃপাময়ও এগিয়ে গেল, বুলালির সাইকেলের পেছনে পেছনে কয়েক পা হেঁটে অভয়ও ক্যারিয়ারে উঠে বসল।

এদিকে রাস্তা এখনও অনেকটা ফাঁকা, নিরিবিলি। শহরের এই প্রান্তটা উত্তরের একেবারে শেষাশেষি। সবে গড়ে উঠতে শুরু করেছে। পুব পশ্চিম দক্ষিণে আর তেমন বাড়বার জায়গা নেই, ঠাসাঠাসি গাদাগাদি হয়ে গেছে। উত্তরের দিকটায় এতদিন বড় নজর ছিল না, কারণ এ শহরের ধাঁচটাই পুব-হেলা, যত কিছু নিত্য প্রয়োজনের বস্তু সমস্তই পুব আর দক্ষিণ ঘেঁষে। রেল স্টেশন, অফিস, বাজার, ডাকঘর, সিনেমা, স্কুল, এমন কি নতুন কলেজটাও হয়েছে দক্ষিণ ঘেঁষেই। তিনদিকে যতটা সম্ভব জল গড়িয়ে যাবার পর যেন বাকিটা এবার উত্তরের দিকে আস্তে আস্তে গড়িয়ে আসতে শুরু হয়েছে। বাড়ছেও বেশ তাড়া তাড়ি এই অঞ্চলটা, তবু এখনও অনেক ফাঁকা, নিরিবিলি।

সাইকেলে যেতে যেতে সূর্য কি ভেবে একসময় বলল, "তুই জানিস না কৃপা, আমি বাড়ির একটা জিনিস ঝেড়ে দিয়েছি। তার কত দাম আমি জানি না। অনেক হবে। জিনিসটা গণাদার হাতে দিয়ে বলেছিলাম, বেচে দিয়ে টাকাটা নিয়ে নিতে' আমি তখন ওন্লি ফিফটিন্ রুপিজ চেয়েছিলাম। গণাদা আমায় টেন্ দিয়েছে। বলল, ষাট টাকা পেয়েছিল। আগে বলেছিল পঁচাত্তর একশো পাবে।...কি পেয়েছে গণাদা, কে জানে শালা!"

কৃপাময় শুধলো, "কি জিনিস মেরে দিয়েছিস?"

"সে আছে।" সূর্য নাম বলল না।

"গয়না?"

"না, গয়না নয়।"

"তবে?"

সূর্য কোনো জবাব দিল না প্রথমটায়; পরে বলল, "পুরনো জিনিস একটা। ফালতু পড়ে ছিল। পড়ে থেকে কি লাভ!...তবে, বুঝলি কৃপা, বাজারে এখনও পুরনো জিনিসের দাম দেয়।" বলে থামল, তারপর রুক্ষ রাগের গলায় আবার বলল, "গণাদা ওপর থেকেও কিছু ঝেড়েছে। শালা হারামী। এখন এটা ওটা কোনোটাই দিচ্ছে না। আমি শালা অত টাকা ওকে দান করেছি নাকি!"

দেখতে দেখতে ওরা অনেকটা চলে এসেছিল। সাইকেলে ওদের আলো নেই, রাস্তার আলোও অনেকটা তফাত তফাত, জ্যোৎস্নাও মেঘে ঢাকা ছিল, তবু

ওরা বেশ জোরেই সাইকেল চালিয়ে শহরের মাঝখানে এসে পড়ল প্রায়। পিচের রাস্তা ভিজে, সাইকেলের চাকায় জল-চাপা শব্দ উঠছিল। দু-চারটে জীপ, প্রাইভেট গাড়ি আলোর ঝলক মেরে ওদের পাশ কাটিয়ে চলে গেছে, পাতলা আঁশের মতন একটু বৃষ্টিও উড়ে উড়ে গায়ে লেগেছিল—ওরা কোনো কিছুই গ্রাহ্য করেনি। শহরের মাঝামাঝি এসে পড়তেই এতক্ষণের নিরিবিলি ভাবটা কেটে গেল; ক্রমশই একটা গুঞ্জন স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। ডান দিকে পেট্রল পাম্প, বাঁ দিকে অগ্রবাল কোম্পানীর মস্ত গ্যারেজ। ভিজে টিনের ওপর চাঁদের আলো পড়ে নদীর জলের মতন চিকচিক করছে। মোবিলের একটা বিজ্ঞাপনের তলায় বাতি জ্বলছে গ্যারেজের, ভেতরে কাজ হচ্ছে এখনও। রাস্তার বাতিগুলো এবার ঘন হয়ে আসছে। সামান্য তফাতেই 'পারিজাত' সিনেমা, সিনেমার সামনের জমিতে একটা বাঁধানো ফোয়ারা, এক সময় জল পড়ত, এখন পড়ে না। কাছা-কাছি কয়েকটা সাইকেল রিকশা। পান, চা-সরবত, খাবারের দোকান পাশে পাশে। বাচ্চা মতন একটা ছেলে সিনেমার সামনে ফুলের মালা বেচছিল।

বুললি বলল, "পারিজাতের মালিকটা ফেঁসে গেছে, জানিস?"

"কিসে?" কেরিয়ারের পেছন থেকে অভয় জিজ্ঞেস করল।

"সেই যে অ্যাকসিডেন্টে।...আরে, ক'দিন আগে ব্রিজের তলায় রাত্রে একটা হিন্দুস্থানী মেয়ে চাপা পড়ে মরল না, সেই কেসে। শালা গাড়ি নিয়ে কেটে পড়েছিল। ধরা পড়ে গেছে।"

"তোর বাবার কাছে শুনলি?"

"শুনিনি; আমি সাসপেক্ট করছি।. ক'দিন ধরে বেটা খুব বাবার কাছে যাচ্ছে। না ফাঁসলে বাবার কাছে কে যায় রে!...আজ মাকে বাবা অ্যাকসিডেন্টের কথা বলছিল। দু-একটা কথা কানে গেছে। পারিজাতটা ফেঁসেছে।"

"ও ফাঁসবে না, গলে যাবে।"

"পয়সার জন্যে বলছিস?"

অভয় কোনো জবাব দিল না কথার। বলতে পারল না, ফাঁসা মালটাই তোর বাবার হাতে পাঁচ সাতশো গুঁজে দিয়ে গলে যাবে, শালা। একটু আগেই বাপ তোলা নিয়ে সূর্যর সঙ্গে কথা কাটাকাটির পর এখন আবার বাপটাপ নিয়ে কথা বলতে তার ইচ্ছে হল না, সাহস হল না। সূর্য সম্পর্কে তার বিরক্তিটা এখনও প্রবল রয়েছে।

বুললি কি ভেবে বলল, "শুধু পয়সায় হয় না। লোকটার খুব হাত আছে। ওর খাতিরের মাল কত আছে জানিস?"

"দেখেছি। ড্রীমে যায়।"

"চল, আমরাও একদিন যাই। বার-টা ফার্স্ট ক্লাশ করেছে।"

"পয়সা কোথায়?"

"একদিন পয়সা হয়ে যায়। ঝামেলা অন্য জায়গায়। আমরা গেলেই চিনে ফেলবে। চেনা লোক বহুত যায়।...তোর আমার বাবা দাদারা।...একদিন আমি

মাইরি, তোদের বলেছি না, কলেজের সেই ইংলিশ প্রফেসার, কি যেন, টি বি— তড়িৎ ব্যানার্জীকেও দেখেছি। মাল খেয়ে লাট্টু হয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে রিকশা ডাকছে।"

কলেজের কথায় অভয় কিছু বলল না। বুলালি কলেজে পড়েনি। তিন চার বারে স্কুল ডিঙিয়েছে। স্কুলে থাকতেই অভয়দের সঙ্গে কলেজে গিয়ে আড্ডা মারত। কলেজটা তখন সবে নতুন। অভয় বছর দেড়েক পর্যন্ত কলেজে যেত-টেত, তারপর আর নয়। কৃপাময় শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা দিয়েছিল, পাশ করতে পারেনি। সূর্যও মাস কয়েক বাইরের কোথায় টেকনিক্যাল পড়তে গিয়েছিল। মাল ফেরত এসেছে। ওদের মধ্যে তুলসীই লেখাপড়ায় মোটামুটি ভাল ছিল। বি এস-সি পাশ করেছিল। এম এস-সি পড়তে কলকাতায় গিয়েছিল। পড়া হয়নি।

তুলসীর কি অসুখ? কবে অসুখ করল? আজকাল তুলসীর সঙ্গে দেখাই হয় না। একদিন যেতে হবে। তুলসীটা আজকাল বাড়িটাড়ি ছেড়ে দিয়েছে, আলাদা থাকে, তাও আবার বেপাড়ায়।

অভয় বলল, "বুলালি, কাল তুলসীর কাছে যাবি?"

"তুলসীর কাছে! কালই?"

"চল একবার যাই। শালা মরে যাবে শুনছি .."

"সব শালাই মরবে বে।...আমরাও মরব। মরাফরা কিছু না. .চল্ যাব কাল। তুলসীর বাড়িটা তুই চিনিস?"

"চিনি।"

শহরের মাঝখানে এসে পড়ল ওরা। বাস স্ট্যান্ড, স্টেশনের রাস্তা, বাজার গাড়ি-ঘোড়া, লোক, এম্পায়ার সিনেমা, আলো, গাড়ির হর্ন—সব যেন চারপাশ থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে। এতক্ষণ মনে হচ্ছিল যেন কত রাত হয়ে গেছে, বাজারে এসে রাতের ভাবটা কেটে গেল। আলোয় জ্যোৎস্না ঢেকে গেছে। নিয়নের আলো জ্বলছে, বিজ্ঞাপন জ্বলছে নিবছে, দোকানের নাম দপদপ করছে, গা বাঁচিয়ে গাড়ি চলে যাচ্ছে হর্ন দিয়ে, রিকশাঅলারা লোক ডাকছে চক্কর মেরে। বর্ষার ভিজে গন্ধের সঙ্গে বাজারের নালার গন্ধ উঠছিল। পাশের দোকানে গল। ফাটানো গান আর বাজনা বাজছে রেডিয়োয়। মাথার কাপড় নামিয়ে কৃপাময়দের পাড়ার একটা মেয়ে চলে গেল রিকশায়, পাশে তার বর। বিয়ে হয়েছে নতুন, মাসখানেক হল। সাজের কোথাও কমতি নেই। হয়ত বাজারে এসেছিল, হাতে মিষ্টির বাক্স। কারখানার কোন সাহেবের গাড়ি আটকে গেছে রাস্তায়, সাহেব মুটে ডাকছে ঠেলবার জন্যে, বাঙালী মেমসাহেব জানলা দিয়ে গলা বাড়িয়ে নাকে রুমাল দিয়ে মস্ত একটা ষাঁড় দেখছে। দুটো লোক মুখোমুখি সাইকেলে ধাক্কা লাগিয়ে ঝগড়া করছিল। পোস্টাফিসের সামনে রাস্তার পাশ ঘেঁষে তিনটি মেয়ে যাচ্ছিল, মাথায় ছাতা, সূর্য তাদের পাশ দিয়ে যেতে যেতে লম্বা একটা শিস

দিল। কৃপাময় তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। মেয়েরা দাঁড়াল না, চকিতের জন্য মুখ উঠিয়ে দেখল একবার। বাজারের মধ্যে কোনো গলির মুখে ব্যান্ড বাজছে। কোন্ গলি বোঝা গেল না। কোনো মারোয়াড়ী বাড়িতে বিয়েথার ব্যাপার চলছে হয়ত। সূর্যরা আর একটু পথ এগুতেই ডানদিকের হুমড়ি খেয়ে পড়া একটা রাস্তা থেকে পর পর গোটা চারেক ট্যাক্সি এসে সদর রাস্তায় পড়ল, দেখতে দেখতে অনেক দূরে চলে গেল, আবার এল দু-তিনটে, পেছনে রিকশার ভেঁপু বাজছে, একপাল সাইকেল রিকশা 'রেস' মারতে মারতে আসছে। তার মানে এক্সপ্রেস গাড়িটা এসে গেছে, স্টেশন থেকে সওয়ারী উঠিয়ে সব এখন ছুটছে।

ধীরে-ধীরে মাঝ-শহরটা আবার পিছিয়ে পড়ছিল। বাজার শেষ। ডান দিকে রেল অফিসের মাঠ, রেল কলোনীর দোতলা বাড়ি, বাঁ দিকে কয়েকটা ঝলমলে দোকান, তারই পাশে 'দি ড্রীম'—এই শহরের হাল আমলের বার। নীলচে টিউববাতিতে বাঁকা অক্ষরে লেখা 'দি ড্রীম', সামনে সামান্য সাফসুফ জমি, দু-চারটে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। দোতলার ব্যালকনিতে ফুলের টব আর ক্রীপার।

সূর্যরা বাঁ দিকের পথ ধরল। পেছনে তাকালে এখন শহরটাকে ছিঁড়ে যাওয়া আলোর মালার মতন মনে হয়, চারপাশে যেন ছত্রাকার হয়ে ছিঁড়ে পড়ছে। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি নেমেছে আবার। বৃষ্টির মধ্য দিয়ে রাস্তার আলো-গুলোকে আবছা দেখাচ্ছে, শন শন বাতাস দিচ্ছে, ঠাণ্ডা বাতাস, চাঁদের কলঙ্কের মতন একটা গোল দাগ ধরে শহরটা হঠাৎ অন্ধকারে হারিয়ে গেল। সূর্যরা বাঁ হাতি পথে অনেকটা চলে গেছে।

ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যে সূর্যরা চার বন্ধু এসে মতিলালের দোকানে উঠল। ভেজানো দরজা দিয়েও খানিকটা হল্লা আসছে। সাইকেলগুলো টিনের চালার তলায় রেখে গায়ের জল ঝাড়তে ঝাড়তে ওরা সামনের সরু বারান্দা দিয়ে দোকানের পেছন দিকটায় চলে গেল। সূর্য রুমালে মুখ মাথা মুছছিল, বুলসি হাত দিয়ে মাথার চুল ঝেড়ে নিল। অভয় কৃপাময়ের কাছে রুমাল চাইল।

মতিলালের দোকানের সামনেটা অন্ধকার মতন, পেছনে একটু রোয়াক, রোয়াক টপকে ওরা একেবারে আড়ালে চলে গেল। পেছনে।

"পিন্‌কি..." বুলসি একটা ভেজানো দরজার সামনে এসে ডাকল। দরজায় আস্তে করে টোকা দিল বার কয়।

সামান্য পরেই পিন্‌কি মুখ বাড়াল। বুলসিদের দেখেই বাইরে এসে দাঁড়িয়ে বলল, "পানিমে ভিজেছ?"

"থোড়া। ছোট ঘরে কেউ আছে?"

"না—" পিন্‌কি মাথা নাড়ল, "আমার মালুম ছিল তোমরা আসবে।"

"কেয়সে মালুম হল তোমার?" বুলসি ঠাট্টা করে বলল।

"বরষাতির দিন।...মালিকরা দরশন দেবে।" পিন্‌কি হাসল না।

"আরে ব্বাপ, শালার কী অয়েল।...নাও চলো।"

পিন্‌কি ওদের চারজনকে নিয়ে যাবার আগে একটা লণ্ঠন নিয়ে এল। এনে পাশের ছোট্ট একটা ঘরে নিয়ে বসাল।

লণ্ঠনটা টেবিলের পাশে রেখে পিন্‌কি বলল. "উধারমে আজ থোড়া জাদা ভিড়। শালারা বহুত হাল্‌লা করছে।" পিন্‌কি অশ্লীল একটা গালাগাল দিল। "মানা করলে শোনে না।"

"কে কে আছে পিন্‌কি?" সূর্য জিজ্ঞেস করল।

"টিশানের টিকিটবাবু, মালগুদামকা দো ছোকরা, রামেশ্বরজী,...তোমাদের বাংলা স্কুলের গোরা অ্যায়সা মাস্টারজী..."

কৃপাময় সূর্যের দিকে তাকাল, "রেণুপদবাবু।"

বুলাল বলল, "রেণুস্যার আজকাল রোজ মাল খেতে আসে, মাইরি।"

"রেণুস্যার শিব হয়ে গেছে বে।...বিধবা শালীটা পট্‌ করে মরে গিয়ে খেপে গেছে স্যার।" কথার শেষে সূর্য জিবে চুক চুক শব্দ করল।

পিন্‌কি বলল, "ক'টা আনব? দো?" বলে আঙুল দিয়ে দুই দেখাল।

বুলালি বন্ধুদের মুখের দিকে তাকাল। "কি রে, দুই?...বৃষ্টিতে নেতিয়ে গিয়েছি মাইরি।" তারপর ঘড়ি দেখল হাতের। "আটটা বাজছে। দুই-ই ভাল। টাইম কম, কি বল!"

পিন্‌কি চলে যাচ্ছিল, সূর্য বলল, "গরম ভাজি দিয়ো পিন্‌কি।"

পিন্‌কি চলে গেল।

এই ঘরটা খুব ছোট, কুঠরি ঘরের মতন; ওরই মধ্যে নীল অয়েলক্লথ মোড়া একটা নড়বড়ে টেবিল, গোটা কয়েক টিনের চেয়ার। একদিকে ছোট জানলা। দেওয়ালে পুরনো একটা ক্যালেণ্ডারের ছবি, উলঙ্গ-প্রায় যুবতী মেয়ে। ধুলোর প্রলেপটুকুই তার আবরণ।

কৃপাময় বলল, "পিন্‌কিকে দেখলেই আমার যেন কেমন করে, মাইরি।"

"শয়তানের বাচ্চা শালা," সূর্য বলল, "কুত্তার মতন দেখতে।"

বুলালি বলল, "মুখে বসন্তর দাগগুলোর জন্যে আরও ডেনজারাস দেখায়।"

"তোদের খুব খাতির করে—।" কৃপাময় বলল।

"আমাদের নয় বে, করে আমাদের বাপকে। লাইসেন্স নেই, মালের কারবার করছে, খাতির করবে না!"

অভয় চুপচাপ ছিল। সূর্যর দিকে বড় আর তাকাচ্ছিল না। তার মনের কোথাও এখনও কেমন এক বিরক্তি এবং রাগ রয়েছে। অভয় বুলালির কাছে একটা সিগারেট চাইল।

জানলা দিয়ে বাইরের অন্ধকার দেখা যাচ্ছিল। বৃষ্টি পড়ছে ঝিরঝির করে। বাতাসের গন্ধটা ক্রমেই কেমন ঘন বাদলার হয়ে এসেছে, যেন আজ সারা রাত ধরে বৃষ্টি পড়বে। অভয় সিগারেট ধরিয়ে জানলার দিকে তাকিয়ে থাকল।

সূর্য বলল, "আজ আমার সব বরবাদ হয়ে গেল।"

বুললি তাকাল, "বরবাদ! কেন?"

"গণাদার ওখানে তাগাদা মারতে গিয়ে লেট্ হয়ে গেল। আমার এক জায়গায় যাবার কথা ছিল।"

"কোথায়?"

"ছি—ল।" সূর্য টেনে টেনে শব্দ দুটো উচ্চারণ করল।

বুললি সূর্যর মুখ দেখল লক্ষ্য করে, তারপর কৃপাময় আর অভয়ের মুখ দেখে নিয়ে হেসে বলল, "তুই চেপে গেলে কি হবে, সূর্য; জানি..."

সূর্য তাকিয়ে থাকল। লণ্ঠনের আলোয় তার চোখের তলা আরও কালচে, শুকনো দেখাচ্ছিল। সে জানে বুললিরা তার কথাটা ধরতে পেরেছে, তবু না বোঝার মুখ করে তাকিয়ে থাকল।

বুললি বলল, "যেখানে যেতিস তো?"

"কোথায়?"

"বকুলতলার গলিতে।"

সূর্য কোনো কথা বলল না, তার চোখের দৃষ্টি অনমনস্ক হল।

কৃপাময় বলল, "মেয়ে কলেজের একটা মাস্টারনীও আজকাল ওবাড়িতে থাকছে না রে সূর্য?"

সূর্য মাথা নাড়ল। "থাকার জায়গা পায়নি তাই থাকছে; ইতিহাস পড়ায়।"

"কি নাম রে?"

"জয়ন্তী।"

"খুব ডাঁটিয়ে যায় দেখি। জিনিসটা আগুন...পেট্রল মাইরি। লুজ্ শান্টিং চলবে না।"

"নিউ মডেল রে, শালা"—বুললি বলল, "কলকাতার নিউ মডেল।" বলে হাসল। তারপর সূর্যর দিকে তাকিয়ে বলল, "সূর্য, তোর মালাদিদিকে মডেল পালটাতে বল।"

সূর্য কোনো জবাব দিল না, তার চোখ দেখে মনে হচ্ছিল, সে মালাদির কথা ভাবছে।

পিন্‌কি দুটো দিশী মদের বোতল, সোডা, চারটে ছোট ছোট গ্লাস, কলাইয়ের বাটিতে গরম ডালবড়া, ভাজা ছোলা, আদার কুচি, দু' টুকরো পাতি লেবু—একে একে এনে রাখল।

সাড়ে নটা নাগাদ ওরা উঠল। বাইরে বৃষ্টি থেমে আছে। আকাশ আবার অপরিষ্কার। বৃষ্টি নামবে যে কোনো সময়। সূর্যর নেশা হয়ে গিয়েছিল, বুললির অতটা নয়, অভয়ের কথাও জড়িয়ে আসছে, কৃপাময় খুব সামান্যই খেয়েছে। আরও একটা বোতল নিতে হয়েছিল।

বাইরে এসে সাইকেল নিচ্ছিল ওরা। সূর্য জড়িয়ে জড়িয়ে বলল, "আমি

অভয়ের ব্যাকে চড়ব।"

কৃপাময় বলল, "তুই আমার সঙ্গে আয়।"

"না; আমি অভয়ের ব্যাকে চড়ব।" ওর 'ব্যাক' শব্দটা বলার ভঙ্গিতে কৃপাময়দের হাসি পাচ্ছিল।

কৃপাময় আবার বলল, "না, তুই আমার বাইকে আয়। অভয় পারবে না।"

"বাইক্ না...আমি ব্যাকে চড়ব।" সূর্য নড়ল না। অভয় সূর্যর বাইকটা টেনে নিয়েছে।

বুলাকি বলল, "তুই শালা একটুতেই মাতাল হয়ে যাস।...কৃপার বাইকে যা।"

সূর্য ঘাড় নাড়ল, "আমি অভয়ের সঙ্গে যাব।...অভয় আমার ফ্রেন্ড।... অভয় তুই আমার বন্ধু! বন্ধু না?"

অভয় সাইকেলটা এগিয়ে নিল। বলল, "ভাল করে চড়বি।"

কৃপাময় আবার ডাকল, "সূর্য, অভয় পারবে না, ও শালার ভাল হুঁশ নেই।"

সূর্য গ্রাহ্য করল না। অভয়ের সাইকেলের পেছনে যেতে যেতে বলল, "অভয় শালা আমার ফ্রেন্ড। ও আমার বাপ তোলে।...সব শালা আমার বাপ তোলে।..."

২

সকালে ঘুম ভেঙে উঠে সূর্য দেখল, বাইরে মেঘলা, বৃষ্টি পড়ছে। সকালে উঠে বাদলা দেখলে তার মনমেজাজ খারাপ হয়ে যায়। বিছানায় উঠে বসার আগে বালিশের তলায় মাথার নীচে জোড়া হাতের তালু রেখে হাতের কনুই দু'পাশে ডানার মতন ছড়িয়ে ঘাড় এবং মাথাটাকে বার কয়েক এপাশ ওপাশ করল, তারপর হাই তুলল বার দুই, শেষে পা দুটো জোড়া করে বিছানায় কোমর রেখে বার কয়েক পা ওঠাল, নামাল। শরীর ভাল রাখার সঙ্গে এই ধরনের ব্যায়াম কতটা প্রয়োজনীয় সে জানে না, তবে এই অভ্যাস সে অনেকদিন পালন করে আসছে। সকালের আলস্য ভাঙার জন্যে গা-হাত এইটুকু নাড়িয়ে চাড়িয়ে নিতে ভালই লাগে।

বিছানায় উঠে বসে এবার ভাল করে সূর্য বাইরেটা দেখল। তার বিছানার মাথার দিকে দুটো জানলাই বন্ধ; পুবের বড় জানলাটা ভেজানো, অন্যটা খোলা; পশ্চিমের দিকে বারান্দা, সেদিকের জানলা খোলা। বৃষ্টি পড়ছে, বাইরেটা জোলো-সাদা, হালকা ঝিরঝির শব্দ হচ্ছে বৃষ্টির, বিছানায় বসে বসে সূর্য বৃষ্টিকে একটা গালাগাল দিল।

তার এই ঘর মোটামুটি বড়, বিছানাটাও চওড়া, গদি তোশকে মোটা, আরামপ্রদ। ঘরের মধ্যে আলমারি, দেরাজ, টেবিল-চেয়ার, আলনা, দেওয়ালের গায়ে ঝুলোনো ডিমের ধাঁচের দামী আয়না। কোনো কিছুর অভাব নেই। বরং এত জিনিসের সঙ্গে তার প্রয়োজনের সম্পর্ক নেই, বাড়ির জিনিস বাড়িতে আছে, থাকবে। কখনও কখনও আচমকা সূর্য নিজের অবস্থার সঙ্গে জিনিস-গুলোর কেমন একটা মিল খুঁজে পায়; তাকেও যেন রেখে দেওয়া হয়েছে।

সূর্য বিছানা ছেড়ে উঠল। জানলাগুলো শব্দ করে করে খোলার সময় তার মনে হল সে বাড়ি কাঁপিয়ে তুলেছে। বাবার কান খুব সজাগ: বাবা হয়ত শব্দটা শুনতে পাচ্ছে। শেষ জানলাটা সূর্য ইচ্ছে করেই আরও জোরে শব্দ করে খুলল! যেন বাবাকে শব্দটা শোনাতে চাইল।

বাইরের বাদলা বাতাস অতগুলো জানলা দিয়ে হু-হু করে ঘরে ঢোকায় সকালের ভেজা ঠাণ্ডায় সূর্যর সামান্য শীত শীত করল। কাল বাড়ি ফেরার সময় একেবারে স্নান করে গিয়েছিল। কিভাবে ফিরেছে এখন আর ভাল খেয়াল হচ্ছে না। অভয় তাকে নিয়ে আছাড় খেয়েছে কি খায়নি, কতটা সাইকেলে কতটা

হে'টে হে'টে ফিরেছে—এখন সব ভুলে-আসা স্বপ্নের মতন মনে হচ্ছিল।

বৃষ্টির ঝাপটাগুলো এলোমেলো। বাইরে বাড়ির বাগানের একটা পাশ দেখা যায়। গোয়াল ঘরটাও। জবা, পেয়ারা, জুঁই, বাবার বড় সাধের কামিনী ঝোপ ভিজে একেবারে নেতিয়ে পড়ার অবস্থা, পাথর-নুড়ি আর লাল মোরমের ওপরও জল জমেছে, নতুন মোরমের লাল জল গড়িয়ে যাচ্ছে।

দিনটা আজ ভাল যাবে না, সকাল থেকেই সব পানসে, ভিজে, রদ্দি হয়ে রয়েছে। বৃষ্টিকে আরও একটা গালাগাল দিয়ে সূর্য মুখ ধুতে চলে গেল।

সকালের চা, জলখাবার খেতে খেতে সূর্য তার দিদিকে দেখল। দিদিকে তার কোনো দিনই ভাল লাগে না। বয়সে অনেক বড়, পনেরো বছরেরও বেশি; চল্লিশ বছরের দিদি একটা ধুমসী মাগীর মতন সামনেই বসে আছে। বসে বসে বামুনঝিকে রান্নাবান্নার কথা বোঝাচ্ছে। গলার স্বরটা দিদির বরাবরই ঝাঁঝালো আর জোরালো; চেঁচিয়ে কথা বললে মনে হয়, কানের কাছে কেউ চার পয়সাঅলা সিটি বাজাচ্ছে। বিশেষ করে এ-সময় যখন দিদি ঠাকুর-চাকরদের কিছু বলে তখন মনে হয় ধমকে, রুক্ষভাবে তাদের শাসন করছে।

কালো ফিতে-পাড় ধবধবে সাদা থান-পরা দিদিকে সূর্য চোখ তুলে বার কয়েক দেখল। গায়ের জামাটাও দিদির বেশ বাহারী, সাদা, পাতলা, গলায় বুকে সরু লেস। মাথায় কাপড় নেই। কোনোদিনই থাকে না। সূর্য মনে করতে পারল না, সে কখনও দিদিকে মাথায় কাপড় দিতে দেখেছে। জামাইবাবু বেঁচে থাকার সময়ও দিদি মাথায় কাপড় দিত না। বাপের বাড়িতেই আজন্ম কাটল, বিয়ের পরও, হয়ত তাই। এই বাড়িটা দিদির বাপের বাড়ি, তার স্বামী সেই বাড়িতেই থেকে গেল বলে যেন দিদি তার বাপের বাড়ির কর্তৃত্ব ও অধিকার বরাবরই দেখিয়ে গেছে।

সূর্য গরম চা আরও কয়েক চুমুক খেয়ে দিদির দিকে তাকাল। তাকিয়ে দিদির গলায় ভারী মটরমালা হারটা দেখতে লাগল। জামার পাশ দিয়ে বিশ্রী ভাবে নীচের জামার ফিতে বেরিয়ে রয়েছে। চল্লিশ বছর বয়সেও দিদি মেয়েদের হালকায়দার নীচের জামা পরে, কখনও কখনও দুপুরের দিকে জামার বদলে শুধু ওইটে পরে গায়ে আঁচল জড়িয়ে থাকে বলে সূর্যর বিশ্রী লাগে। শখ শৌখিনতা ষোলো আনা দিদির। ইয়া খোঁপা বাঁধে, মাঝে মাঝে ফুলও দেয়, গায়ে পাউডার, মুখে ক্রীম স্নো, ধোপার বাড়ির জামা-কাপড়ে সেন্ট না দিয়ে নিলে পরতে পারে না। দু-দুটো ছেলে দিদির, অথচ এ-সব শৌখিনতা ও নোংরামি দেখলে কে বলবে দিদির দুটো বাচ্চা।

দিদির হাতের মোটা, ভারী বালা দেখতে দেখতে সূর্য বলল, "ধোপার বাড়িতে লোক পাঠিয়ো আজ।"

বামুন-ঝিয়ের সঙ্গে কথা শেষ হয়ে এসেছিল দিদির, বাকিটুকু শেষ করে

সূর্যর দিকে ফিরে তাকাল। বামুন-ঝি চলে গেল।

"কি বললি?" বিজয়া বলল।

"ধোপার বাড়িতে লোক পাঠিয়ো।"

"কেন, তোর জামা প্যাণ্ট নেই?"

"নতুনটা দরকার?" সূর্য উদাস গলা করে বলল।

"এই বৃষ্টিতে ধোপা কাপড় কাচছে নাকি!...কী বাদলা! আকাশ পচছে. ."

"পরশু রোদ ছিল সারা দুপুর, কাল সকালে রোদ গিয়েছে..."

"যাক্, ও রোদে ধোপারা ভাটি দেয় না।...তোর যা আছে তাই পর। আজ ধোপার বাড়ি লোক যাবে না।"

সূর্য চটল। "আমার নতুন প্যাণ্টটা দরকার।"

বিজয়া ভাইয়ের মুখ দেখল। "এত থাকতেও কুলোচ্ছে না!"

"তোমার আরও বেশী আছে," সূর্য বলল।

বিজয়ার মুখ যেন একটু কালচে হল। ওর মুখ গোল, গায়ের রঙ ফরসা। মুখের গড়নটি ভালই বিজয়ার, তার মা'র আদল পেয়েছে, তবু বিজয়ার চোখ এবং ভুরু সুশ্রী নয়। চোখ বড়, একটু বেশীই যেন, তাকালে চোখের পাতা কোটরের তলায় সবটাই প্রায় গুটিয়ে যায়, ভুরু খুব ঘন কালো, অনেকখানি ছড়ানো। কপালের কাছে, ভুরুতে সব সময়ই কুঁচকোনো কয়েকটা রেখা। বিজয়ার ঠোঁট পুরু, ঠোঁটে পানের লালচে বাসী দাগ ধরে থাকে সব সময়।

ভাইয়ের মুখ দেখতে দেখতে চোখ ভুরু কুঁচকে বিজয়া বলল, "আমার বেশী থাক কম থাক, তার খবরদারি করার লোক তুমি নও।"

দিদির কথার সুরে সূর্য দিদির মুরুব্বিয়ানার ভাব পেল, সূর্যকে অবহেলা করতে চাইছে, মেজাজ দেখাচ্ছে। জবাব দেবার জন্যে সূর্য প্রায় মুখ খুলে ফেলেছিল, সামলে নিল। মনে মনে বলল: তোমায় আমি একদিন ধুইয়ে দেব, অ্যায়সা দেব যে বাপের বাড়িতে বসে বিবির রোয়াব দেখাতে হবে না। আমি শালা অন্ধ নই, সব দেখি, সব বুঝি।

দিদি নোংরা চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে দেখে সূর্য বলল, "তুমি আমার ওপর খবরদারি করছ কেন?"

বিজয়ার গা জ্বলে গেল। কথা দেখেছ? বলল, "বেশ করছি। আমি করব না তো করবে কে তোর শুনি?"

"না, তুমি করবে না।"

"করব, হাজার বার করব।"

"না।" সূর্য উঠে পড়ল, "মাতব্বরি করতে হয় ঝি-বামুনের ওপর কর গে তোমার ছেলেদের ওপর কর; আমার ওপর নয়! আমার সঙ্গে লাগতে এলে মুশকিলে পড়বে।"

বিজয়া গলা তুলে চেঁচিয়ে উঠল, "হারামজাদা ছোটলোক ছেলে, তুই আমার ওপর চোখ রাঙাস! ইতর, বদমাস কোথাকার..."

সূর্য দাঁড়াল, "ছোটলোক-ফোটলোক বলো না। যা মুখে আসে বলে যাচ্ছ, পরে কিন্তু.. "

বিজয়াও উঠে দাঁড়িয়েছে, মুখ লালচে হয়ে গিয়েছিল রাগে। "আচ্ছা দাঁড়া, বাবাকে বলছি—" দাঁতে দাঁতে ঘষল বিজয়া, "অসভ্য জানোয়ার, বড়র সংগে কথা বলতেও জানে না। পাজি, বকাটে..."

"যাও যাও, আমাকে বাবা দেখিও না! বাবাটাবা আমার দেখা আছে।"— সূর্য আর দাঁড়াল না। দিদি যে কী বলে চেঁচাচ্ছে, তাও আর শুনতে ইচ্ছে নেই।

নিজের ঘরে এসে সূর্য দেওয়াল-আলনা থেকে একটা শার্ট নিয়ে গায়ে দিল। মনে বিরক্তি। আজ দিনটা যে ভাল যাবে না, সকালে উঠেই মনে হয়েছিল। শালা বৃষ্টি। মেজাজ তেতো করে দিয়েছে দিদি। অনেক দিন থেকেই তার ইচ্ছে দিদিকে একদিন আগাপাশতলা ধুইয়ে দেবে, মাঝে মাঝে এমনও হয়েছে যে, সূর্য আর নিজেকে সামলাতে পারেনি, মুখ থেকে কথা খসে পড়ে আর কি, তবু অনেক কষ্টে সামলে ফেলেছে শেষ পর্যন্ত। আজ আর দু-চারটে ফালতু কথা বললেই হয়ে যেত, সূর্য নিজেকে সামলাতে পারত না।

শার্ট গায়ে দিয়ে সূর্য আয়নার সামনে চুল আঁচড়াতে সরে এল। আয়নায় খুঁটিয়ে মুখ দেখা তার অভ্যেস। গালে হাত দিয়ে চামড়া টেনে সূর্য তার গালের মসৃণতা এবং রঙ পরীক্ষা করল, দাঁতগুলো দেখল; তারপর চোখ। চোখের তলায় কালচে দাগটা প্রায়ই তাকে বিরক্ত করে। আজ দাগটা আরও স্পষ্ট মনে হল। এ-রকম কেন হচ্ছে? দিদির চোখের তলায় এই রকম দাগ পড়তে পড়তে কালির মতন হয়ে গেছে, সন্ধ্যেবেলায় দিদি দাগের ওপর প্রথমে ক্রীম ঘষে পরে আঙুল দিয়ে পাউডার বুলিয়ে দেয়। বাবার চোখের তলা একেবারে কালচে শ্যাওলার মতন, চশমা খুললে মনে হয় চোখের তলায় চামড়ায় পুরনো কালসিটে পড়ে আছে। সূর্যর মাকে মনে পড়ল না। মা'র চোখের তলায় দাগ ছিল কি ছিল না কে জানে। হয়ত ছিল। এই দাগ পুষে রাখতে সূর্যর ইচ্ছে করে না! মালাদি বলে, 'রাত্রে শোবার সময় কি ভাব যে অত দাগ পড়ছে? ছেলেদের এই এক দোষ।'

চিরুনির ডগায় কিছু ময়লা উঠে এল। আঙুলের ডগায় ময়লা পরিষ্কার করতে করতে সূর্যর মনে পড়ল, কাল সে বার দুয়েক রাস্তায় কাদায়-টাদায় পড়েছিল। শালা অভয় তাকে টানতে পারছিল না। ফেলতে ফেলতে নিয়ে এসেছে। বাড়ি এসে সূর্য সোজা নিজের ঘরে, জামাকাপড় বদলে কলঘরে গিয়েছিল। নোংরা কাদামাখা জামাকাপড় সে কলঘরেই ফেলে এসেছিল। আজ আর খেয়াল করে দেখেনি, পড়ে আছে বালতির মধ্যে, চাকর কেচে দেবে।

ঘরের মধ্যে সামান্য পায়চারি করে সূর্য তার হাতঘড়ি পরে নিল। সাড়ে আটটা বেজে গেছে। আর ঘরে বসে থাকা যায় না।

বাইরে আসতেই ছোকনুর গলা পাওয়া গেল, "মামা!"

সূর্য তাকাল। বারান্দার ওপাশ থেকে ছোকনু একটা ছেঁড়া ঘুড়ির সুতো এক হাতে ধরে বারান্দার সিমেণ্টে ঘষড়াতে ঘষড়াতে আসছে।

কাছে এসে ছোকনু বলল, "আমার ঘুড়ি এনেছ?"

সূর্যর মনে পড়ল। বলল, "না রে, রাত্তিরে ঘুড়ির দোকান বন্ধ থাকে।"

"আনবে বলেছিলে—" ছোকনু জামা চেপে ধরল।

"আনব।"

"আজ? দুপ্পুরে?"

"আজই নিয়ে আসব।"

"আমায় মান্‌জা করে দেবে?"

"তোব দাদাকে বল।"

"দাদা দেবে না। দাদার চারটে লাটাই, ই-য়া মান্‌জা সুতো, মোটা মোটা।"

"তোর মাকে বল। তোর মা'র মান্‌জা ফাস্‌ট কেলাস। কচাকচ ঘুড়ি কাটবে।" সূর্য কথাটা বলে তিক্ত এক আনন্দ পেল।

ছোকনু কিছু বুঝল না, মামার মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

সূর্য ভাগ্নের নির্বোধ মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল। রোগাসোগা, পা খোঁড়া বলেই হোক, বা বোকাসোকা একেবারে বাচ্চা বলেই হোক, এই ভাগ্নের ওপর তার খানিকটা মায়া আছে। বড়টাকে সূর্য একেবারেই পছন্দ করে না, একেবারে দিদির ধাঁচ, ওই রকম চোখমুখ, হাবভাব, কথা বলার ভঙ্গি। এই বাড়িটা যেন তার মা'র জমিদারী, কী রোয়াব বেটার। একদিন একটা লাথি মেরেছিল সূর্য, ছিটকে গিয়ে বাগানে পড়েছিল হারামজাদা। আর একদিন দিদির চোখের সামনে বেটাকে একটা ঝাড়বে সূর্য।

"তুই ঘুড়ি ওড়াতে যাস কেন?" সূর্য ভাগ্নের মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বলল, "ছুটতে গিয়ে পড়ে গেলে লাগবে। আমি তোকে অন্য জিনিস এনে দেব। বসে বসে খেলবি। . এই বেটা, যা তো একটা ছাতা নিয়ে আয়।"

ছোকনু মামাব মুখের দিকে এমন চোখ করে তাকিয়েছিল, যেন ঘুড়ি লাটাই পেলেই সে উড়োতে পারবে, পড়ে যাবে না। তবু মামা কেন তাকে বারণ করছে সে বুঝতে পারছে না। অন্য কি খেলনাই বা মামা এনে দেবার কথা বলছে সে জানে না। খেলনাটাব জন্যে তার কৌতূহল হচ্ছিল।

মামার চোখের দিকে চেয়ে চেয়ে ছোকনু বলল, "কি এনে দেবে, কি খেলনা?"

সূর্য কিছু ভাবেনি, কোনো খেলনার কথা তার মনে পড়ল না, বলল, "দেব। সে আছে—। য, একটা ছাতা নিয়ে আয়।"

ছোকনু ঘুড়িটা বারান্দার ওপর টেনে টেনে ওড়াতে ওড়াতে ছাতা আনতে চলল। তার হাঁটা টলমলে। বাঁ পায়ে জোর পায় না, পায়ের পাতা থেকে হাঁটু অবধি সরু, সামান্য বাঁকা। ঠিক যে কি হয়েছিল ছোকনুর সূর্য জানে না।

খুব জ্বর হয়েছিল একবার, শরীর আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল, টাইফয়েড টাইফয়েড বলত বাড়িতে, পরে শুনেছিল অন্য রোগ, পোলিও। ছোকনুর হাঁটার দিকে তাকিয়ে সূর্যর কষ্ট হল। এবং সেই সঙ্গে দিদির ওপর রাগ। দিদি বরাবর অনেক লটপট করেছে, করে যাচ্ছে। এত পাপ শালা ভগবান সইবে কেন? কিন্তু বেচারী ছোকনুর কপালেই...। হঠাৎ সূর্য ভাবল, সে যখন মরে যাবে, তখন এই বাড়িটাড়ি, টাকা-পয়সা, যেখানে যা কিছু তার থাকবে, সব ছোকনুকে দিয়ে যাবে। শুধু ছোকনুকেই।

এক হাতে সাইকেলের হ্যাণ্ডেল ধরে সূর্য নীচে নামল, অন্য হাতে খোলা ছাতা। মাটিতে পা দিয়ে মনে হল, মোরমের তলায় যেন হাতখানেক জল : পা বসে যাচ্ছে, সাইকেল বসে যাচ্ছে। কাল সারারাত যে খুব বৃষ্টি হয়েছে সূর্য যেন এতক্ষণে খেয়াল করতে পারল। ভিজে কাদাটে মোরমের ওপর দিয়ে সাই-কেল ঠেলার সময় জোর লাগছিল; চাকার দাগ বসে যাচ্ছে, গর্ত হয়ে যাচ্ছিল প্রায়। এ-পাশের গাছপালা মোরম পেরিয়ে সূর্য বাড়ির সামনের দিকে এল। সামনে ছোট বাগান, গাছপালা জলে ভিজে সপসপ করছে, বাইরের পাঁচিলের শ্যাওলা পরিষ্কার করার লোক দুটো কোদাল হাতে আজ বাগানে নেই। সাইকেল এবং তার মুখের ওপর দিয়ে একটা টিয়া উড়ে গেল। বেলঝাড়ের কাছ থেকে টিয়াটা বেরিয়ে পলকে উঠে গেল দেখে সূর্য উড়ন্ত টিয়া পাখিটাকে দেখবার চেষ্টা করল। ইলেকট্রিক তারের ওপর দিয়ে কোথায় যেন উধাও হয়ে গেছে পাখিটা। অনেকদিন পরে সূর্য একটা পাখি দেখার জন্যে ছেলেমানুষের মতন এদিক ওদিক তাকাল।

ওদিক পানে তাকাতেই চোখে পড়ল, বাইরের ঘর খোলা; নীচে সিঁড়ির গা ঘেঁষে ডান দিক হেলিয়ে মোটর-বাইক। জলের ছাঁট বাঁচাবার জন্যে বাইকটার গায়ে সাধন শালা একটা প্লাষ্টিকের ঢাকনা চাপিয়েছে। বাবা তাহলে বাইরের ঘরে! সাধনচন্দর, মানে ধনচন্দর বাবার সঙ্গে সকালেই দেখা করতে এসেছে। প্রায়ই আসে ব্যাটা। সন্ধ্যেতেও আসে। দিদির সঙ্গেও বার্তাচিত চালাচ্ছে। নয়াবাজারে একটা বাড়ির কাজ হচ্ছে সূর্যদের; একতলা আগেই করা ছিল, এখন দোতলা হচ্ছে, বাবা ধনচন্দরের হাতে কাজকর্ম করার ভার চাপিয়ে দিয়েছে। নয়াবাজারে বাড়ি, মানে পাক্কা মাসে পাঁচশো সাতশো। নীচের তলাটায় এতদিন দোকান ভাড়া ছিল, চার চারটে দোকান, দোতলা হলে বাবা কোনো শাঁসালো মক্কেলকে ভাড়া দেবে, মেজে দেওয়াল ব্যালকনি দরজা জানলা সব সরেস জিনিস দিয়ে তৈরী করাচ্ছে বাবা। ধনচন্দরের বেস্ট মিস্ত্রী মজুরে কাজ করছে। বলা যায় না, ওই দোতলাটা হয়ত 'ড্রীম'-এর মতন একটা ফার্স্ট ক্লাশ মালখানা হবে। হলে সূর্যর অবশ্য এখন কোনো লাভ নেই। বাবা যতদিন বেঁচে আছে, ততদিন পিনকির দোকান। বাবার কত বয়েস হল? ষাট-ফাট

পার করে দিয়েছে নিশ্চয় কোন কালে। বুড়োর এখনও মজবুত শরীর। তোয়াজ কম করে না : পাকা মাছ, বাড়িতে তৈরী ঘি, তিনপো দুধের ক্ষীর, এ-সব তো আছেই—তার সঙ্গে হরতুকীর জল, বেলের পানা, কবরেজী মোদক-ফোদকও আছে। ধনচন্দর বাবার খুব বাধ্য, বাবা তাকে মিউনিসিপ্যালিটির নানা রকম কাজকর্ম দেয়। পালটাপালটি ব্যবস্থা আছে। এবার ইলেকসানের আগে বাবার নামে সারা শহরে কাদা ছুঁড়েছিল লোকে, বাবা দোতলার কাজ শুরু করেও থামিয়ে দিয়েছিল; জিতে যাবার পর যেন পাঁচগুণ উৎসাহে কাজটা শুরু করে দিয়েছে।

সূর্যর মনে পড়ল, ইলেকসানের আগে বাবার নামে সে একটা ছড়া শুনেছিল: 'ওরে ও ধেড়ে কামাখ্যা, এবারে উলটে দেবো ছক্কা, জারি-জুরি চলবে না আর, হ'য়ে যাবি ফক্কা।' ছড়াটা কোন কোন মহল্লায় খোল করতালে বাজিয়ে গাওয়া হত। দেওয়ালে রাস্তায় পেচ্ছাপখানায় আঁটা কয়েকটা পোস্টারের লাল কালো নীল রেখাও সূর্যর চোখের সামনে ভেসে উঠল। ছড়াটা মনে পড়ায় সূর্যর যেমন হাসি পেয়েছিল, পোস্টারের লেখাগুলো উলটো-পালটা মনে আসতে তেমনি ঘৃণা হল। এই শহরে বাবার সুনাম কিছু নেই, রাস্তায় ঘাটে দোকানে লোকে গালাগাল দেয়। বাবার ওপর লোকের কী আক্রোশ এবং ঘেন্না। তবু বাবা জিতে যায়, বাবার সম্মান মর্যাদা ক্ষমতা টিকে থাকে। আশ্চর্য!

সূর্যর হঠাৎ গতকালের কথা মনে পড়ল: অভয় তার বাপ তুলেছিল। না, সরাসরি তোলেনি, ঘুরিয়ে ঠোক্কর মেরেছিল। আড়ালে ওরাও তার বাবাকে খিস্তি খেউড় করে, শুধু তার বাবাকে নয়, বুললির বাবাকেও। বুললির বাবা, লোকে বলে, যে চেয়ারে বসে—ওঠবার সময় সেই চেয়ার থেকে পেরেক পর্যন্ত তুলে নেয়, অ্যায়সা চীজ্।

সূর্য বাড়ির ফটক খুলে বাইরে রাস্তায় এসে দাঁড়াল।

নিউ কাফেতে এসে সূর্য সাইকেলটাকে একপাশে রেখে ছাতা গুটিয়ে ভেতরে ঢুকল।

দোকানে এখন ভিড় কম। নটা বাজে প্রায়, সকালের খদ্দেররা চলে গেছে। অফিস, স্কুল, কোর্ট-কাছারির বেলা হয়ে যাচ্ছে।

কৃপাময় পাশের দিকে একটা টেবিলে বসে ছিল। পা দুটো চেয়ারের ওপর তুলে এগিয়ে বসে ঘাড় বেঁকিয়ে সে যেন পেছনের টেবিলের কথা শুনছিল! সূর্যকে দেখে কৃপাময় স্বস্তির চোখে তাকাল।

সূর্য ছাতাটা রেখে হাতের জল মুছতে মুছতে বলল, "কী বৃষ্টি মাইরি, সকাল থেকে মেজাজ বিগড়ে দিয়েছে।...তুই একলা?"

"বুললি আর অভয় একটা কাজে গেছে, আসবে আবার।...আমি তোর জন্যে ভাবছিলাম।"

আমরা ভাবছিলাম তুই ক্যাচেড হয়ে গিয়েছিস!"

"না রে না, অত সস্তা নয়..." সূর্য উপেক্ষার গলায় বলল, "ক্যাচেড হবার মাল এ নয়।" চেয়ারে বসল সূর্য।

কৃপাময় বুক পকেট থেকে দুটো সিগারেট বের করল। সূর্যর দিকে বাড়িয়ে দিল একটা, বলল, "কাল তুই ফাঁসিয়ে দিয়েছিলি। বাড়ি ঢুকলি কি করে?"

সূর্য ভাল মনে করতে পারল না কৃপাময়ের দেওয়া নেতানো সিগারেট আঙুলে ঘোরাতে ঘোরাতে বলল, "ঢুকে পড়লাম। চেনা গোয়ালে ঢুকতে কষ্ট কি রে?" সূর্য পরিহাস করে হাসল; বলল, "তোরা যত ভাবছিস তত নয় আমার ফুল্ সেন্স ছিল।"

কৃপাময় সিগারেট ধরিয়ে সূর্যর দিকে কাঠি বাড়াল। "তোর কিচ্ছু ছিল না। সাইকেলের ব্যাক্ থেকে রাস্তায় কী ওলটালি মাইরি, আমরা ভেবেছিলাম মাথাফাথা গেল শালার।"

সূর্য হাসল; বলল, "দূর-র, ওতে কি হবে। ভল্ট প্র্যাকটিস আছে—" বলে সিগারেটে টান মেরে ধোঁয়া ছাড়ল। পরে বলল, "কোথাও একটা পাথর ছিল বুঝলি, ব্যাকে চোট মেরেছে।" সূর্য হাত দিয়ে ডান পাশের কোমরের তলা দেখাল।

কৃপাময় সামনের দিকে তাকিয়ে চায়ের দোকানের ছোকরাকে আঙুল তুলে ইশারায় দু' কাপ চা দিতে বলল।

ওপাশে জনা তিনেক ছোকরা বসে গত রাত্রের খেলা তাসের দান এবং খেলার ভুলচুক নিয়ে তর্ক করছিল: চিড়ের নওলা ঠেলে হাত টানলে নণ্টার চিড়ে যেত রে শালা.. তা না তুই একতাস বুইতন খেললি। অন্য একটা টেবিলে দুটি ছেলে মুখোমুখি বসে, একজন বাসী কাগজের পাতা উলটে উলটে কিছু দেখছিল, অন্যজন গা হেলিয়ে বসে টেবিলের ওপর আঙুল দিয়ে ঠেকা মেরে মৃদু গুনগুন সুরে গাইছিল: 'শ্রাবণ তুমি বাতাসে কার আভাস পেলে'; গায়কের চোখে চশমা, নাকে নস্যির গুঁড়ো।

কাগজ পেন্সিল হাতে করে একেবারে পেছনের দিকে একজন বসে বসে কিছু টুকে নিচ্ছিল।

সূর্যর সঙ্গে গায়ক-ছেলেটির চোখাচোখি হয়েছিল আগেই, আবার হল। সূর্য এবার ঠাট্টা করে বলল, "কি রে, এত বৃষ্টিতেও কুলোচ্ছে না? বৃষ্টি থামাবার গান গা।"

গায়ক জবাব দিল, "কোথায় বৃষ্টি রে। [illegible] বহুমূত্র...। বৃষ্টি হবে আকাশ-টাকাশ কালো করে, [illegible] তোড়ে ভেসে যাবে [illegible]।"

"তোমাগো দ্যাশে হত।" সূর্য ঠাট্টা করে বলল।

"হত। সে তুই বুঝবি [illegible] ঘটি", গায়ক জবাব দিল, "হালার ঘটির ডাঙায়
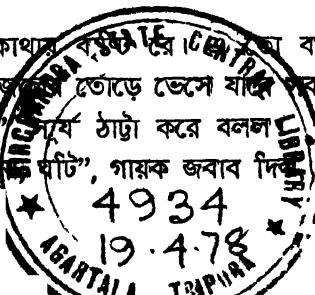
আসমানে চিরিক চিরিক মোতে রে।"

সূর্য হেসে ফেলল, গায়কও হাসল। কৃপাময় নাক দিয়ে ধোঁয়া বের করতে করতে বলল, "এই বাঙাল, তোদের গানের স্কুলের সেই নাচগানটা কবে হবে রে?"

"হবে," বাঙাল গায়ক বলল, "বর্ষাটা জমতে দাও।" বলে একটু থেমে আবার বলল, "তোমাদের সেই কনসার্ট পার্টি কি তুলে দিলে?"

কৃপাময় কনসার্ট পার্টির কথা কিছু বলল না। নাচগানের প্রসঙ্গে বলল, "তোদের নাচগানটা এবারে বড় জায়গায় কর—।"

"দেখি।...কিছু চাঁদা আদায় করে দাও না।...এই সূর্য, তুই তোর বাবাকে বল না, মোটা একটা টাকা চাঁদা দিয়ে দিতে।"

"আমার বাবাকে প্রেসিডেণ্ট করবি?" সূর্যর গলার স্বরে চাপা বিদ্রূপ।

"করব।...তুই দে, তোকেও করব।"

সূর্য কি ভেবে এদিক ওদিক তাকিয়ে মুখ নেড়ে এবং হাতের ইশারায় কি যেন একটা বোঝাল। সম্ভবত কুখ্যাত কারুর নাম-ঠিকানা বোঝাল; তারপর বলল, "ওখানে যা, ঢেলে দেবে।"

গায়ক হেসে ফেলল। "ভাগ শালা।"

কৃপাময়দের টেবিলে চা দিয়ে গিয়েছিল। সূর্য চায়ের পেয়ালা টেনে চুমুক দিল। বর্ষার দিনে চা যেন আরও জমিয়ে করেছে। খুব গরম। চা খেতে খেতে বাড়ির কথা মনে পড়ল সূর্যর, দিদির কথা মনে পড়ল। দিদির চেহারা চোখ মুখ গলার স্বর মনে পড়তেই তার আবার খারাপ লাগল।

কৃপাময় ফুঁ দিয়ে দিয়ে চায়ে চুমুক দিচ্ছিল। এই রেস্টুরেণ্টটা ছেলে-ছোকরাদের সকাল সন্ধ্যের আড্ডাখানা। একেবারে সকালের দিকে কিছু বয়স্ক লোকও আসে, সন্ধ্যের দিকেও অল্পস্বল্প না আসে এমন নয়, তবে বেশি সময় বয়স্কদের কেউ বসে না। বসা যায় না। ছোকরারাই দোকানটার দখল নিয়ে নিয়েছে। প্রথম দিকে খুব সাজিয়ে গুজিয়ে বেয়ারাদের চোগা-চাপকান পরিয়ে দোকানটা শুরু করেছিল অনাদি কুণ্ডু। পরে আর সে-চেহারা থাকেনি। তবু এখনও নিউ কাফের ইজ্জত আছে। টেবিলগুলোর ওপরে কাঁচ, কাঁচের তলায় ছাপা কাগজের মেনু, পড়ে থেকে থেকে হলুদ হয়ে এসেছে। চায়ের দোকানের চেয়ারগুলো কিছু কাঠের কিছু স্টীলের, ফোল্ডিং চেয়ার। অনাদি কুণ্ডুর জন্যে একপাশে কাউণ্টার করা আছে। একটা রেডিয়ো একদিকে, দেওয়াল আলমারির মধ্যে; আলমারির তাকে চায়ের প্যাকেট, কফির টিন, বিস্কুটের প্যাকেট, এমন কি বাড়তি ডিমও সাজানো রয়েছে।

চা খেতে খেতে সূর্য বলল, "বুলালিরা গেল কোথায়?"

কৃপাময় জবাব দিল, "একজনের সঙ্গে দেখা করতে।"

"কার সঙ্গে?"

"চারুবাবু!"

"চারুবাবু—? কোন্ চারুবাবু? চারু ভট্চায? না চারু চশমা?"

"না রে, এ অন্য চার্, চার্ দত্ত..."

"চার্ দত্ত?...কেন? চার্ দত্তর কাছে কি?"

"অভয় একটা চাকরির খবর পেয়েছে, চার্ দত্তর অফিসে।"

সূর্য যেন কথাটা বুঝতে দু দণ্ড সময় নিল, তারপর বলল, "ওটা তো কারখানা, ফ্যাক্টরী।"

"চারুবাবু কারখানার লোক না, অফিসের লোক।"

"ও বেটা পয়লা নম্বরের হারামী। তিনটে করে দুগ্‌গো পুজো করে আর একটা করে মেয়ের বিয়ে দেয়।"

"তা কি হবে, চারুর গিন্নী মেয়েস্কুলের বাস যে—!" কৃপাময় চোখের রগুড়ে ভঙ্গি করে বলল।

সূর্য হেসে ফেলল। বলল, "তা দিক না, অভয় শালার কাছে একটা নামিয়ে দিয়ে যাক না।"

"দিতে পারে। তবে অভয় নেবে না।"

"কেন?"

"তোর ভয়ে", কৃপাময় হেসে বলল, "তোকে অভয়ের ভীষণ ভয়।"

সূর্য হাসতে হাসতে বলল, "কেন রে, আমি কি ওর মাগীতে মই চড়াব?"

কৃপাময় রগুড়ে মুখ করে জবাব দিল, "কি জানি, ওর তো তাই ভয়। বলে, সূর্যর জন্যে আমার বিয়ে করা হবে না লাইফে, শালা আমার বউ ভাগিয়ে নেবে।"

সূর্য যেন খুব একটা মজার কথা শুনেছে, জোরে হেসে উঠল। কৃপাময়ও হাসতে লাগল।

সামান্য পরে বুললিরা ফিরল। ততক্ষণে চায়ের দোকান আরও ফাঁকা হয়ে এসেছে। গায়ক শ্যামল এবং তার বন্ধু চলে গেছে, একেবারে পেছনের টেবিলের মানুষটিও আর নেই, শুধু তাস খেলা নিয়ে তর্করত দলটি তখনও বসে, তাসের প্রসঙ্গ থেকে তারা অন্য প্রসঙ্গে চলে গেছে।

বুললিরা টেবিলের কাছে আসতেই কৃপাময় শুধলো, "কি রে, কি হল?"

"কাল—" অভয় জবাব দিল, দিয়ে চেয়ার টেনে বসল।

"কাল মানে?"

"কাল সন্ধ্যেবেলা যেতে বলল", বুলোলি জবাব দিল। সে তখনও দাঁড়িয়ে।

"কথাটথা বললি, নাকি ফালতু মুখ দেখিয়ে এলি?"

"বললাম, ভাল করে শুনল না; অফিসে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছে; কাল যেতে বলল," অভয় যেন খানিকটা হতাশ।

বুলোলি বলল, "দু চারবার না ঘোরালে পজিসন থাকে না। চারু পজিসন মারল।" বলে বুললি সূর্যর কাঁধে ভেজা হাত রেখে তার কাঁধের মাংস টিপল, "কিরে, আচ্ছা কারবার করলি কাল।" বুললি ঘাড় ফিরিয়ে চায়ের দোকানের ছোকরাকে খুঁজল, "আরে এই কেষ্ট ঠাকুর, চা লাগা, কড়া মারবি।"

বুলালি এবার বসল, গায়ের ভেজা জামা দেখতে দেখতে বলল, "অভয়টা ঝুটমুট ভেজাল। বললাম, রাতে যাব চ; তা শালার চুলকে উঠল।" বুলালি এবার জামার ওপর থেকে চোখ তুলে কৃপাময়ের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বলল, "চারুর একটা মেয়ে এসে আমাদের বসার ঘর খুলে দিয়েছিল মাইরি। বেশ চালুলু..."

কৃপাময় গম্ভীর মুখে শুধলো, "মেয়ে না ফ্রক?"

"না রে, শালা; শাড়ি।"

"শাড়ি—!" কৃপাময় চোখ ছোট করে ভাবল সামান্য, বলল, "চারুর বাড়িতে শাড়ির স্টক তো ফুরিয়ে গিয়েছিল রে, বাকি ক'টা ফ্রক ছিল।...আর একটা তাহলে ক্লাসে উঠেছে।"

কৃপাময়ের কথায় ওরা চারজনেই জোরে হেসে উঠল।

বুলালি বলল, "অনেকদিন উঠেছে। না রে অভয়?...কি রকম হেলেদুলে এল গেল মাইরি, অভয়টার সঙ্গে কথা বলল। আমরা শালা যেন মজা, আমাদের দেখে কী হাসি।"

সূর্য বলল, "হাসছিল কেন?"

"কে জানে!...দেখলাম হাসছে।"

'জোরে জোরে?" কৃপা রগড় করে জিজ্ঞেস করল।

"ধ্যুৎ—শালা," বুলালি বলল, "জোরে হাসলে তো বিউটি থাকত না। চেপে হাসছিল।"

"দেখতে কেমন?"

"ভাল। ছিপছিপে, ফরসা, ইয়া ইয়া চোখ—গন্ধর্বলবুর মতন।..."

"আর ইয়ে-টিয়ে?"

"আছে রে, আছে—। দেখে নিয়েছি।..."

"ওটা অভয়ের", সূর্য বলল, "তুই চোখে ব্লটিং মেরে নে, বুলালি।"

বুলালি বিস্ময়ের ভান করে বলল, "অভয়ের? অভয়ের কী করে হল?"

"হয়ে যাবে," সূর্য বলল। "আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, অভয় শালা পেয়ে যাবে। কী করবি, কপাল!...চারু অভয়কে চাকরি দিচ্ছে, তোকে তো আর নয়।"

অভয় বিরক্ত হবার ভাব করে বলল, "তোদের সব তাতেই খচড়ামি। আমি শালা চাকরির জন্যে ধরনা মেরে মেরে মরছি...আর তোরা রস মারছিস।"

সূর্য এবার সরাসরি অভয়ের চোখের দিকে তাকাল, বলল, "চারু তোকে কি চাকরি দেবে রে?"

"কেন? চারুবাবুর পজিসন আছে।"

"কিসের পজিসন?"

"বলিস কি! লোকটা অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের সাহেবের পি. এ।"

"সাহেবের ইয়ে—" সূর্য বলল।

এই ধরনের অবজ্ঞা এখন অভয়ের পছন্দ হল না; চারুবাবুর হাত অনেক-

খানি আছে। সূর্য কিছু জানে না, খোঁজ-খবর রাখে না। অভয় বলল, "তুই জানিস না, চারুবাবুর হাত আছে। কৃপাময়কে জিজ্ঞেস কর।"

কৃপাময় বলল, "হাত খানিকটা আছে, তবে লোকটা স্লাই ফক্স। ওর জামাই হতে পারলে চান্স আছে।"

বুলালি বলল, "অভয় জামাই হয়ে যাবে। তোরা তো একই জাত।"

"ও বদ্যি..." অভয় বলল, "চারু দত্তগুপ্ত।"

"তুইও বদ্যির বাচ্চা।"

"আমি বদ্যি নই।..."

"আলবাত তুই বদ্যি। আমরা তোকে বদ্যি করে ছাড়ব।" সূর্য বলল, "চাকরিটা নিয়ে নে, তারপর বদ্যিফদ্যি দেখা যাবে।"

অভয় বিরক্ত হয়ে বলল, "খচড়ামি করিস না, সূর্য। আমার মেজাজ ভাল নেই। সকালে বাসী মুখে জুতো খেয়েছি।"

সূর্য অবাক চোখে তাকাল। বুলালি আর কৃপাময়ের মুখের ভাব দেখে মনে হচ্ছিল, ওরা সব জানে। তা জানতে পারে, অভয় ওদের আগেই বলেছে, সূর্য তো অনেক দেরি করে চায়ের দোকানে এসেছে আজ। কিন্তু কৃপাময় তাকে কিছু বলে নি কেন? সূর্য অভয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, "জুতো কি রে? কার জুতো?"

অভয় দোকানের বাইরের দিকে অসন্তুষ্ট, হতাশ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ, তারপর চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, "বাবার জ্বর, বর্ষা বাদলায় জ্বর হওয়া আজব কিছু নয়। মা সকালে আমাকে এক চোট ঝেড়ে দিলে।" তারপর অভয় মা'র গালাগালগুলো বিরস মুখে শোনাল, বাপের পয়সায় খাচ্ছিস আর ডঙ্কা বাজাচ্ছিস, গলায় দুটো বোন ঝুলছে, এত্ত বড় সংসার, একজন তো বিয়ে করে বউ বগলে করে মোগলসরাই পালাল, আর একজন রাস্তার ষাঁড় হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে! লজ্জা করে না তোদের, একটা মানুষ আগুনের আঁচে রক্ত শুকিয়ে পয়সা আনছে, আর তোরা খাচ্ছিস দাচ্ছিস ঘুরে বেড়াচ্ছিস। নেমকহারাম, নচ্ছার কোথাকার। এ-সব শুয়োরের জাত আবার মানুষ পেটে ধরে। মরগে যা—। মা'র কথাগুলো বলতে বলতে অভয়ের গলা মিইয়ে মুখ ম্রিয়মাণ হল।

টেবিলটা হঠাৎ চুপচাপ। কেষ্ট চা রেখে গেল, কাপের আওয়াজটুকু যেন চার বন্ধুর কোথাও ঠক্ করে বাজল। শেষে সূর্য বলল, "ছেঁড়া সোল তো রে, এ-জুতো তোর লাগল কেন! নে, চা খা।"

৩

পরের দিন চার বন্ধুই সন্ধ্যের পর পর চারুচন্দ্রের বাড়িতে এসে হাজির। এমনভাবে চারজনে এসেছে যেন চাকরিটা তারা যেমন করেই হোক এ-বাড়ি থেকে কেড়েকুড়ে নিয়ে যাবে। আসলে বুলালির পরামর্শেই চারজনে এসেছে। বুলালি বলেছিল, "দেখ, চারুটা কালা, কথা বললে শুনতে পায় না, আমি কালা-ফালার সঙ্গে-কথা বলতে পারি না, মেজাজ বিগড়ে যায়, মুখ খারাপ করে ফেলব। তাছাড়া চারু আমাদের সূর্যর বাবার বন্ধু, সূর্য সঙ্গে থাকলে খুঁটির জোর হবে। কৃপা ফাস্ট্ কেলাস তেলিয়ে নরম নরম কথা বলবে, ও ছাড়া আমাদের মধ্যে কথা বলার কেউ নেই, কৃপাও চলুক। সেই ফাঁকে মাইরি, মউচুসটা একবার দেখে নিবি সকলে।'

আসবার সময় প্রায় সকলেরই মনে কেমন একটা কর্তব্য-কর্তব্য ভাব ছিল, বাড়ির কাছাকাছি এসে মনের এই গুরু ভাবটা কেন যেন হতাশ-মতন হয়ে এল। চারু কি সত্যিই তাদের কথায় পাত্তা দেবে, পটবে? সন্দেহটা কৃপাময়েরই প্রথম হল, বলল, 'দেখ, আমাদের ওপর চারুর পিরীত নেই, সার্টিফিকেট চাইলে ব্যাড ক্যারেকটার লিখে দেবে। একবার আমরা ওকে হুলিয়া দিয়েছিলাম পুজোর সময়, সে মাইরি ভোলেনি।' কৃপাময়ের সন্দেহ সূর্যর মধ্যেও সংক্রামিত হল। সূর্য বলল, 'বুলালি বেটাব সব জোর জবরদস্তি। আমার বাবার সঙ্গে চারুর আর খাতিরটাতির নেই, ও বাবার বন্ধু না ইয়ে! আমার যাওয়ায় কোনো ফায়দা হবে না।' বুলালিও অসহায় বোধ করে বলল, 'আমি যে কথাই বলতে পারি না, অভয়টাও ডাম্ব। ছেড়ে দে, অত ভেবে কি হবে, চল তো, চাকরি না দেয় না দেবে, একটু মজা করে আসা যাবে।...না হয়, চারুর মেয়ের সম্বন্ধ করেই আসব শালা। কি রে অভয়?'

চারুবাবুর বাইরের ঘরে চার বন্ধু এসে বসল। চাকর ঘরে এনে বসিয়ে বাতি জেবলে, পাখা খুলে দিয়ে চলে গেছে। ঘরটা মাঝারি, মোটামুটি আসবাব-পত্র, কিন্তু পরিষ্কার ছিমছাম করে সাজানো। শোনা যায়, চারুগিন্নীর দাদা কলকাতার নামকরা ছবি আঁকিয়ে ছিল, বাড়িতে ছবি ছড়াছড়ি যেত। ছেলে-বেলা থেকেই চারুগিন্নী ছবির মন পেয়েছে। বিয়ের আগে শান্তিনিকেতন যেত প্রায়ই, গিয়ে গিয়ে রুচি তৈরী করেছে। তা এ-সব সত্যি হোক, মিথ্যে হোক—বাড়ি-ঘর-দোর থেকে শুরু করে মেয়েদের পর্যন্ত চারুগিন্নী যতটা পারে

ফিটফাট ছিমছাম করে রাখে। বাড়িতে কেউ এলে দরজা খুলে বসানো, কর্তা বাড়িতে না থাকলে মেয়েদের পাঠিয়ে মিষ্টি করে কথা বলানো—এ-সবই চারুগিন্নীর শিক্ষা। পাড়ায় চারুগিন্নী এবং তার মেয়েদের চলাবলা, সাজসজ্জা, ঘরদোর সাজানোর খ্যাতি এবং টিটকিরি আছে।

সূর্য অনেককাল এ-বাড়ি আসেনি, কৃপাময়ও নয়। বুলালি আর অভয় কাল সকালেই এসেছিল। ঘরের চারদিকে চোখ বুলিয়ে দেখছিল সূর্য; কৃপাময়ও দেখছিল। বেতের হালকা হালকা চেয়ার, পাতলা গদি, পিঠের দিকে একফালি করে গদির কাপড়; মাঝ-মধ্যিখানে একটা কাঠের গোল নিচু-পায়া সেন্টার-টেবিল, টেবিলের ওপর কাজ করা ঢাকনা, জানলা ঘেঁষে ছোট মতন একটা চৌকি, চৌকির ওপর নকশা করা চাদর। ঘরের এক পাশে ছোট মাপের আলমারি, বইপত্র সাজানো, আলমারির মাথায় টুকটাক জিনিস : শাঁখ, কড়ির পাখি, মাটির বুদ্ধদেব, ধূপদানি। দেওয়ালে মাঝারি আকারের একটা দেওয়াল ঘড়ি, গোটা তিনেক বাঁধানো ছবি, একটা ক্যালেন্ডার।

সূর্য উঠে দাঁড়িয়ে পশ্চিমের দেওয়ালের দিকে গেল। তার মাথার সমান সমান উঁচুতে একটা ফটো টাঙানো। ফটোটা দেখতে দেখতে সূর্য ইশারায় কৃপাময়কে ডাকল। কৃপাময় উঠে কাছে গেল। সূর্য আঙুল দিয়ে ফটোটা দেখিয়ে বলল, "দেখ তো, ওই তলার দিকের মেয়েটা সুমি কিনা?"

কৃপাময় দেখল, বলল, "সুমিই তো।...তুইও আছিস।"

সূর্য নিজেকে আগেই দেখেছিল, আবার দেখল। এই ফটো দেখলে এখন হাসি পায়। কতদিনের পুরনো ছবি, বারো চোদ্দ পনেরো বছরের! নাকি অত পুরনো নয়! বেশ পুরনোই, সূর্য তখন স্কুলে পড়ত, এইট-ফেইটে হবে, তখন রেলের মাঠে মেলা হয়েছিল একবার, শীত-মেলা, মেলায় সূর্য ছেলে ভলেন্টিয়ার, সুমি মেয়ে ভলেন্টিয়ার। বড় ভলেন্টিয়ার অনেক ছিল, তারাও ছিল বাচ্চা ভলেন্টিয়ার। মেলার মধ্যে একপাল বাচ্চা ভলেন্টিয়ার রোদে, শীতে, ধুলোয়, আলোতে, সন্ধ্যেতে হুড় করে বেড়াত। কাজ করার জন্যে হুটোপাটি ছুটো-ছুটি। আর ভলেন্টিয়ার স্টলে রুটি মাখন জেলি চা কেড়েকুড়ে খাওয়া, একেবারে মুখ থেকে, কখনো বা দয়া করে একে অন্যকে অর্ধেক দান করত। একদিন সন্ধ্যের পর ভয়ঙ্কর শীতে, মেলায় টিনের সিনেমা ঘরে যখন 'দেবদাস' দেখানো হচ্ছে, সূর্য আর সুমি—দুই ভলেন্টিয়ার সূর্যর গরম কোটের তলায় মাথা ঢেকে কোটের দুটো লম্বা হাতা দুজনের দুপাশে কানের মতন ঝুলিয়ে 'দেবদাস' দেখছিল। দেখতে দেখতে বিশ্বসংসার ভুলে গিয়েছিল মনেও ছিল না ওরা মেয়েদের দিকে একটা কাঠের সরু বেঞ্চিতে বসে আছে। বই শেষ হয়ে যাবার পর সুমি চোখ মুছতে মুছতে বলল, 'তোর কোটের ঝাপটা লেগে আমার চোখ কেটে গেছে।' জবাবে সূর্য বলেছিল, 'তোর চুলের ক্লিপে আমার খোঁচা লেগেছে চোখে।' তারপর এ ওকে 'মিথ্যুক' বলল, ও অন্যকে 'মিথ্যুক' বলল। তারপর ভিড়ের মধ্যে দুজনে দুজনকে ধরে হারিয়ে গেল।

সূর্য ফটোটা দেখতে দেখতে নিশ্বাস ফেলে বলল, "এই ফটোটা চারুকাকা তুলেছিল, শীতের মেলায়। তুই সেদিন ছিলি না।" সূর্য হঠাৎ যেন ভুল করে চারুকাকা বলে ফেলল।

কৃপা বলল, "তোরা সবাই ভলেণ্টিয়ারের ব্যাজ্ পরে আছিস।"

সূর্য হাত বাড়িয়ে আঙুল দিয়ে কাচের ওপর নিজের ছবিটা দেখাল। "কি রকম চেহারাটা ছিল মাইরি আমার, না!"

"লালটু—" কৃপা বলল, বলে হাসল।

সূর্য যেন কান করল না কথাটায়, সুমির ফ্রকপরা, বিনুনি-করা চেহারার ওপর আঙুল বুলোতে বুলোতে বিষণ্ণ গলায় বলল, "মেয়েরা কত তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যায়, মাইরি। সুমির কবে বিয়ে হয়ে গেছে। মনেই নেই। কোথায় থাকে রে আজকাল?"

কৃপাময় জানত না। বলল, "কি জানি! কবে একবার দেখেছিলাম। মুটকি হয়ে গেছে। ছেলেকে রিকশায় বসিয়ে যাচ্ছিল!"

সূর্য কিছু বলল না। হঠাৎ তার মনে হল অনেকদিন পরে যেন সুমির চুলের ক্লিপের খোঁচাটা অনুভব করতে পারছে আবার। মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে সূর্য অন্যদিকে চলে গেল।

চারুবাবু আসছেন, পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে।

কৃপাময় তাড়াতাড়ি ফিরে এসে নিজের জায়গায় বসল। বুলি আর অভয় মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। অভয়ের মুখ শুকিয়ে আসছে। বুলি শার্টের কলারটা তুলে নিল। সূর্যও নিজের জায়গায় ফিরে এল, বসল না।

চারুবাবু ঘরে এলেন। কৃপাময় শিখিয়ে রেখেছিল, 'চারুদন্ত ঘরে এলেই উঠে দাঁড়াবি, বসলে বসবি, উঠলে উঠবি, হাসলে হাসবি...।' কৃপাময়ের শিক্ষা মতন ওরা উঠে দাঁড়াল।

হাসি হাসি মুখ নিয়েই চারুবাবু ঘরে ঢুকেছিলেন: হৃষ্টপুষ্ট মানুষ, গোলগাল মুখের সঙ্গে হাসিটা বেশ মানানসই, চোখের তলায় সামান্য গড়িয়ে থাকা চশমার মতন তাঁর হাসিটিও ঠোঁটের তলায় চিবুক পর্যন্ত গড়িয়ে রয়েছে। পরনে পাতলা ধুতি, গায়ে হাফ-হাতা ফতুয়া-ধরনের পাঞ্জাবি, পকেট-টকেট নেই, পায়ে চটি। চারুবাবু ঘরে ঢুকে চারটি ছেলের ওপর চোখ বুলিয়ে নিতে নিতে হাসিমুখেই বললেন, "আরে, চার মূর্তি যে! কি খবর? কেমন আছ সব? বসো বসো বসো।"

ওরা বসল না, কেননা চারুবাবু তখনও বসেননি। চারুবাবুর হাতে একটা খবরের কাগজ, সিগারেটের প্যাকেট, দেশলাই। মাথার ওপর পাখাটার দিকে একবার তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে নিলেন, কতটা জোরে ঘুরছে, ঘরে ভাল বাতাস হচ্ছে কিনা পরখ করে নিলেন যেন, তারপর একটা চেয়ারে বসলেন। "বসো, বসো তোমরা।"

বুলি কৃপাময়ের দিকে তাকাল; চোখ বলছিল, কি রে বসব এবার?

কৃপাময় চোখে চোখে সম্মতি জানাতে ওরা বসল। সূর্যও বসে পড়ল।

চারুবাবু হাতের কাগজ, সিগারেট দেশলাই সামনের গোল টেবিলে নামিয়ে রাখলেন। "বলো, তোমাদের খবর বলো। কি ব্যাপার—" বলে চারুবাবু অভয় এবং বুলালির দিকে তাকালেন, "তোমরা দুজন কাল এসেছিলে তো!"

বুলালি মাথা নাড়ল। "আপনি আজ আসতে বলেছিলেন।"

চারুবাবু শোনার চেষ্টা করলেন। "আমি খানিকটা আগেই ফিরেছি।"

বুলালি স্পষ্ট বুঝতে পারল, তার কথা চারু শুনতে পায়নি। এবার জোরে জোরে বলল, "আপনি আমাদের আজ আসতে বলেছিলেন।"

"ও! হ্যাঁ, হ্যাঁ...। কি ব্যাপারটা বলো তো?"

"একটি চাকরি। এই অভয়ের জন্যে।"

"চাকরি!" চারুবাবু অভয়ের দিকে তাকালেন। তাঁর চোখমুখে সেই একই রকম হাসি। হাসি দেখে মনে হচ্ছিল, চাকরি যেন কিছুই নয়, এর জন্যে আবার বলা কেন, নিও, যাবার সময় নিয়ে যেও। কোনো কৌতুক উপভোগ করার মতন চারুবাবু প্রার্থনাটা উপভোগ করতে লাগলেন। তারপর কৃপাময়ের দিকে তাকালেন, কৃপাময় নিরীহের মতন মুখ করে মুখটা হাসি-হাসি করল। চারুবাবু সূর্যর দিকে তাকালেন, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন, "বাবা কেমন আছেন, সূর্য?"

"ভাল!" সূর্য ছোট করে জবাব দিল।

"কি হয়েছে?"

সূর্য এবার গলা জোর করে বলল, "বাবা ভাল আছে।"

"ভাল!...ভাল থাকলেই ভাল। বয়েস হয়ে যাচ্ছে কিনা, আজকাল বয়েস হলেই চিন্তা...। তোমার বাবার সুগার কেমন? আমার আজকাল সুগার বেড়েছে। ডাক্তার বলছিল মিষ্টিটিফিষ্টি, আলু বাদ দিতে। তা দিয়েছি অনেকটা। বড় ধরাকাটা। চায়ে আধ চামচে মতন খাই, না খেয়ে পারি না।...তা তোমরা একটু চা খাবে না?"

কৃপাময় তাড়াতাড়ি বলল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, খাব।"

"আমাদের এজ্-এ সুগারটাই ভয়ের। ধরলে আর রক্ষে নেই।"

"সুগারটা কি জিনিস সূর্য ভাল বুঝল না। তার বাবার সুগার বেশি, না চারুর? চারুর আজকাল সুগার হয়েছে নাকি? খুব সুগার? সূর্য মনে মনে বলল, তোমার বুঝি খুব সুগার আজকাল?

চারুবাবু বললেন, "আর-একটা ফ্যাসাদ হল, প্রেসার। প্রেসারের আজকাল ছড়াছড়ি! তোমার বাবার প্রেসার কি রকম?"

সূর্য কিছু খেয়াল না করেই বলল, "খুব।"

"খু—ব! কত?" চারুবাবু যেন উৎসাহিত হয়ে উঠেছেন। "হাই প্রেসার ভাল না। মোস্ট ডেনজারাস। সেরিব্রাল থ্রমবসিস হামেশা হচ্ছে। আমাদের ফ্যাক্টরীতে দিন পনেরো আগে কোকো-ভ্যানের এক ফোরম্যান, হার্ডলি ফিফটি

টু থ্রি হবে, ফ্যাক্টরিতেই মারা গেল।...তোমার বাবা কি খাচ্ছেন? আজকাল প্রেসার লো রাখার অনেক ওষুধ। আমার একটু হব-হব হয়েছিল, ক'দিন একটা ট্যাবলেট খেলুম, বিলেতী। তা সূর্য, তোমার বাবাকে ওটা খেতে বলতে পার।... দি আদার থিং, পিস্ অব মাইণ্ড্। মনের শান্তি দরকার। হইহই, হুড়োহুড়ি, কাজ কাজ কাজ, রাজ্যের ওআরি—মানে দুশ্চিন্তায় আমাদের নার্ভে কনস্টান্ট প্রেসার পড়ে। দ্যাট্ ইজ্ ব্যাড ফর হেলথ্।...তোমার বাবার অবশ্য মিউনিসি-প্যালিটির ঝঞ্ঝাটটাই মস্ত বোঝা। আবার যে কেন উনি মিউনিসিপ্যালিটিতে থাকতে গেলেন আমি বুঝি না। আই ওয়ার্নড্ হিম। তা ধরো তোমার বাবা আমার চেয়ে বয়সে বছর দশেকের বড় তো হবেনই, আমার শরীরই ওয়ার্নিং দিচ্ছে তো তোমার বাবার। অথচ আমি লেস্ ওয়ারি নিয়ে থাকি, হাঁসিখুশি মনে থাকবার চেষ্টা করি।...এই তো তোমরা আসবার আগে ফ্যাক্টরি থেকে ফিরে গা হাত ধুয়ে চা-টা খেয়ে ঝুমিদের সঙ্গে গানটান করছিলুম। ঝুমিরুমি রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইছিল, আমি তবলায় ঠেকা দিচ্ছিলাম। তবলায় আমার এক-কালে হাত ছিল, বাজাতাম-টাজাতাম বাড়িতে, তারপর আর চর্চা কই।...ওই মাঝে মাঝে...”

“শালা তবলচি”, বুলালি নীচু গলায় বলল।

অভয় চমকে উঠল, মুখ শুকিয়ে কেমন হয়ে গেছে। বুলালির দিকে তাকাল, শালা করছে কি?

“কিছু বললে?”

“আজ্ঞে না,” বুলালি মাথা নাড়ল, “অভয়কে বলছিলাম।”

সূর্য এবং কৃপাময়ও বুলালির মুখের দিকে তাকিয়েছিল। অস্পষ্টভাবে ওরা হাসছে।

কৃপাময় চারুবাবুর মুখের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে বলল, “আপনি গান-বাজনা করতেন আমরা জানি।”

জানো?...দেখ বাপু, গানে মন বড় ভাল করে। আমি দেখেছি..”

“কী বাজে টাইম লস্ট করছে, মাইরি। আর শালা সহ্য হচ্ছে না।” বুলালি গলা খাটো করে বলল।

অভয় ভীতু হয়ে বুলালির জানুতে কনুইয়ের গুঁতো মারল। “কি করছিস বুলালি?”

চারুবাবু গানের কথা কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, কৃপাময় বলল, “আপনার গলাও বেশ মিষ্টি ছিল। সায়গলের মতন।”

“তোমরা আমার গান শুনেছ? কার মতন বললে?” চারুবাবু খুব খুশী হয়ে উঠেছেন।

“খুব অয়েল মার, কৃপা—” বুলালি খাটো গলায় বলল, “অয়েলের ওপর ফেলে ঠেলে দে—গড়িয়ে যাবে।”

কৃপাময় বুলালির দিকে তাকাল না, শান্তশিষ্ট নিরীহ মুখ করে বলল,

"আপনি, কি বলে সেই পুজোর সময়..."

"ঠিক বলেছ। তোমার মনে আছে তাহলে! গুপ্তবাবু, চিন্তাহরণদা—এরা সব ছিল তখন, আমরা একদিন থিয়েটার করতুম। থিয়েটারে গিয়েছি।"

সূর্য অধৈর্য হয়ে উঠছিল। আস্তে করে বলল, "কি ফালতু কথা বলছিস, চাকরির কথাটা বল বেটাকে।"

চারুবাবুর দৃষ্টি ছিল সূর্যর ওপর, তিনি সূর্যকে মুখ নাড়তে দেখলেন। "কি বলছ, সূর্য?"

সূর্য একটু যেন থমকে গিয়েছিল, সামলে নিয়ে বলল, "আজ্ঞে না, আমরা এক জায়গায় যাব।" বলে সূর্য ঘড়ির দিকে তাকাল।

কৃপাময় সূর্যকে বলল, "যাব, এই তো—চা খেয়ে চলে যাব!"

"চা, তাই তো—দেখেছ, কথায় কথায় তোমাদের চায়ের কথা বলে আসতে ভুলে গেছি। বসো, বলে আসি, এখুনি হয়ে যাবে।" চারুবাবু যেন সত্যিই সঙ্কোচ অনুভব করলেন। হাত বাড়িয়ে সিগারেটের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট নিয়ে ধরিয়ে চটির শব্দ তুলে চায়ের কথা বলতে ভেতরে চলে গেলেন।

বুলালি কৃপাময়কে বলল, "কি রে, এখানে লেকচার শুনতে এসেছিস নাকি? খুব যে পলতে ওসকাচ্ছিস!"

অভয় বিরক্ত হয়ে বলল, "বুলালি, তুই খুব খারাপ করছিস। একটা কথা যদি বাইচান্স ওর কানে যায়—"

"গেলে ইয়ে হবে আমার।"

"আমার ক্ষতি হবে," অভয় বলল।

"তোর লাভই হল না, তো ক্ষতি!" বুলালি জবাব দিল।

সূর্য বলল, "কৃপা, তুই আবার চায়ের ঝামেলা বাধালি কেন? চায়ের নাম করে ও আবার সুগার ঢালবে। সুগারটা কি রে?"

"ডায়বেটিস হ'ল পেচ্ছাপে থাকে। তোর বাবার ডায়বেটিস আছে?" কৃপাময় বলল।

"বহুমূত্র?"

"হ্যাঁ।"

"হ্যাত্ শালা!...বাবার কি আছে আমি কি করে জানব? কী কারবার মাইরি! চেরোটার বহুমূত্র আছে।"

তিনজনেই সামান্য জোরে হেসে ফেলল, অভয় তেমন হাসল না।

বুলালি বলল, "দেখ, সাইন্ কিন্তু ভাল না। তুই যতই পটাবার চেষ্টা কর কৃপা, আমার মনে হচ্ছে চারু পটছে না।.. দেখলি না, একবার শুধু 'চাকরি' বলে বেমালুম কেমন চেপে গেল কথাটা।

সূর্য বলল, "অত তেলাবার কি আছে। সাফ চাকরির কথা আবার বল। হয় হ্যাঁ বলবে না হয় না। ফরনাথিং ওর সুগারের গন্ধ আমরা শুঁকবো কেন?"

"দাঁড়া না," কৃপাময় বলল, "অত ঘাবড়াচ্ছিস কেন! চাকরির কথা বলব

আবার। কিন্তু ও যেমন আমাদের জ্বালাচ্ছে তেমনি ওকেও একটু জ্বালিয়ে যাব, টিট্ ফর ট্যাট্। এই বুলালি, সিগারেটের প্যাকেটটা দেখ তো ওর, ক'টা আছে?"

বুলালি মুহূর্তের জন্যে দ্বিধা বোধ করল, তারপর হাত বাড়িয়ে প্যাকেটটা তুলে নিয়ে দেখল। "নতুন প্যাকেট মাইরি, আটটা আছে। ক্যাপস্টান।"

"গোটা ছয়েক নিয়ে নে।" কৃপা গম্ভীর স্বরে হুকুম করল।

অভয় খানিকটা বিমূঢ় হল যেন। "অ্যাই, অ্যাই...তোরা মাইরি কি করছিস! এসব খচড়ামি করলে..."

"থাম", কৃপাময় ধমক দিল, "খচড়ার সঙ্গে খচড়ামি করব না তো কি করব রে!"

বুলালি ছ'টা সিগারেট বের করে নিয়ে প্যাকেটটা আবার যথাস্থানে রেখে দিল। দিয়ে দরজার দিকে তাকিয়ে মিঠে করে ধীরে শিস দিল।

অভয় রীতিমত ঘাবড়ে গিয়ে বলল, "যাঃ, যা করলি তোরা। ধরা পড়ে যাব।"

"তোর আজ হল কী অভয়?" বুলালি সন্দিগ্ধ চোখের ভান করে শুধলো, "অত যাঃ যাঃ করছিস! কি ফুটছে রে, আলপিন?"

অভয় কিছু একটা জবাব দেবার চেষ্টা করেও কথা খুঁজে পেল না। চাকরির আশাটা সে এখনও করছে বলেই বোধ হয় এই ধরনের ব্যাপারে অস্বস্তি বোধ করছিল। নয়ত করত কিনা সন্দেহ! এরকম শয়তানি তারা হামেশাই করে, বরং আরও বেশি। অভয় নিজেই করেছে। এই তো সেবার কার বাড়িতে তারা গিয়েছিল। বাড়ির কর্তা তাদের আসছি বলে নীচের ঘরে ঘণ্টাটাক বসিয়ে রেখেছিল; পরিণামে সেই ঘরের তিনটে বাল্‌ব, গোটা দুয়েক জানলার পরদা, মায় পেতলের বাহারী ধূপদানিটা পর্যন্ত আর ঘরে থাকেনি। বাড়ির কর্তা ফিরে এসে নিশ্চয় ঘর অন্ধকার দেখেছিল, দরজা হাট করে খোলা।

সূর্য বলল, "হ্যাঁরে বুলালি, কাল তোরা যাকে দেখেছিলি সেই মেয়েটা কি ঝুমি, না রুমি?"

"কে জানে! ঝুমিটুমি চিনি না।"

"কই আজকে তো দেখছি না!"

"কি জানি! আমার মেজাজ বিগড়ে যাচ্ছে। ঝুমঝুমিটা আসছে না কেন রে, অভয়?"

"আসবে কেন?"

"কেন, এলে কি ক্ষতি! আমি নিয়ে কেটে পড়ব? না খেয়ে ফেলব?"

"তুই বড্ড বাজে বকিস।"

সূর্য হঠাৎ হেসে বলল, "তোর শালা কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই, বুলালি; বুদ্ধু কাঁহাকার!...অভয় যদি জামাই হয়, সুগারের জামাই, তবে ওই মেয়েটা কি হল—?"

বুললি সূর্যর চোখ থেকে যেন রসিকতাটা চুম্বকের মতন টেনে নিল নিজের চোখে, তারপর সমস্ত মুখ সোল্লাস ভঙ্গিতে জ্বালিয়ে অভয়ের দিকে তাকাল। "আয় সাবাশ, তোর বউ রে অভয়, মেয়েটা তবে তোর বউ।...রা-জ্‌জা, আমার রা-জ্‌জা রে..." বলে দাঁত ঘষে অভয়ের উরুর উপর জোরে এক থাপ্পড় মারল। অভয় 'উঃ!' করে উঠল। সূর্য এবং কৃপাময় হাসতে থাকল।

চারুবাবু ফিরে আসছেন। চটির শব্দে ওরা সতর্ক হয়ে শান্তশিষ্টভাবে বসল।

চারুবাবু হাসিমুখেই ঘরে ঢুকলেন, ঘরে ঢুকে চারজনের মুখের ওপর চোখ বুলোতে বুলোতে নিজের চেয়ারে এসে বসলেন। বাড়ির মধ্যে থেকে যেন অন্য কোনো নতুন হাসি নিয়ে এসেছেন! ঠোঁটের ডগায় কথা ঝুলছে। "তখন কি যেন বলছিলাম। গান-বাজনার কথা। বাড়িতে তাই বলছিলাম তোমাদের কাকিমাকে। বলছিলাম, কৃপাময়টার স্মৃতিশক্তি খুব ভাল...আমাদের সেই থিয়েটার-টিয়েটার করার কথা মনে রেখেছে।...বুঝলে, পুরনো সে সব কথা ভাবলে আনন্দও হয়, আবার দুঃখও হয়। বেশ ছিলাম আমরা, তখন দিলখোলা প্রাণখোলা সব লোক ছিল। আজকাল খালি নোংরামি, দলাদলি। তখন আমরা দুর্গোপুজো করতাম—কী এলাহি কাণ্ড ছিল, দেখেছ তো! কখনও একটা কথা উঠত না। আজকাল নমো-নমো করে পুজো—নেহাত এতকালের পুজো না করলে নয়, তাই। নয়ত লোকজন যা হয়েছে, কারুর সঙ্গে মন মানিয়ে থাকা যায় না। সর্বত্র পলিটিক্স। কেউ কারুর ভাল দেখতে পারে না। হিংসে, রাইভ্যাল্‌রি, পার্টি...। মনটাকে উদার রাখতে না পারলে এই রকমই হবে। এই জন্যে আমি আর আজকাল আগের মতন মেলামেশা, সামাজিকতা করি না। তাসপাশা খেলতুম, বন্ধ করে দিয়েছি; গানবাজনার আড্ডা বসত তাও ছেড়ে দিয়েছি; বসেও না আজকাল। নিজের শান্তি নিজের কাছে। মনের শান্তি নষ্ট করব কেন, ছোট ব্যাপারে মন দিলেই মন ছোট হবে, অশান্তি বাড়বে। পিস অফ মাইন্ড, যা বলছিলুম তোমাদের, পিস অফ মাইন্ড নষ্ট হওয়া মানেই জীবনটাকে খরচের খাতায় ফেলে রাখা। সেই তো প্রেসার. সুগার..."

সূর্য ও বুললি একেবারেই অধৈর্য, আর সহ্য করতে পারছে না। দুজনে চোখাচোখি হয়ে গেল। সূর্য চোখে চোখে কি যেন বুঝিয়ে দিল; বুললি প্রত্যুত্তরে জানাল, 'দাঁড়া—হচ্ছে'। কৃপাময়কে গুঁতো [illegible] বুললি। কৃপাময় গুঁতো খেয়ে পিঠ টান করে বসল।

চারুবাবু আবার কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কৃপাময় বলল, "অভয় আপনার কাছে তাহলে একটা অ্যাপলিকেশন দিয়ে যাবে?"

চারুবাবু যেন আকাশ থেকে পড়লেন। "অ্যাপ্‌লিকেশান! কিসের?"

"চাকরির। আপনাকে কাল ওরা বলে গেছে। আমরা তাই এসেছিলাম।... আগে বললাম না—ওর চাকরির ব্যাপারে আজ আসতে বলেছিলেন!"

পেয়েছে। অভয়ের চাকরি যখন হচ্ছে না, লোকটাও পয়লা নম্বরের হারামজাদা, তখন শয়তানিতে দোষ কি!

কৃপাময় দু' পায়ের হাঁটু দোলাতে দোলাতে খাটো গলায় সুর করে গাইল: "চশমা চারু কানা চারু—এ চারু সে চারু নয়; এ-বেটা যে দুগ্গো চারু, মেয়ে আছে গোটা ছয়।" বলে আলতো হাততালি দিয়ে রামধুনের সুরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ছড়াটা গাইতে লাগল। ছড়াটা পুরনো, সবাই প্রায় জানে।

চারুবাবু কাগজ থেকে মুখ তুলে তাকালেন। কৃপাময় থেমে গেল।

"কিছু বলছ?"

"আজ্ঞে না।" জোবে বলল কৃপা, তাবপর ধীব গলায়, "তোমাব খুব সুগার, না?"

"পিঁপড়ে ধরিয়ে দেব—ডেয়ো পিঁপড়ে", বুলালি বলল।

"একটা দাঁত আবার সোনায় বাঁধিযেছে রে বুলালি, দেখে নে—" সূর্য বলল। "ব্যাটারী মেরে হাসে, শালা।"

অভয় যে কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না; একটা কিছু তার কবতে ইচ্ছে কবছিল। তোর কি দরকার ছিল আজ আসতে বলাখ, কালকেই 'না' বলে দিলে পারতিস। আমরা তোর কাছে ছুটে ছুটে আসব, তেল মারব, তোর লেকচার শুনব—এ সব চেযেছিলি, না? চাকরিব বেলায় অ্যায়সা মুখ করল যেন ঐ জিনিসটা দিনেব বেলাব আকাশের তারা, ত্রিসীমানায় কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

চাকর চা নিয়ে এল, কাঠের ট্রের ওপর নকশা কবা ঢাকনা, তার ওপর চার কাপ চা। চারুবাবু চাকরটাকে এগিয়ে গিয়ে চা দিতে বললেন।

কৃপাময় হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপ তুলে নিল, নিয়ে সূর্যকে দিল। বুলালিও একটা কাপ নিল। অভয় নিচ্ছিল না, কৃপাময় চোখের ইশারায় কি যেন বুঝিয়ে দেওয়ায় কাপ নিল। ট্রে-টা সামনে বেখে চাকর চলে গেল।

কৃপাময় ভীষণ একটা শব্দ কবে চায়ে চুমুক দিল। শব্দটা এত জোর হল যে চারুবাবুও তাকালেন।

চাবুবাবু বললেন, "কি হল?"

"চা-টা খুব ভাল। বেশ দামী চা। কত করে পাউন্ড?"

"কস্টলি চা। আমি খারাপ চা খেতে পারি না।"

"কাপ্তেন।" কৃপাময় খাটো গলায় বলল, মুচকি মুচকি হাসছিল। "গুঁড়ো রদ্দি চা, শালা ফলস্ ঝাড়ছে।"

সূর্য বলল, "কৃপা, চায়ে সুগার পাচ্ছিস?"

"ব্রহ্মমূত্রের বাড়ি রে এটা, সুগার দেয় না।"

বুলালি পেয়ালা থেকে খানিকটা চা মেঝেয় গড়িয়ে দিল। দিয়ে বলল, "সূর্য, বুড়োশালার সামনে দাঁড়িয়ে একটু নাচবি?"

অভয় হাত বাড়িয়ে চায়ের ট্রের ঢাকনাটা তুলে নিয়ে পায়ের চটি মুছল, মুছে বুলালিকে দিল, বুলালি জুতো মুছল। তারপর আড়ালে ছুঁড়ে দিল।

চারুবাবু এবার অভয়ের মুখের দিকে তাকালেন, কয়েক পলক অভয়ের মুখ দেখে কি যেন ভাবলেন, মাথা উঁচিয়ে ফ্যান দেখলেন, তারপর ঘরের দেওয়াল, আলমারি, সূর্যদের মুখ, তার সামনে পড়ে থাকা খবরের কাগজ, সব কিছুর ওপর ধীরে সুস্থে চোখ বুলিয়ে এমন একটা ভাব করলেন যেন মনে হল, চাকরি বস্তুটা যে কি এবং কোথায় তা তিনি কিছুতেই ঠাওর করতে পারছেন না।

কৃপাময় বলল, "অভয় কলেজ পর্যন্ত পড়েছে।"

চারুবাবু বললেন, "চাকরির কথা তো আমি কিছু শুনিনি। কোথায় চাকরি?"

"আপনাদের ডিপার্টমেন্টে।—"

"কই, আমি জানি না।"

"তুই তো বলছিলি আছে, না অভয়?"

অভয় বলল, "হ্যাঁ।—সন্তোষদা আমায় ক'দিন আগে বলেছিল।"

"কোন্ সন্তোষ?"

"টাইপিস্ট।"

"একটা টাইপিস্ট এ-সব খবর কোথা থেকে জানবে হে! আমি কিছু জানি না। চাকরির জন্যে আজকাল কত কোয়ালিফায়েড ছেলে পাওয়া যায়।" বলে চারুবাবু মুখের হাসি চিবুক থেকে টেনে ঠোঁটে তুলে নিলেন, ঠিক যেমন করে নাকের কাছে গড়ানো চশমা চোখে তুলে নেয় লোকে! হাত বাড়িয়ে খবরের কাগজটা নিয়ে পাট খুললেন এবার, আস্তে আস্তে। পাট খুলে প্রথম পাতাটা দেখতে দেখতে একেবারে অন্য মানুষ।

কৃপাময় অভয়ের দিকে চেয়ে ছিল। অভয় সবই বুঝতে পারল। না, বিন্দু-মাত্র আশা নেই। অকারণ লোকটা কাল থেকে ঘোরাল কেন? কি জন্যে?

সূর্য ডাকল, "বুললি—!"

বুললি সাড়া দিল, "বল্।"

"চারুর টমটমে একটা ঝাড়ব?"

"ঝাড়। গুলতি আছে পকেটে?"

"না, নিয়ে আসিনি।"

"তবে আর ঝাড়বি কি করে!..আমি আগেই বলেছিলাম, শ্বশুরশালার ভাবগতিক ভাল না, জামাই পছন্দ হচ্ছে না।"

কৃপাময় বলল, "শ্বশুরকে একটু রগড়ে দিয়ে যাই! কি বল?"

অভয় হঠাৎ বলল, "কী মানুষ মাইরি! হারামীর রাজা।"

চারুবাবু বুঝতে পারছিলেন ছেলেগুলো কিছু বলছে, কি বলছে শুনতে পাচ্ছিলেন না। কাগজের প্রথম পাতার তলার দিকে নজর দিলেন, প্রায় আপন মনে যেন বললেন, "পপুলেসান যা ইনক্রিজ করছে! ভাববার কথা..."

চারজনে চোখাচোখি হয়ে গেল। এতক্ষণে ওদের পুরোপুরি শয়তানিতে

অভয় বলল, "যাবার সময় আমি খেমটা নাচ দিয়ে যাব।"

কৃপাময় জোরে জোরে বলল, "ঝুমি নাচতে পারে?"

চারুবাবু তাকালেন। "কি বলছ?"

"ঝুমি নাচতে পারে?"

"না, নাচটাচ জানে না।"

"ও!...গাইতে তো পারেই বললেন।"

"গাইতে পারে।...কেন?" চারুবাবু অবাক হচ্ছিলেন।

কৃপাময় নিরীহ মুখে বলল, "দেখতে তো ভালই। আমরা ছোটবেলায় দেখেছি..."

"কেন বলো তো?" চারুবাবু কাগজ কোলের ওপর নামিয়ে রেখে শুধোলেন।

"না, জিজ্ঞেস করছিলাম। ..কাল কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেখছিলাম কিনা, তাই হঠাৎ মনে পড়ল।"

"কিসের বিজ্ঞাপন?"

"বিয়ের। পাত্রী চাই। বৈদ্য পাত্রী।...পাত্র খুব ভাল, মাসিক উপার্জন... কত যেন দেখলাম অভয়?"

অভয় প্রথমটায় হকচকিয়ে গিয়েছিল, পরে বলল, "প্রচুর...অনেক।"

চারুবাবুর মুখের চেহারা বদলে গেল। গম্ভীর হয়ে উঠলেন। কাগজটা আবার কোল থেকে তুলে নিলেন।

সূর্য বলল, "কালা শুনেছে বে। নে, এবার চল।"

অভয় বলল, "নাচবি তো?"

কৃপাময় জোরে জোবে বলল, "কাল আপনাকে কাগজটা পাঠিয়ে দেব।... বাংলা কাগজে আছে। ইংরিজী কাগজে পাত্রপাত্রী থাকে না।"

চারুবাবুর মুখ থমথমে হয়ে উঠল। বললেন, "না, কাগজ পাঠাতে হবে না।"

কৃপাময় উঠে দাঁড়াল। "তবু একবার দেখুন।...পছন্দ হলে দুর্গা পুজোর পর দিয়ে দেবেন। আমরা সব খেটেখুটে দিয়ে যাব।"

চারুবাবুর ফরসা মুখ লাল হয়ে উঠল।

কৃপাময় গলা নামিয়ে বলল, "নে. এবার চ। অভয় তোর কাপটা ভেঙে দিয়ে যা।"

অভয় সত্যি সত্যি উঠে দাঁড়িয়ে হাত থেকে কাপটা ফেলে দিল। চারুবাবু চমকে উঠলেন।

কৃপাময় 'ইস—স্' শব্দ করল, যেন কত বড় একটা অন্যায় ঘটে গেছে। তারপর মেঝেতে বসে কাপের ভাঙা টুকরো ক'টা কুড়িয়ে ট্রের ওপর রাখল। "ইস...কাপটা ভেঙে গেল! দামী কাপ! ক্ষতি করে গেলাম।"

চারুবাবু কোনরকমে বললেন, "তোমরা এসো।"

চারজন জড় হয়ে চলে আসছিল। আসার সময় বুলালি পিঠ নুইয়ে পেছন দিকটা বার কয়েক দুলিয়ে হাস্যকর একটা ভঙ্গি করল, অভয় এক কোমরে হাত দিয়ে হেলেদুলে এক পাক ঘুরে সবার শেষে বেরুল।

বাইরে এসে সাইকেল নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সূর্য বলল, "চারুর শিক্ষা হয়ে গেছে, কি বল?"

বুলালি বলল, "তেমন হল না। আমাদের পজিসানটা দূরে ছিল, নয়ত আরও কিছু ঝেড়ে দিতাম।"

কৃপাময় বুলালির কাছে সিগারেট চাইল, বলল, "ঝাড়া ক্যাপস্টান দে! গলা শুকিয়ে গেছে।"

সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে ক'পা এগিয়ে এসে অভয় বলল, "লোকটা মাইরি পয়লা নম্বরের হারামী। চাকরি না হবে না হোক, পাড়ার ছেলে গেছি—একটু শুনবি তো কথা—তা না শুধু নিজের কথা।"

কৃপাময় একমুখ ধোঁয়া বুকে টেনে যেন বুকের ফাঁকা ভাবটা ভরাট করল। তারপর ধোঁয়া ফেলতে ফেলতে জ্বালাধরা গলায় বলল, "এই শালাবা তো এই রকমই রে! তোর উপকার তো করবেই না, মন, দিয়ে তোর কথাটাও শুনবে না। খালি শালা লেকচার। লেকচারের বাচ্চা সব।"

চার বন্ধুই আর কোনো কথা বলল না, চুপচাপ হাঁটতে লাগল।

৪

সাইকেলের চাকায় পাম্প দিচ্ছিল বুলালি। পাম্প দেওয়া শেষ হলে উঠে দাঁড়িয়ে চাকা দুটো টিপে টিপে আরও একবার দেখে নিল। মুখ ফেরাতেই দেখল, বউদি; টুকটাক কয়েকটা কাচা জিনিস হাতে করে দাঁড়িয়ে। মুখ দেখে মনে হচ্ছিল, বউদি কিছু বলবে।

বুলালি বলল, "কি, কিছু বলবে নাকি?"

মৃদুলা বলল, "একটু দাঁড়াও, এগুলো রোদে দিয়ে আসি।"

বুলালি দাঁড়িয়ে থাকল। আজ সকাল থেকেই খুব রোদ। ক'টা দিন একটানা বৃষ্টি বাদলার পর আজ আকাশ উথলে রোদ এসেছে; চোখ ঝলসানো রোদ; দেখতেও ভাল লাগছিল।

মৃদুলা বারান্দার ডান দিকে পাশের সিঁড়ি ভেঙে নামল, নীচে করবী-ঝোপ, ছোট ছোট দুটো পেঁপে গাছ। বাঁশের গায়ে জড়ানো কাপড়-টাঙানো তার। পেছনে কলাগাছের ঝোপ, ওপাশে আরও তার টাঙানো রয়েছে। বাড়ির সামনের দিকটায় কাঠের জাফরি, জাফরির গা দিয়ে আলোছায়ার চিককাটা রোদ আসছিল। বুলালি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল, বউদি হাতের টুকটাক জিনিসগুলো শুকোতে দিচ্ছে; তোয়ালে, বালিশের ওয়াড়, রুমাল, গেঞ্জি। দেখতে দেখতে সে হাতের পাম্পটা অন্যমনস্কভাবে চাপছিল, খুলছিল, আবার চাপছিল। পরে কি মনে করে পাম্পটা রেখে আসতে গেল।

বারান্দায় আবার ফিরে এসে বুলালি দেখল, বউদি সিঁড়ির ওপর পা ঘষছে, শাড়িটা গোড়ালির ওপর অল্প তুলে পায়ের ময়লা পরিষ্কার করে নিচ্ছে।

এগিয়ে গিয়ে বুলালি হেসে বলল, "পায়ে একটু ধুলোকাদা লেগে থাক, ওতে তোমার পা ক্ষয়ে যাবে না।"

মৃদুলা পা ঝেড়ে ওপর-সিঁড়িতে উঠে এল। বলল, "এক ফোঁটা ধুলোর জন্যে আবার এখন কুরুক্ষেত্র হবে। দরকার কি?"

বুলালি বউদির মুখ দেখল। মুখটা নরম নয়, হাসিখুশিও নয়। বরং বেশ অপ্রসন্ন। বলল, "আজ কুরুক্ষেত্র আগেই হয়ে গেছে নাকি?"

মৃদুলা সঙ্গে সঙ্গে কোনো জবাব দিল না; শাড়ির আঁচলের যেটুকু ভিজে স্যাঁতসেঁতে হয়েছিল রোদে মেলে নিল। হাতে করে আঁচল মেলে ধরে ছায়াটা দেখছিল। মৃদুলার শাড়ির রঙ সবুজ, ঘন সবুজ; রোদ শাড়ির মধ্যে দিয়ে

সবুজ হয়ে মাটিতে পড়ছিল। মৃদুলা বলল, "আজ সকালে কিছু শোনোনি?"

"না", বুলালি মাথা নাড়ল, "কি হয়েছে?"

"বাব্বা! বাড়িতে কত কি হয়ে গেল, তোমার কানে গেল না?"

"ঘুমোচ্ছিলাম।...কি হয়েছে?"

"সে অনেক।" মৃদুলা যেন আপাতত তা ব্যাখ্যা করতে চাইল না। বলল, "আমার হয়ে একটা কাজ করে দাও। পোস্টাফিসে গিয়ে তোমার দাদাকে একটা টেলিগ্রাম করে দাও, আমায় এসে নিয়ে যাক, আমি এখানে আর থাকতে পারছি না।"

বুলালি বুঝতে পারল, সকালে একটা বড় রকম কিছু হয়েছে। ছোটখাট ব্যাপার ঘটলে একেবারে টেলিগ্রাম পর্যন্ত চড়ত না। কি হয়েছে? মা গালমন্দ করেছে, যাচ্ছেতাই করে বলেছে? সে তো প্রায় নিত্যই লেগে আছে, বউদি এখানে আসার পর থেকেই। তার আগে বউদি ছিল না বলে যা হবার একতরফা হত। বুলালি বউদির চোখমুখ খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে বলল, "দড়াম করে একটা টেলিগ্রাম করে দেব কি! ফেঁসে যাব যে! কারবাবটা কি হয়েছে আগে শুনি।"

কি হয়েছে মৃদুলা বলবে না, শুধু বলল, "তুমি আমার নাম দিয়ে করো।"

বুলালি যেন কৌতুক অনুভব করে জবাব দিল, "তোমার নাম থাকলেই কি আমি বেঁচে যাব। এ শালা খোদ পুলিসের বাড়ি, বড় দারোগাবাবু ঝটাস করে ধরে ফেলবে টেলিগ্রামটা আমিই করেছি।"

"ধরুক", মৃদুলা বলল, "তবু তো আমি বাঁচব।"

বুলালি ব্যাপারটা কিছুতেই আন্দাজ করতে পারছিল না। একটা বড় রকমের গোলমাল যে হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু গোলমালটা কেমন। দাদা বিয়ে করার পর থেকেই বউদিকে নিয়ে একটা গোলমাল এ বাড়িতে লেগে আছে। বিয়েটা বাবা মা—কারও পছন্দ হয়নি। এখনও তারা এটা পছন্দ করে না। বউদিকে মা সহ্য করতে পারে না। বাবাও যে পারে তা নয়, তবু বাবা পুরুষ মানুষ বলে মা'র মতন অনবরত চেঁচামেচি করে না, যা বলার যা করার ধীরে-সুস্থে বলে বা করে, একেবারে হিসেব মতন। আজ সাত-সকালে কাণ্ডটা কি ঘটেছে না জানা পর্যন্ত বুলালি বউদির এই মরিয়া হয়ে যাবার কারণ বুঝতে পারছে না।

বুলালি বলল, "একটা চিঠি লিখে দাও; টেলিগ্রামে আর চিঠিতে তফাত কি, এক দুটো দিন এদিক ওদিক।"

মৃদুলা অসন্তুষ্ট ছিল, অধৈর্য হয়ে বলল, "কেন, তুমি একটা টেলিগ্রাম করতে পার না?"

"পারি, টেলিগ্রাম করা কি এমন হাতি-ঘোড়া কাজ। কিন্তু আমি ফেঁসে যাব। ফাঁসতে আমি রাজী না।"

মৃদুলা বুলালির মুখ লক্ষ্য করে দেখল। তার যেন ঘৃণা হচ্ছিল বুলালির ওপর। বলল, "এত ভয় তোমার?"

বুলালি মৃদুলার চোখে চোখে তাকাল। পরে বলল, "ভয়ের কি! ভয়-ক্ষয় আমার নেই। তোমাদের ঝামেলায় আমি শালা নিজেকে জড়াতে যাব কেন? তোমার হয়ে টেলিগ্রাম করলে বাবা-মা ভাববে আমি তোমার সাইডে। আমি বাবা কারও সাইডে নই।"

মৃদুলার চোখমুখ যেন কয়েক মুহূর্তের জন্যে স্তিমিত হয়ে হঠাৎ বিশ্রীভাবে জ্বলে উঠল। বলল, "তোমাকে সাইডে পাবার জন্যে আমি কাঁদছি যেন! কী আমার উপকারী লোক রে!..তুমি এ বাড়িরই উপযুক্ত ছেলে, নিজের স্বার্থটি ষোলো আনা বোঝ। দয়া-মায়ার বালাই নেই...।"

বুলালি এতক্ষণ চটেনি, সমস্ত ব্যাপারটাই নিস্পৃহভাবে নিয়েছিল, কিছুটা কৌতূহল, সামান্য কৌতুকও তার হয়ত ছিল; মৃদুলার কথায় এবার চটল। বলল, "বেশ দিচ্ছ, মাইরি! তোমরা গব্বা মেরে বিয়ে করলে আর দয়ামায়া দেখাব আমি! আমি তোমায় বিয়ে করেছি? যে করেছে তাকে দয়ামায়া দেখাতে বল।"

"অসভ্যের মতন কথা বলো না," মৃদুলা ধমকে উঠল।

বুলালি মুখ বেঁকিয়ে রাগের মুখে হাসল, "অসভ্যতা করলাম!"

"হ্যাঁ, করলে; আমি তোমার ইয়ার বন্ধু নই, তোমার গুরুজন।"

বুলালির হঠাৎ কেমন হাসি পেল, হাসল না; বিদ্রূপ করে বলল, "গুরুজন আমি অনেক দেখেছি। গুরুজনে যা করে তোমরা কি তাই করেছ?" বলে বুলালি চোখের ইঙ্গিতে বাকিটা বুঝিয়ে দিল।

মৃদুলার মুখ অপমানে কেমন শুকিয়ে আরও কালচে হয়ে গেল। মৃদুলার রঙ কিছুটা কালো, কিন্তু তার সমস্ত শরীরে প্রবল আকর্ষণ আছে। চোখমুখ চটুল, নাকের ডগা ফোলা, গালে ব্রণর দাগ, দাঁত ধবধবে সাদা, এমন একটা পালিশ দাঁতে যে মনে হয় মৃদুলা ছল জানে, হিংস্রতাও জানে। কপাল মাঝারি মৃদুলার, গাল গড়ানো, চিবুক এবং গলার গড়নে নমনীয়তা নেই। শরীরের তার সবই অতি প্রখর, হয়ত তার ভাবভঙ্গির জন্যে এই প্রাখর্য আরও তীব্র হয়েছে।

মৃদুলা কোনো রকমে নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করে বলল, "সভ্যতা ভদ্রতা কিছু শেখোনি?"

বুলালি বিদ্রূপ করে জবাব দিল, "ভদ্দরলোকের বাড়ির বি. এ. পড়া ছুঁড়ি তো নই গো, শিখব কোত্থেকে?"

মৃদুলার মাথা আরও গরম হয়ে উঠল, "শেখোনি যে তা তো দেখতেই পাই; লেখাপড়া শিখলে নিজের বউদিকে ছুঁড়ি বলতে না। ভদ্দরলোকের বাড়ির শিক্ষা পেলেও কথা বলতে শিখতে। তাও শেখোনি।"

বুলালির মাথায় রাগ চড়ে গেল। "তোমার বাপের বাড়ির ভদ্দরলোকেরা তো নিজের মেয়ে বোনকে রাস্তায় ছেড়ে লেলায়। তোমায় যেমন লেলিয়ে ছিল।"

মৃদুলা স্থানকাল ভুলে কেমন যেন ক্ষিপ্ত চিৎকার করে উঠল। তার চোখ নোংরা ও ইতর হয়ে জ্বলছিল। "ছোট লোক, লোচ্ছা, লোফার কোথাকার।"

মুহূর্তের মধ্যে বুলালির সমস্ত চেহারাটাই যেন বদলে গেল, যে কোনো মুহূর্তে সে মৃদুলার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে; ক্রুদ্ধ পশুর মতন তাকে হিংস্র, ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছিল, "কি বললে! ছোটলোক, লোচ্ছা!...এক থাপ্পড়ে তোমার বাপের নাম ভুলিয়ে দেব।" বুলালি রুখে উঠল, "ডাঁট করার জায়গা পাওনি, যত শালা বেজম্মার বংশ ..। হাটো হিঁয়াসে...চলে যাও। গলা টিপে মেরে ফেলব তোমায়। যাও—চলে যাও বলছি।"

মৃদুলা এতটা আশা করেনি, তার যতটা সামর্থ্য ততটাই ফণা তুলেছিল যেন, আচমকা তার চেয়েও বেশী হিংস্রতা দেখল বুলালির; দেখে ভীত, স্তম্ভিত, বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল, নড়ল না। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ কেঁদে ফেলল।

বুলালির সর্বাঙ্গ কাঁপছিল। চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেছে, মৃদুলার মুখও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল না। হাতের আঙুল শক্ত, আগাগুলো বেঁকে গেছে, যেন সত্যিই সে মৃদুলার গলা টিপে ধরবে।

মৃদুলা সামনে থেকে চলে গেল। ভয়ে পালিয়ে যাবার মতন দ্রুত চলে গেল, গলার জড়ানো কান্নাটা শোনা যাচ্ছিল।

বুলালি দাঁতে দাঁতে চেপে ভয়ংকর আক্রোশে কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল। সমস্ত তাপটা যেন তার মাথা ও শরীরের মধ্যে জ্বলছে, অসহ্য লাগছিল। বারান্দার অন্যদিকে চলে গেল বুলালি। এ রকম প্রচণ্ড রাগ, তিক্ততা তার আগে কখনও হয়েছে কিনা মনে পড়ল না। হয়ত হয়নি। মাথা আগুন, কপালের শিরা দপদপ করছে, নিশ্বাস দ্রুত ও গরম। মৃদুলাকে সত্যিই সে মারত। মারার জন্যে হাত উঠে এসেছিল।

কিছুক্ষণ বুলালি একইভাবে দাঁড়িয়ে থেকে রাগটা খানিক সামলাল। তারপর বারান্দায় সামান্য পায়চারি করল। পায়চারি করার সময় দাদা-বউদিকে বেহুঁশের মতন গালাগাল দিল। তারপর বারান্দার এক পাশে পাতা ক্যাম্বিসের চেয়ারে বসল খানিক। শেষে উঠে এসে সাইকেল নিয়ে নীচে নেমে গেল।

বুলালির রাগ যে ঠিক পড়ল তা নয়, তবে মন খানিকটা শান্ত হয়ে এলে বুলালি বুঝতে পারল না, আজ তার এতটা চটে যাবার কারণ কি। মৃদুলা বা তার বউদিকে সে যে পছন্দ করে তা নয়, তবে বাবা-মা যতটা অপছন্দ করে ততটা অপছন্দ সে বউদিকে করে না। বাবা-মা'র অপছন্দ করার কারণ আছে। এই বিয়েটা বাবা-মা'র অজান্তেই প্রায় ঘটেছিল। দাদা একটা কেচ্ছা করে ফেলেছিল। কেচ্ছাটা যদি বাবার এক্তিয়াবের মধ্যে ঘটত তবে বাবা ছেলেকে নিশ্চয় বাঁচাত। কিন্তু তা হয়নি; বাবার যেখানে কোনো হাত নেই, ক্ষমতাও

নেই, সেখানে দাদা কেচ্ছাটা করে ফেলল। তার ওপর দাদার বর্ধমানের চাকরিটাও সরকারী নতুন চাকরি; বাবার সাহস হল না, এই বিয়ে ভেঙে দেয়। বউদির বাবা যেন আঁকশি টাগরায় বসিয়ে বাবার মতন পাকা দারোগাকে টেনে নিয়ে গিয়ে বিয়ের আসরে বসাল। মা চায়নি বাবা যাক; মা বলেছিল, অমন ছেলে মরুক, আমি সাধনের বউকে ঘরে আনব না, ও মেয়ে কুলটা। বিয়ের আগে বউদির পেটে বাচ্চা এসে গিয়েছিল। বাবা পাকা লোক, সাত-পাঁচ ভেবে দেখে বুঝল যে, লোক হাসিয়ে লাভ নেই, মুখের খবর বাতাসের চেয়েও জোরে ছোটে। সাধনের কেলেঙ্কারির খবরটা রটে যাবেই। গেলে মান বাড়বে না। তার চেয়ে লোকচক্ষে ধুলো দেওয়াই ভাল। ছেলে পছন্দ মতন মেয়ে বিয়ে করেছে—এটা আজকাল কেউ খারাপ চোখে দেখবে না। বরং পাঁচজনের কাছে প্রমাণ হবে গুহমশাইয়ের গোঁড়ামি নেই, একেবারে আজকালকার মানুষ তিনি। মনে মনে অবশ্য বাবা হাতের পাখি ধরে রাখল। বিয়ে হোক, কিন্তু বাবার মানমর্যাদা মতন দিতে-থুতে হবে। বউদির বাবা আপত্তি করল না, পয়সাকড়ি কিছুটা আছে, বাবার চাহিদা মতন নগদও পাওয়া গেল। বাবা টাকাটা পেয়ে মুখ বুজে গেল। যেন ওইটুকুই লাভ। বিয়ের পর বর্ধমানেই দাদার ভাড়াটে বাড়িতে বউভাত-টউভাত সেরে বাবা ফিরে এল। মা এবং বুললিও সঙ্গে গিয়েছিল। তারাও ফিরল। কিন্তু বউদিকে মা-বাবা আনল না। আসবার আগে বাবা দাদাকে কিছু বলে এসেছিল কিনা বুললি জানে না। কিন্তু যার জন্যে এত, সেই খোঁড়া গর্তটাই বুজে গেল। বউদির পেটের বাচ্চা নষ্ট হয়ে গেল কিছুদিন পরেই। এটা স্বাভাবিকভাবে হয়েছিল, নাকি কোনো হাত ছিল কারো, বুললি জানে না। থাকতেও পারে। আইন বাঁচিয়ে কাজ। বাবার মান এবং মুখ তাতে বাঁচল, দাদা বউদির মুখও।

মা অন্য ধাতের মানুষ। দাদাকে মা যখন ত্যাগ করতে চেয়েছিল তখন মা'র মধ্যে হিসেব বুদ্ধি ছিল না। মা'র অনেক রকম আশা ছিল: বড় ছেলের বিয়ে দেবে বড় ঘরে। বড় ঘর থেকে মেয়ে আনার সাধ মা'র বরাবর। কোথায় যেন মা তার খুড়তুতো বোনের সঙ্গে চিঠিটিঠিতে এ রকম একটা সম্বন্ধর কথাও চালাচ্ছিল। সে মেয়ে সুন্দরী হত: সুন্দরী, নম্র, শালীন, সৎস্বভাব, বড় ঘর; তারাও মেয়ে-জামাইকে সাজিয়ে দিত। মা'র সে আশা একেবারে নির্মূল হয়ে গেল। তা যাক, তবু মা পরের ব্যাপারটা নিশ্চয় চায়নি। দাদা-বউদির সঙ্গে মা যেমন আর সম্পর্ক রাখতে চায়নি, সেই রকম যা হয়ে গেছে তাকে আবার বদলে ফেলতেও চায়নি। মা কিছু জানত না। বাবাও জানায়নি। পরে যা হয়েছে, বউদির সন্তান নষ্ট, মা তা বিশ্বাস করে না। বিশ্বাস করে না বলেই মা'র সন্দেহ এবং রাগ আরও বেশী বউদির ওপর। ঘেন্নাও। যে জীবহত্যা করেছে তাকে মা কিছুতেই সুনজরে দেখবে না। মাঝে মাঝে মা একেবারে পাগলের মতন হয়ে

যায়, হয়ে গিয়ে বউদিকে যা বলে তাতে কোনো রাখাঢাকা, লজ্জাকালাই থাকে না। বুলালি মা'র মুখ থেকেই এ-ধরনের কথা প্রথম শুনেছিল, শুনে তার পুরো ব্যাপারটা সম্পর্কে সন্দেহ হয়।

তবু সে ভালই ছিল, বউদি যখন এ বাড়িতে আসেনি। এই যে বউদি এসেছে, এসে বাড়িটার চেহারা পালটে গেছে। নিত্য ঝগড়া, রোজই মা'র মুখ গম্ভীর, প্রত্যহ মা ছেলের বউকে থে'তলাচ্ছে। বুলালি বুঝতে পারে না, দাদারই বা এই বছর দেড়েক পরে হঠাৎ মা-বাবার ওপর অত টান উথলে উঠল কেন? বেশ তো ছিলে বাবা, কোপনা-কোপনী, হঠাৎ তোমার কোপনীকে এখানে পাঠাতে সাধ হল কেন? নিজে তো আজ বছর আড়াইয়ের মধ্যে বার দুই মাত্র একা এসে রাত কাটিয়ে গেছ! বউকে পাঠিয়ে সংসারটা একেবারে আঁস্তাকুড় করে দিলে; সারাদিন চেল্লাচেল্লি, খিটিমিটি, ঝগড়া, বউদির নাকি-কান্না, ন্যাকামি—'আমি বিষ খাব, গলায় দড়ি দেব।' দে না, দিয়ে ঝুলে পড়।

বুলালি খুব অন্যমনস্কভাবে সাইকেল চালাচ্ছিল, চালাতে চালাতে সে রাস্তার চৌমাথায় এখুনি একটা বিশ্রী রকম অ্যাকসিডেণ্ট করে ফেলত। তার সাইকেল এবং ছোট মতন একটা প্রাইভেট গাড়ি একেবারে মুখোমুখি, বুলালি বেজায় রকম ধাক্কা খেত, খেয়ে হয় ছিটকে যেত, না হয় গাড়ির সামনে পড়ত। গাড়িটা ব্রেক করে ফেলেছিল, বুলালি দু হাতে প্রাণপণে ব্রেক করলেও সাই-কেলের চাকাটা গিয়ে গাড়ির সামনে লাগল, বুলালি ঠিক পড়ে গেল না, কাত হয়ে পা দিয়ে নিজেকে বাঁচাল।

চৌমাথার ট্রাফিক পুলিস ছুটে এল, রাস্তার পাশে কয়েকটা পথ-চলতি মানুষ চমকে গিয়েছিল ব্রেকের শব্দে, দেখছিল। বুলালি পুলিসটার দিকে তাকাল; কিছু বলল না। বরং যা হয় না, হবার নয়—বুলালি তাই করল, অস্পষ্টভাবে একবার 'সরি' বলে চলে যাচ্ছিল পাশ কাটিয়ে। অথচ পুলিস এসে প্রথমেই বুলালির শরীর এবং তার সাইকেলের তদারক করে গাড়ির বাবুর সঙ্গে দাপটে কথা বলতে লাগল, গাড়ির নম্বর টুকবে বলে পেন্সিল বার করল। গাড়ির বাবু চটে গিয়ে তর্ক করছেন। বুলালি দেখল। কিছু বলল না। দোষ তার, অসাবধানতা তার, জখম হলে নিজের অসাবধানতার জন্যে হত। তবু সে বড় দারোগার ছেলে, পুলিস তার দোষ ধরবে না, বেচারী গাড়িটাকে হয়রানি করবে।

করুক, বুলালি নিস্পৃহের মতন পাশ কাটিয়ে চলে গেল। বরং তার এই উপেক্ষা ভালই লাগছিল।

সামান্য একটু হে'টে এসে বুলালি আবার সাইকেলে চাপল।

বউদিকে দাদা কেন পাঠিয়েছে বুলালি যে একেবারেই না বোঝে তা নয়। বাবা আসছে ফেব্রুয়ারীতে রিটায়ার করছে। রিটায়ার করার আগে বাবা এই শহরে বদলি নিয়ে এসেছে। তার আগে আরও একবার বাবা এই শহরে ছিল। তখন থেকেই বুলালিদের এই শহরের ওপর মন পড়ে যায়। বুলালি তখন স্কুলের

উঁচু ক্লাসে। বছর তিন বাবা তখন এখানে ছিল, তারই মধ্যে শহরের ধাতে জেনে কাজের কাজ যথেষ্ট করে ফেলেছিল। সম্পর্কে এক মামা থাকত পুরনো শহরে; সেই মামার পরামর্শ মতন এবং মা'র তাগিদে তখনকার উঠতি পাড়ায় বাবা খানিকটা জমি কিনেছিল; জলের দরে জমি। বাড়ি করার ইচ্ছে তখন থেকেই। তারপর বাবা বদলি হল কাছাকাছি শহরে, সেখানে আয়ব্যয় তেমন নয়। ওখানে থাকতেই দাদার বিয়ের কেচ্ছাটা ঘটে। বুলালি এখানে সেই মামার বাড়িতে থেকে গিয়েছিল। স্কুলের পর কলেজটলেজ চেষ্টা করেছে। বাবা আবার এই শহরে বদলি করিয়ে নিল। নেবার ক্ষমতা আছে। এখানে রইরই অবস্থা, শহরটা ফাঁপছে ফুলছে, মস্ত হয়ে উঠছে। বাবা চাকরি ছাড়ার আগে যতটা পারে বাড়ির খরচা তুলে নিতে এল। তা বুলালি শুনেছে, এখানে দাগী আসামীরাই বাবাকে মাসে পাঁচ টাকা করে পান খেতে দিয়ে যায়; শ'খানেক দাগী আসামী তো আছেই; ব্যবসাদাররা আরও সদয় হয়ে দেয়, আরও মুক্তহস্তে; মদের দোকান থেকে মাসব্যবস্থা, পিনকি শালা শ'খানেক তো দেয়ই; পানঅলা বিড়িঅলাদের মাসে দু টাকা করে নমস্কারী।

রাজা সিংহাসনে বসতে পায় বলে তার কাছে লোকে মাথা নুইয়ে প্রণামী ঢেলে যায়, যাও না শালা শিবমন্দিরে, পুরুতের থালায় অনবরত পয়সা পড়ছে; যেখানে যা প্রাপ্য তা নিতে দোষ কোথায়! বুলালি কোন দোষ দেখতে পায় না। বাবার চেয়ার বড় দারোগার, যদি লোকে চেয়ারের দাম দেয়, বাবা নেবে না কেন?

আর মাত্র ক'মাস, মাস ছয় সাত; তারপরই বাবর হাত থেকে রাশ চলে যাবে। কেউ আর দারোগা সাহেবকে মাসকাবারি পাওনা দিতে আসবে না। তখন গুহমশাইকে লোকে যে কি বলবে বুলালি জানে। বাবাও জানে। বাবা খুব বিচক্ষণ লোক, যাবার বেলায় সমস্ত কিছু গুছিয়ে ফেলছে। বাড়ির প্ল্যান কবেই তৈরি হয়ে গেছে, মিউনিসিপ্যালিটি থেকেও পাশ হয়ে ফিরে এসেছে; এমন কি বাবা লোহা-কাঠের ব্যবস্থাও সেরে ফেলেছে, এমনভাবে দাদন ধরিয়ে রেখেছে যে পরে গুহমশাইয়ের কাছ থেকে এক পয়সাও বাড়তি নেবার উপায় থাকবে না। এই বর্ষাতেই মা ভিত দেবার কথা বলেছিল, বাবার ইচ্ছে পুজোর পর ভিত পড়ুক। হয়ত তাই হবে, পুজোর পর ভিত পড়বে, তারপর দেখতে দেখতে শীত নাগাদ বাড়ির একতলা শেষ। রিটায়ার করে বাবা তার নিজের বাড়িতে গিয়ে বসবে।

দাদা এসব কথা শুনেছে বা জেনেছে। জেনেছে বলেই বাপ-মা'র কাছে বউ পাঠিয়েছে। দাদা আর বোকামি করতে চায় না। যা হবার হয়ে গেছে, ভবিষ্যতে সে মা-বাবার মনে তার জায়গাটুকু ধরে রাখতে চায়। বউ পাঠিয়ে বাবা-মা'র মন পাবার চেষ্টা করছে দাদা। অন্তত চোখের সামনে বউদি থাকলে বাবা বা মা তাদের বাড়ির অন্য ভাগীদারকে মনে না করে পারবে না। তাছাড়া দাদার বিয়েতে রাজী হবার পর বাবা যে নগদ নিয়েছিল তা বাবার কাছেই আছে; টাকাটা বাবা বাড়ির কাজে খরচ করবে হয়ত। দাদা খুব ভেবেচিন্তেই বুঝিয়ে-

শ্বাঁঝয়ে বউকে এখানে পাঠিয়েছে। পাঠাবার আগে বাবাকে চিঠি, মাকে চিঠি; কত মন-গলানো চিঠি যে লিখেছে! মা'র মন কতটা ভিজেছিল কে জানে! হয়ত সামাজিকতার জন্যে মা বউ আনতে রাজী হয়েছিল। বড় ছেলের বউ এতদিনেও একবার শ্বশুরবাড়ি এল না, এত কাছে থাকে—ব্যাপার কি? লোকের এই সন্দেহ যাতে মা-বাবাকে অন্যের কাছে হেয় না করে হয়ত তাই মা বউ আনতে রাজী হল। দাদা অনেক মন্ত্রতন্ত্র শিখিয়ে বউদিকে পাঠিয়েছিল। বউদি যখন প্রথম এল, আরে ব্বাস, কী ন্যাকামি! মা'র পায়ে পায়ে ঘুরছে, মা'র পায়ের জল দুবেলা চরণামৃত করে খেতে পেলে বউদি যেন কৃতার্থ হয়। মাকে খুশী করার জন্য আদিখ্যেতার অন্ত ছিল না। গলায় তখন বউদির 'মা, মা' ছাড়া কথা ছিল না। কিন্তু মা, শত হলেও গৃহমশাইয়ের স্ত্রী, দারোগার গিন্নী; ওসব চোরের মন সহজেই বুঝতে পারে। মা একটুও গলে গেল না। উপরন্তু বউদির পেটের কথা টেনে বের করতেই মন দিল।

বাবা-মা'র মতন বুলালির বউদিকে অতটা অপছন্দ ছিল না। বাবা-মা তাদের বড় ছেলের বউকে যে ভাবে যে চোখে দেখতে চেয়েছিল, বুলালির তার প্রয়োজন ছিল না। সমাজ, মানমর্যাদা, আশা, সাধ—এসব কিছুই বুলালির ভাববার নয়, তার এক্তিয়ারের জিনিসও নয়। কাজেই বুলালি বউদিকে গোড়াগুড়ি থেকেই একেবারে অপছন্দ করেনি। তার কিছু যায়নি যখন তখন অযথা বুলালির বিগড়ে থাকার কারণ ছিল না। তবু বুলালি বউদিকে খুব যে পছন্দ করছিল তাও নয়। যে রকম কেচ্ছা-কেলেঙ্কারি ঘটিয়ে বউদি এ বাড়ির বউ হল তা একেবারে অগ্রাহ্য করা মুশকিল। বুলালির কেন যেন এ ব্যাপারে একটা লজ্জা ছিল, আবার কৌতূহলও। তবে বাবাদের সে কখনও এসব কথা বলেনি। বলা যায় না। মা'র বিরূপতাও বুলালিকে খানিকটা বিরূপ করে রেখেছিল বউদির ওপর। এসব সত্ত্বেও বউদি যখন প্রথম আসে, বুলালি তাদের বাড়িতে আচমকা প্রায়-সমবয়সী একটি মেয়ে আত্মীয় পেয়েছিল, পছন্দও করেছিল। বউদির ন্যাকামি এবং আদিখ্যেতাকেও প্রথমটা অত ধরতে পারেনি। বউদিও এ বাড়িতে এসে খুব ছোড়দা ছোড়দা করতে লাগল। বয়সে বুলালি তার বউদির চেয়ে বছর দেড় দুয়েক বড়, তার এখন প্রায় চব্বিশ, বউদির বয়স বাইশ। মা অবশ্য বউদির বয়স কিছুতেই পঁচিশের কম নামাতে রাজী না। তা বয়স যাই হোক, বউদির এই 'ছোড়দা ছোড়দা' ডাকটাক তার মন্দ লাগল না। বউদি তার সঙ্গে ভাব জমাবার চেষ্টা করতে লাগল নানাভাবে . গল্পগুজব, হাসিঠাট্টা, তামাশা, টুকটাক দু পাঁচটা টাকা হাতে গুঁজে দেওয়া, জামা-কাপড়ের খোঁজখবর করা, রুমাল গেঞ্জি নিজের হাতে কেচে দেওয়া—কিছুই বাকি রাখল না। বুলালি এ বাড়িতে বড় একা একা থেকেছে, বাড়িতে সঙ্গী হিসেবে বউদিকে তার মন্দ লাগত না। কখনও কখনও খুবই ভাল লাগত, তখন বউদি তার সঙ্গে নানান রসিকতা করত। এইসব রসিকতা থেকে বুলালি মেয়েদের রহস্যময় অনেক কিছু জানতে পারত, আন্দাজ করতে পারত; কখনও বা পারত না, কিন্তু সব কেমন রহস্য

জড়ানো হয়ে থাকত। সম্পর্কটা ক্রমেই বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে আসার মতন হয়ে আসছিল। কিন্তু কতগুলো ব্যাপারে বুলালি তার বউদিকে পছন্দ করত না। বউদি চালিয়াতি করত, অহংকার দেখাত। তার বাপের বাড়ির কে কতটা লেখা পড়া শিখেছে, কে কোথাকার মুন্সেফ ম্যাজিস্ট্রেট, কার কার গাড়ি আছে, কেবা কলকাতায় মস্ত ব্যবসা করে, এসব চালিয়াতি ছাড়াও বউদি তাদের বাপের বাড়ির ধরন সম্পর্কে বড় বড় কথা বলত। তার বাপের বাড়ির ধরনটা যেন আধা-সাহেবী: খাওয়া-দাওয়া, মেলামেশা, সাজ-সজ্জা সবই সেই কায়দায়। সবচেয়ে বুলালির খারাপ লাগত, বউদি যখন নিজের বি. এ. পড়ার গল্প করত। তখন মনে হত, বউদি তাকে অবজ্ঞা করছে। আর খারাপ লাগত বউদি যখন তাকে ভাল হবার লেকচার মারত। যখন এই লেকচার ঝাড়ত বউদি, তখন কিন্তু বউদির অনেক কিছু বিসদৃশ ঠেকত। না, কেচ্ছাটার কথা বুলালি ধরছে না; সেটা বাদ দিয়েও। বুলালি দেখেছে—বউদি ঠিক যখন তাকে সভ্যতার লেকচার মারছে তখন নিজেই বুক থেকে আঁচল খসিয়ে বসে ব্লাউজের বোতাম নখ দিয়ে খুঁটছে, বা বিছানার ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে, পা দুটো হাঁটু থেকে তোলা, পায়ের কাপড় গড়িয়ে পড়েছে।

এসব সত্ত্বেও এ বাড়িতে বউদির সংগে তার সম্পর্ক একটা ছিল। বউদি অনেক দুঃখের কথাও তাকে বলতে শুরু করেছিল। বুলালিও মন অনেকটা হালকা করে কথা বলত। মা'র অষ্টপ্রহর গালাগাল খেয়ে বউদির যত মনোভার তা বউদি কত সময় বুলালির কাছে লাঘব করেছে। কেঁদেছে। বুলালি কোনো রকমে সামলে দিয়েছে বউদিকে। এই প্রশ্রয়টুকু সে বউদিকে একলাই দিয়েছে এ বাড়িতে। অনেক সময় মা'র কাছ থেকে বাঁচিয়েও দিয়েছে।

অথচ আজ বউদির ব্যবহার দেখে সে অবাক। বুলালিকে যা মুখে এল, অক্লেশে বলে দিল। সে ছোটলোক? তাদের বাড়ি ভদ্রলোকের বাড়ি নয়? বি. এ. পড়েনি বলে কি বুলালি কথা বলতেও জানে না? তারা ইতর, অভদ্র, অশিক্ষিতের বংশ। কী সাহস বউদির! ওই মুখে এত বড় বড় কথা!

এটা ঠিক, বুলালি খুব একটা রগচটা নয়: সূর্যর মতন সে হুস করে করে চটে ওঠে না। তার বরং মেজাজ অনেকটা ঠান্ডা, গলার জোরটাই বেশি। এমনিতে বুলালিকে তার চালচলন দেখলে যতটা বেপরোয়া মনে হয় ততটা ঠিক সে নয়। তবু আজ বউদির ওপর ওই রকম ভীষণ চটে গেল কেন? বউদি তাকে এবং তাদের গোটা পরিবারকে অপমান করল বলে, নাকি অন্য কিছু আছে? অন্য আর কি হতে পারে?

বুলালি বুঝতে পারল না, যদি সে বউদিকে মেরে বসত, তবে কি হত? কোথায় যেন কেমন একটা হতাশা বোধ করল বুলালি।

দোকানে তিনজনেই ছিল। বুলালি আসতেই সূর্য বলল, "রাস্তায় গণাদাকে

দেখলি?"

বুলালি মাথা নাড়ল; না, দেখেনি। চেয়ার টেনে বসতে বসতে বলল, "গণাদা এসেছিল?"

"এই তো উঠে গেল চা খেয়ে।"

বুলালি সূর্যর চোখের দিকে তাকাল; তারপর কৃপাময়ের দিকে তাকিয়ে বলল, "খুব কড়া করে এক কাপ চা দিতে বল।...আজ শালা আর-একটু হলেই তোদের কোমরে গামছা বেঁধে শ্মশানে ছুটতে হত।"

ওরা কিছু বুঝল না, বুলালির দিকে অবাক চোখে চেয়ে থাকল।

অভয় বলল, "শ্মশানে ছুটতে হত কেন?"

"একটা গাড়ির সঙ্গে লড়িয়ে দিয়েছিলাম মাইরি! একেবারে স্ট্রেট।...শালা বেঁচে গেছি।"

সূর্য হেসে বলল, "তোকে কে মারে রে! তুই শালা পেহ্লাদ।"

কৃপাময় চেঁচিয়ে দোকানের ছোকরাকে বুলালির জন্যে চা দিতে বলল। তারপর বুলালির দিকে তাকিয়ে বলল "এই দিনের বেলায় গাড়ির সঙ্গে লড়িয়ে দিলি কি করে?" কৃপাময় রীতিমত কৌতূহল বোধ করল, অবাক হল। বুলালি খুব ভাল সাইকেল চালায়। এই শহরের সে সাইকেল চ্যাম্পিয়ান। প্রতি বছর বারো মাইল সাইকেল রেসে বুলালি ফার্স্ট হয়, গত দু বছর হয়ে আসছে, এবারও হবে। তাছাড়া বুলালির হাত পা কোমর খুব তৈরী, চোখ ভীষণ ধারালো ও সতর্ক, বাতাসের মতন সে গায়ের পাশ দিয়ে সাইকেল নিয়ে ছোঁ মেরে যাবে তবু ধাক্কা লাগাবে না। সেই বুলালি এই দিনের বেলায় গাড়ির মুখোমুখি ধাক্কা লাগাচ্ছিল! ব্যাপার কি?

বুলালি কৃপাময়েব কথার কোনো জবাব দিল না। টেবিলের ওপর পড়ে থাকা দেশলাইটা ক্যারামের স্ট্রাইকারের মতন আঙুলে করে মারছিল, মেরে বাঁ হাত বাড়িয়ে ধরে টেনে নিচ্ছিল; আবার মারছিল।

সূর্য অপেক্ষা করতে করতে হেসে বলল, "রাস্তায় মাল দেখছিলি, না কি রে?"

বুলালি বলল, "না।" বলে হঠাৎ ওর মনে হল, রাস্তায় নয়, বাড়িতে দেখছিল। বাড়ির মাল। কী মাল, সত্যি!

অভয় বলল, "গাড়িতে ছিল নাকি। বলা যায় না, তুই যা উজবুক, সাইকেল নিয়েই হয়ত মালের গায়ে লেবেল হয়ে গেলি।" অভয় হাসতে লাগল।

বুলালি একটু সময় কথা বলল না। বাড়ির কথা সে বলতে চায় না। তবু বিরস মুখ করে বলল, "বাড়ি থেকে বেরুবার সময় মেজাজটা খিঁচড়ে গেল!"

সূর্য বুলালির বিরস মুখ দেখতে দেখতে হেসে বলল, "সেই দেখিছিলি নাকি?" বলে সূর্য দু হাতের তালির এবং মুখের একটা ভঙ্গি করল।

মাথা নাড়ল বুলালি, না। তারপর বলল, "মেজাজটা একেবারে চিরে গিয়েছিল, মাইরি। মরলে ওরা বগল বাজাত।...হ্যাত শালা, লোকজনও সব

য়াম খচড়া।"

সূর্য বলল, "কাকে বলিস রে! আমার তো রোজ বাড়ি থেকে বেরোবার সময় মেজাজ টকে যায়, বাইরে যতক্ষণ আছি বেশ আছি, বাড়িতে ঢুকলেই আবার শালা টকে গেল। বাড়িফাড়ি আমাদের পোষায় না।.. চল, একটা মেস করে থাকি।"

চার বন্ধুই কেমন এক ধরনের মুখ করে হাসল। হাসিটা বড় ম্লান।

কৃপাময় অভয়ের পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা চ্যাপ্টানো প্যাকেট বের করল। একটি মাত্র সিগারেট। সিগারেটটা কৃপাময় ধরিয়ে নিল।

সামান্য পরে, যেন বাড়ির কথা ভুলতে, মনটাকে অন্যমনস্ক করতে বুললি বলল, "গণাদা কি বলল?"

"ওর দোকানে যেতে বলল।"

"এখন?"

"না, কাল সন্ধ্যেবেলা।"

"টাকা দেবে?"

"বলল তো যেতে, কে জানে শালা দেবে কিনা!"

একটু চুপচাপ। বুললি এবার বলল, "আমরা যে ক'দিন ওর কাছে গিয়ে ফিরে এলাম, বলেছিস? ঝাড়লি না কেন?"

"সব বলেছি। বলল, আমরা গিয়েছিলাম ও জানে। বাড়িতে অসুখ যাচ্ছে, অন্য একটা ঝামেলাতেও জড়িয়ে আছে বলে দেখা করতে পারেনি।"

"বাড়ি? কার বাড়ি রে? ওটা কি গণাদার বাড়ি হয়ে গেল!"

"ওখানেই থাকে আজকাল, তাই হয়ত বলল।"

"বাঃ শালা, বাঃ",—বুললি বলল, "তবে তো খাশাই আছে রে গণাদা। তিন তিনটে ছুঁড়ি নিয়ে বাড়ি করে বসে আছে। আমাদের একটা করে দিক না মাইরি।"

"গণাদাকে বল।"

"অসুখটা কার?"

"মেজকিটার।"

"কি অসুখ?.. মেজকিটার খুব টোল আছে। কি যেন নাম রে অভয়? তোদের পাড়াতেই তো থাকত আগে।'

অভয় দীর্ঘশ্বাসের শব্দ করে জবাব দিল, "থাকত, বাট্ ওআনস্ আপ্অন্ এ টাইম।...নাম যমুনা।...আমার সঙ্গে খুব হাসাহাসি ছিল মাইরি এক সময়। তারপর সেই যে একদিন বিজয়ার সিদ্ধি খেয়ে গালে টোনা মারলাম, ব্যাস্— শালা ফায়ার জ্বলে গেল।...আমার ভাগ্যটাই বড় খারাপ, বুঝলি! পাড়ায় কত ছিল, কত এল; দেখতে দেখতে আবার সব চলে গেল। আমিই পড়ে আছি।"

"তুই তো সেই, কি বলে, রেলের সিগন্যাল; ঠায় দাঁড়িয়ে গাড়ি পাস করাচ্ছিস।" সূর্য অভয়ের পিঠে থাপ্পড় মেরে হাসতে লাগল।

অভয় পরম বৈরাগ্যের গলায় জবাব দিল, "আমার কিছু হবে না—নাথিং। কুষ্ঠীতে আছে, আমার কিছু থাকবে না, একেবারে লাঙ্গা হয়ে মরব। সাধুটাধু হয়ে যাব, বুঝলি; ব্যোম বাবাজী। লেঙটি পরে মরব।"

"মরিস। আমরা তোর মুখে জল দিয়ে দেব।"

অভয় বেশ নাটকীয় ভঙ্গিতে হাত জোড় করে বলল, "প্লিজ, ওটা আর করিস না। তোদের হাতে জল খেয়ে মরলে দশ জন্ম নরকবাস মাইরি।"

বুলাল বলল, "শালার স্বর্গে যাবার ইচ্ছে। মারব টেনে এক লাথ টমটমে— শালা স্বর্গ থেকে গড়িয়ে পড়বি।"

ওরা সকলেই হেসে ফেলল। হাসিটা চাপা, মরা-মরা।

৫

বাজারের এক সরু গলির মধ্যে গণনাথের 'ইউনিভার্সাল এজেন্সি'। গলির দু' পাশে মসন-কোসন, মণিহারি, ছিট-কাপড়ের দোকান। এই ভিড়ের মধ্যেও গণনাথের দোকান অবশ্য খুঁজে নেওয়া যায়; তার সাইন বোর্ডটাই আকারে সবচেয়ে বড়, কিন্তু চেহারা ফ্যাকাশে। মঙ্গীরামের ছিট কাপড়ের দোকানের পাশ দিয়ে সরু সিঁড়ি, পনেরো বিশ ধাপ উঠেই দোতলায় রাস্তা-ঘেঁষে গণনাথের 'ইউনিভার্সাল এজেন্সি'। নামে বড় হলেও গণনাথের দোকান ছোট : এক ফালি ঘর, ঘর দিয়ে বাইরের দেড়হাতি বারান্দায় যাওয়া যায়, গলির গায়ে গায়ে বারান্দা। গণনাথের দোকানের ঘরে ঢুকলে এটা দোকান বলে মনে হবে না। হবার কারণও নেই। গণনাথ এজেন্ট হরেকরকম জিনিসের এজেন্সি নিয়েছে; শহরের দোকানে দোকানে তার এজেন্সির মালপত্র দেয়। গণনাথের দোকান ঘরে প্যাকিং বাক্স, কার্ড বোর্ড, টাল-খাওয়া গোটা দুয়েক র‍্যাক, কিছু শিশিটিশি, খবরের কাগজের স্তূপ—এসব ছাড়া বড় কিছু চোখে পড়ে না। ঘরের এক পাশে গণনাথের চেয়ার টেবিল, টেবিলটা ছোট, অর্ধেক জায়গা জুড়ে পুরনো আমলের লজঝড় একটা টাইপ রাইটার মেশিন। গোটা দুয়েক কাঠের ফোল্ডিং চেয়ার, একটা টুল। 'ইউনিভার্সাল এজেন্সি'র গণেশ কুলুঙ্গির মধ্যে মাকড়সার জাল জড়িয়ে বসে আছে।

গণনাথ সন্ধ্যেবেলা তার দোকানে বসে বসে কি যেন একটা টাইপ করছিল। ঘরের মাঝমধ্যিখানে বাতি ঝুলছে, আলো মিটমিটে, সমস্ত ঘরটা ঘোলাটে হলুদ হয়ে আছে। দেওয়ালগুলো ময়লা, কালো; মাথার ওপরকার ছাদ ঝুল জমে জমে ঝাপসা। যুদ্ধের সময়কার একটা পাখা, এক ফালি থোড়ের মতন দেখতে গোটা তিনেক টিনের ব্লেড্ নিয়ে প্রচণ্ড জোরে ও ঘরঘরর শব্দে ঘুরছিল। গণনাথ একবার করে বিড়িতে টান দিচ্ছে, আর বিচিত্র কায়দায় টাইপের চাবি মাঝপথ পর্যন্ত উঠিয়ে বাকিটা হাতে করে টেনে নিয়ে গিয়ে ফিতের উপর ঠুকে দিচ্ছে।

সিঁড়ি দিয়ে সূর্যরা চার বন্ধু এসে ঘরে ঢুকল।

গণনাথ চোখের ওপর চশমাটা ঠিক করে নিয়ে ওদের দেখল, "আরে তোরা! আয়।"

ওরা ঘরে ঢুকে এপাশ ওপাশ চাইল, এমনভাবে চারজনে এসেছে, মনে হবে

যেন দল বেঁধে হামলা করতে এসেছে। তা অবশ্য ঠিক নয়। সূর্য ঘরের বাতাস শুঁকতে লাগল, বুলুলি মাথার ওপর পাখাটা দেখবার চেষ্টা করছিল।

"বোস একটু, আমার হয়ে গেছে—" গণনাথ বলল, "একটা লাইন শুধু বাকি।"

চেয়ার, টুল, প্যাকিং বাক্স ভাগাভাগি করে ওরা বসল। সূর্য বারান্দার দিক থেকে একটা চক্কর দিয়ে এল। কৃপাময় হাত বাড়িয়ে গণনাথের টেবিল থেকে বিড়ি তুলে নিয়ে ধরাল।

বুলুলি বলল, "তোমার এই ঘরে ক'মণ ধুলো আছে, গণাদা?"

গণনাথ টাইপে মন রেখে হেসে বলল, "দাঁড়া এবার একদিন পরিষ্কার করাব। একটা মুটে ধরতে হবে।"

অভয় আর কৃপাময় নিজেদের মধ্যে কি একটা কথা বলাবলি করতে লাগল।

হাতের কাজটুকু সেরে মেশিন থেকে কাগজটা খুলে নিতে নিতে গণনাথ বলল, "একটা আয়ুর্বেদিক ফার্মাসীর এজেন্সি নিয়েছি, বুঝলি। আমলা তেল, দাঁতের মাজন, যোয়ানের আরক, আর কয়েকটা ভাস্করচূর্ণের অর্ডার দিলাম। এটা যদি চালাতে পারি..."

কৃপাময় গণনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে সকৌতুকে কথাগুলি শুনল, বলল, "কয়েকটা মৃতসঞ্জীবনীর অর্ডার দিয়ে দাও না। আমরা খাব।"

গণনাথ কাগজ খুলে নিয়ে তোবড়ানো ঢাকনাটা মেশিনের ওপর চাপাল। হেসে বলল, "মৃতসঞ্জীবনী খেয়ে কি করবি, জ্যান্ত সঞ্জীবনীই তো খাচ্ছিস আজকাল।"

কৃপাময় পাল্টা জবাব দিল, "তুমি আনালে ফ্রি খাব।"

কৃপাময়ের সপ্রতিভ জবাবে গণনাথ হেসে ফেলল। হাসতে হাসতে বলল, "বলেছিস বেশ। জ্যান্তটায় দাম লাগে মৃতটা ফ্রি।"

কৃপাময় হাসল। "শরীরটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে গণাদা, দেখ। মৃতসঞ্জীবনীটনী খেলে আবার ঠিক হয়ে যেত। আনাও না দু-চার বোতল। তোমার পয়সা লাগবে না।"

"পয়সা লাগবে না মানে?"

"এজেন্টদেব পয়সা লাগে নাকি? স্যাম্পেল বলে চালিয়ে দিও।"

গণনাথ বেশ গলা খুলে হাসল। গণনাথের বয়স বছর চল্লিশ, ছিপছিপে চেহারা, ইদানীং বেশ একটু রোগা দেখায়। মাঝারি গায়ের রঙ, তামাটে-ফরসা। চোখ নাক বড় বড়, থুতনি সরু, কোঁকড়ানো রুক্ষ রুক্ষ চুল মাথায়। গণনাথের চোখের দৃষ্টি এবং হাসি দুই-ই কেমন শান্তশিষ্ট, মোলায়েম। গায়ে একটা গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবি, পরনে পাজামা। চামড়াব একটা তালিমারা ফোলিও ব্যাগ তার টেবিলের পাশে পড়ে ছিল।

গণনাথ বলল, "চা খাবি?" বলে সকলের দিকে তাকাল।

সূর্য বলল, "চটপট হলে খাব।"

গণনাথ চেয়ার সরিয়ে উঠল, উঠে বাইরের বারান্দায় গিয়ে ঝুঁকে চেঁচিয়ে নীচের কোন চা-অলাকে পাঁচ গ্লাস চা আনতে বলল। বলে ফিরে এসে চেয়ারে বসল। বিড়ি ধরাল নতুন করে। বলল, "তারপর কি খবর তোদের বল?"

সূর্য বলল, "তুমিই বলো; তুমি আসতে বলেছিলে।"

গণনাথ সূর্যর মুখের দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল। শেষে চেয়ারটা পিঠের দিকে হেলিয়ে দেওয়ালের গায়ে আটকে চুপচাপ ছাদের দিকে তাকিয়ে থাকল কিছু সময়। সঙ্কোচের গলায় বলল, "তোর টাকা আমি মেরে দেব না, সূর্য।"

সূর্য বুলুলির দিকে চকিতের জন্যে তাকাল। অভয় সূর্যর দিকে তাকিয়ে। গণনাথের সামনে এরা দ্বিধান্বিত হয়ে উঠছে যে তাতে সন্দেহ নেই। অথচ এদের চরিত্র যেন দ্বিধান্বিত হওয়ার নয়, ওদের দেখলে তা মনে হয় না। দিন কয়েক আগে গণনাথের খোঁজে গিয়ে সেই মাটকোঠার বাড়িতে যেভাবে গালিগালাজ করেছে তাতে বরং মনে হওয়া স্বাভাবিক, গণনাথকে এরা পরোয়া করে না, ধাপ্পা মেরে গণনাথ টাকা ধার করে তাদের ঘোরাচ্ছে বলে সবাই ভীষণ খাপ্পা হয়ে আছে। আশ্চর্য, এখন গণনাথের সামনে তারা ক্ষেপে ওঠার ভাব দেখাল না।

সূর্য বলল, "আমার টাকা দরকার।"

গণনাথ সূর্যর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। সূর্যকে সে দেখছিল, বা অন্য কিছু ভাবছিল বোঝা যায় না। "খু-ব দরকার?" গণনাথ শুধলো। এমনভাবে শুধলো যেন গণনাথ নিরুপায়, টাকা তার কাছে নেই, তবু যদি সূর্যর তেমন প্রয়োজন হয় তবে অন্য কথা।

"হ্যাঁ, হাতে পয়সা নেই।" সূর্য বলল।

"তোকে আমি পাঁচটা টাকা দিচ্ছি।"

"মাত্তর পাঁ-চ টাকা?" সূর্য অবাক। তার চোখে হতাশা এবং বিরক্তি।

বুলুলি বলল, "ওকে টাকাটা দিয়ে দাও না, গণাদা। বাড়ি-ফাড়ির কোনো অ্যাকাউন্ট থেকে মেরেছে। আবার মিলিয়ে দেবে।"

গণনাথ হেলানো চেয়ার সোজা করে নিয়ে সূর্যর দিকে তাকাল। কৃপাময়ও সূর্যকে দেখছিল। সে জানে, সূর্য তাকে বলেছে, বাড়ির একটা পুরনো জিনিস চুরি করে সে গণাদাকে বেচতে দিয়েছিল, বেচে টাকা নিতে বলেছিল। টাকাটা সূর্য বাড়ির কোনো হিসেবে মেলাবে না। বুলুলিরা কথাটা জানে না নিশ্চয়। সূর্য কি বলে শোনার অপেক্ষা করছিল কৃপাময়।

আহত হয়ে গণনাথ বুলুলির দিকে তাকিয়ে বলল, "টাকা থাকলে আমি কি ওকে দিতাম না!" বলে গণনাথ সূর্যর চোখে চোখে তাকাল, "আমার অবস্থা খুব খারাপ যাচ্ছে সূর্য, দেখতেই পাচ্ছিস। এই এজেন্সি আর চলছে না। আজ ছ' সাত বছর কত রকমে চেষ্টা করলাম, তেল সাবান, ক্রীম পাউডার, খেলনা প্লাস্টিকের এটা ওটা—সায় পত্রিকা-ফত্রিকারও এজেন্সি নিয়েছি। কত রকম মাল এ-বাজারে চালাবার চেষ্টা করলাম। টো টো করেছি কম, কোনোটাই চালাতে

পারলাম না। আগে তবু খানিকটা চলত, এখন অচল। মাল দিয়েছি, হয় বিক্রী হয়নি, না হয় পয়সা পাইনি। আমার ক্যাপিটেল কবে ফুরিয়ে গেছে, খালি ধার।" গণনাথ আস্তে আস্তে বলল, দুঃখের ও হতাশার গলায়। খানিকটা থেমে আবার বলল, "আসলে ব্যাপারটা কি আমি বুঝতেই পারি না। তবে এখন একটা জিনিস বুঝেছি, আমি যেসব মালের এজেন্সি নিই সেগুলো ছোটখাটো কোম্পানীর। 'মল্লিকা' স্নো ক্রীম পাউডার কে কিনবে রে, বাজারে বড় বড় কোম্পানী ইয়া ইয়া বিজ্ঞাপন দিচ্ছে তাদের জিনিসের। সিনেমায় বিজ্ঞাপন থাকছে। কম্পিটিশন লাগিয়েছে। ফ্রি গিফ্‌ট্‌ দিচ্ছে। যার যত বড় ঢাক আজকের বাজারে তার তত রবরবা। আমার কোম্পানীগুলোর কিছু নেই। হাটে মাঠে যা দু-চার শিশি চলে যায়।"

অভয় বলল, "তুমি একটা বড় কোম্পানীর এজেন্সি নাও না কেন?"

"আমায় কেন দেবে!...বড় কোম্পানীর এজেন্সি নিচ্ছে লছমন দাস, ব্যানার্জী কোম্পানী, শেঠী...। অনেক পয়সার ব্যাপার, রেপুটেশানের ব্যাপার।...আমার কিছুই নেই।"

গণনাথের কারবার এবং দুঃখের কাহিনী চার বন্ধুর অজানা নয়। সবই জানে। তবু আরও একবার শুনল। শুনতে ভাল লাগে না, বাধা দিতেও পারে না।

কৃপাময় বলল, "তোমার এজেন্সি চলছে না, তো তুলে দাও।"

"দেবার কি, আপসে উঠে যাচ্ছে।" গণনাথ হাসল, বিষণ্ণ হাসি।

সামান্য চুপচাপ। গণনাথ নিবন্ত বিড়ি আবার ধরাল। সূর্য বিরক্ত বোধ করছিল। সে ভেবেছিল, আজ কিছু টাকা পাবে। মাত্র পাঁচ টাকা দিতে চাইছে গণাদা! কি হবে পাঁচ টাকায়? টাকা পেলে আজ পিন্‌কির দোকানে যাবার ইচ্ছে ছিল।

কৃপাময় বলল, "এদিকে চলছে না বলছ, আবার তাহলে কবরেজী তেল-ফেলের এজেন্সি নিচ্ছ কেন?"

গণনাথ জবাব দিল, "পাচ্ছি বলে নিচ্ছি। এরা নতুন নেমেছে। কাগজে বিজ্ঞাপন-টিজ্ঞাপন দেয় মাঝে-সাঝে। তাছাড়া কবরেজী জিনিসটা মুদিটুদির দোকান দিয়েও চালানো যায়। কাস্টমাররা গরিব।...দেখি কি হয়।"

সূর্য পা ঘষে আওয়াজ করল। আজেবাজে কথা তার যেন পছন্দ নয়; অধৈর্য হয়ে উঠছিল। বিরক্ত মুখে বলল, "আমি তোমার কাজের সময় টাকা দিয়েছি, তুমি বলেছিলে সপ্তাহখানেকের মধ্যে দিয়ে দেবে। তিন সপ্তাহ হতে চলল। কথার খেলাপ করছ।"

গণনাথ সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না, একটু পরে বলল, "বলেছিলাম তোকে। কিন্তু কতকগুলো প্যাঁচে পড়ে গেলাম রে। মতি স্টোর্স বলেছিল টাকা দেবে, তা কাঞ্চনটার মা মারা গেল; টাকার কথা আর তুলতে পারি না। ওদিকে বাড়িতে অসুখ..."

বুললি চোখ পিটপিট করে বলল, "বাড়ি! কার বাড়ি! তোমার তো বাড়িই নেই।"

গণনাথ বোধহয় অর্থটা বুঝল কথার, বলল, "আমি নয়নাদের বাড়িতে থাকি। যমুনার প্যারা টাইফয়েড মতন হয়েছিল।"

বুলুলি আড়ালে অভয়ের উরু খপ করে খামচে ধরে টিপল। অভয় বুলুলির হাতটা ঠেলে সরাবার চেষ্টা করতে লাগল।

সূর্য অবজ্ঞার স্বরে বলল, "কার মা মারা গেল, কার টাইফয়েড হল তা শুনে আমার কি?" বাকিটা সে বলল না। কিন্তু তার চোখমুখের ভাব যেন প্রকাশ করে দিচ্ছিল, টাকা দেবার সময় এ-সব অজুহাত সবাই দেয়।

গণনাথ কেন যেন বিব্রত ও লজ্জিত হয়ে মুখ নীচু করে চশমাটা খুলল। মুছল। মুছে আবার পরে নিল।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। আপন মনে হিন্দী সিনেমার একটা গান গুনগুন করতে করতে বছর চোদ্দ পনেরো বয়সের একটা বেহারী ন্যাড়ামাথা ছোকরা অ্যালুমিনিআমের থালায় পাঁচ গ্লাস চা এনে হাজির করল। গ্লাসগুলো ছোট, হাতে হাতে চা ধরিয়ে দিল ছোকরা, দিয়ে আবার চলে গেল। গ্লাসগুলো ভীষণ গরম, হাতে রাখা যায় না। টেবিলে গ্লাস রেখে কৃপাময় আঙুলে ফুঁ দিতে লাগল। সূর্যরাও চায়ের গ্লাস নামিয়ে রাখল।

এবার কি বলা যায়! সূর্য কিছু ঠিক করতে না পেরে দেওয়াল এবং ছাদ দেখছিল বিরক্তভাবে, পাখার ঘরঘর শব্দটা শুনছিল। বুলুলির দিকে তাকাল। বুলুলিও কোথাও অস্বস্তি বোধ করছে। অভয় পকেট থেকে সিগারেট বার করল, সস্তা সিগারেট, বলল, "গণাদা, সিগারেট খাবে একটা?"

"দে।"

অভয় প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিল। গণনাথ সিগারেট নিল। চারজনের মধ্যে বিলি করে দিয়ে অভয় প্যাকেটটা ফেলে দিল।

কৃপাময় সিগারেট ধরিয়ে বলল, "গণাদা, একটা সোজা কথা বলব?"

"বল্।"

কৃপাময় অন্য বন্ধুদের দিকে চোখ বুলিয়ে নিল। "তুমি ওখানে থাকছ কেন?"

গণনাথ কোনো স্পষ্ট জবাব দিতে পারল না, ইতস্তত করে বলল, "থাকছি।... বরাবর যে থাকব এমন কিছু নয়, এখন থাকছি।"

"আহা, থাকছ কেন? ওরা তোমার কেউ না।"

গণনাথ বিব্রত বোধ করছিল। সময় নেবার জন্যে চায়ের গ্লাস টেনে নিয়ে চুমুক দিল। তারপর বলল, "অনেক দিন মেসেটেসে থাকলাম, পেটে আলসার, আমি আলসারের রুগী রে, তাই ক'দিন বাড়ির ভাত খাচ্ছি।"...গণনাথের বিব্রত আড়ষ্ট হাসিটা ওরা লক্ষ্য করল।

অভয় নিরীহের ঢঙে হেসে বলল, "বাড়ির ভাত খেতে হলে সবাই বিয়ে

করে। তুমি একটা বিয়ে করলে আমরা নেমন্তন্ন খেতাম।"

গণনাথ কেমন আড়ষ্ট হয়ে গেল। বোকার মতন হাসবার চেষ্টা করল, অথচ বেশ বোঝা যাচ্ছিল কোথাও যেন অপমানিত বোধ করছে।

বুলালি হেসে হেসে বলল, "আমাদের ভক্কি মেরে বিয়ে করো না—! আজকাল খুব সিকরেট ম্যারেজ হচ্ছে।"

গণনাথ কথার কোনো জবাব দিল না। ছেলেগুলো কি বলতে চাইছে সে বুঝতে পারছিল। সরাসরি ওরা কিছু বলছে না, কিন্তু আড়ালে আড়ালে গণনাথকে খোঁচাচ্ছে। তামাশা করছে, টুকছে। গণনাথ রাগল না; রেগে গিয়ে লাভ নেই। রেগে গিয়ে, চিৎকার করে বা বচসা সৃষ্টি করে সে ওদের সম্মান আদায় করতে পারবে না। এক সময় গণনাথ এদের কাছে যথেষ্ট সম্মান পেয়েছে; গণনাথকে ওরা ভালবাসত তখন। এখন সেই সম্মানের ও ভালবাসার সামান্য মাত্র অবশিষ্ট আছে হয়ত। না থাকলেও বলার কিছু নেই। গণনাথও আর আগেকার মতন নেই, ওরাও বদলে গেছে।

প্রসঙ্গটা চাপা দেবার জন্যে গণনাথ আবার টাকার কথায় এল। সূর্যর দিকে তাকিয়ে বলল, "তুই আজ পাঁচটা টাকা নে সূর্য। আমি কয়েক দিন পরে আবার তোকে কিছু দেব।"

পাঁচ টাকার কথায় সূর্য আবার চটল; "তুমি কি ভিক্ষে দিচ্ছ নাকি?"

আহত হয়ে গণনাথের চোখমুখ কেমন ম্রিয়মাণ হল; দু-পলক সূর্যর দিকে তাকিয়ে থেকে সঙ্কুচিত গলায় বলল, "কি যা তা বলছিস?...ভিক্ষের কথা আমি বলেছি!"

"না বললেই বা! তুমি দু টাকা এক টাকা করে আমায় টাকা দেবে কেন? আমি ভিক্ষে চাইতে আসিনি।"

গণনাথ নিরুপায়। সূর্যকে বোঝাবার চেষ্টা করে বলল, "বলছি তো তোকে, টাকা থাকলে দিতাম। সত্যি নেই। বিশ্বাস কর। এই যে, ব্যাগটা নিয়ে খুলে দেখ, আমার পকেট দেখ, আমার কাছে, বারোটা মাত্র টাকা আছে। তোকে পাঁচ দিলে আমার সাত থাকবে। সাতের মধ্যে যমুনার জন্যে একটা হরলিকস্ কিনব। বাকিটা আমার খরচ।"

সূর্য অবুঝের মতন মাথা নাড়ল। "যমুনার জন্যে হরলিকস্ কিনবে, না কার জন্যে কি কিনবে আমি জানি না। আমি যখন তোমায় টাকা দিয়েছিলাম তখন যমুনাটমুনা দেখে দিইনি। আমার টাকা তুমি দাও।"

গণনাথের মুখ কালচে হয়ে এসেছিল। অস্বস্তি বোধ করে, ধীর গলায় বলল, "টাকা সত্যি সত্যি নেই। থাকলে..."

"তুমি আমার সঙ্গে বেইমানি করছ, গণাদা।"

"বেইমানি!"

"নেবার সময় নিলে এখন দেবার সময় ঘুরোচ্ছো!..."

"তোকে আর আমি কি করে বোঝাবো সূর্য! বলছি নেই।"

"... দশটা টাকা দাও।"

"দশটা! কি করবি?"

"যাই করি।...মাল খাব।...দাও, দশটাই দাও।"

গণনাথ সূর্যর দিকে অনুরোধের চোখে তাকিয়ে থাকল, তারপর অন্যদের মুখ দেখল। কৃপাময় যেন অস্বস্তি বোধ করছিল। অভয় এবং বুলালি অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে নিল। আড়ালে যাই হোক, গণনাথের মুখের সামনে বসে এই টাকার দর কষাকষি তাদের বোধহয় সামান্য বিব্রত করছিল। গণনাথ শেষ-বারের মতন বলল, "যমুনার জন্যে একটা হরলিকস্ কিনতে হবে; সবে অসুখ থেকে উঠেছে......"

সূর্য রূঢ়ভাবে বলল, "তোমার যমুনাকে তুমি হরলিকস্ খাওয়াবে, আমার কি! আমার যমুনা? টাকা ফেল, আমি চলে যাচ্ছি।"

গণনাথ আর কিছু বলল না। এদের কাছে আর কত সে হেঁট হতে পারে! তালিমারা ফোলিও-ব্যাগটা কোলের কাছে টেনে নিয়ে স্ট্র্যাপ খুলল গণনাথ। খুলে কাগজপত্র হাতড়ে একটা পুরনো খামের মধ্যে থেকে টাকা বের করল। দশটা টাকা গুনে নিয়ে সূর্যর দিকে এগিয়ে দিল।

টাকাটা নিল সূর্য; নেবার সময় তার ভঙ্গি কেমন দৃঢ় ও বেপরোয়া দেখাল, যেন গণনাথের মন ভুলোনো কথায় সে ভোলেনি, তার প্রাপ্য টাকা আদায় করে নিতে পেরেছে। এই কাঠিন্যটুকু সে দেখাতে চায়।

গণনাথ খামটা পকেটেই রাখল এবার। শান্ত গলায় বলল, "সূর্য, আমি তোদের চেয়ে বয়সে অনেক বড়; ইয়ার্কি ফাজলামি করিস কর, তা বলে যা মুখে আসে বলিস না। যমুনাও ভদ্রবাড়ির মেয়ে।"

টাকাটা পকেটে পুরে নিয়ে সূর্য জবাব দিল, "আমি কিছু বলিনি।" বলে নোংরা চোখে হাসল সামান্য, "আজকাল সবাই ভদ্রলোক, আমরাই শুধু ছোটলোক।"

গণনাথ কোনো জবাব দিল না কথার।

"আবার কবে দেবে?" সূর্য জিজ্ঞেস করল।

"দেখি......দিয়ে দেব।"

"দেখিটেখি নয়, আসছে হপ্তায় দিয়ে দিও। আমার টাকার খুব দরকার।"

সূর্য যাবার জন্যে তৈরি; বুলালিরাও উঠে পড়ল।

কৃপাময় বলল, "চলি গণাদা।"

গণনাথ অন্যমনস্কভাবে জবাব দিল, "আয়।"

ওরা চলে যাবার পর গণনাথের চোখে পড়ল, চায়ের গ্লাসগুলো পড়ে আছে, কেউই প্রায় মুখে দেয়নি। গণনাথ ওদের ডাকতে গিয়েও থেমে গেল। ওরা নীচে নেমে গেছে।

নীচে নেমে ওরা মঙ্গীরামের দোকানের সামনে থেকে সাইকেল নিল। গলিতে বড় ভিড়। ভিড়ের মধ্যে দিয়ে ওরা গলির বাইরে এসে দাঁড়াল; সামনে

উঁচুনীচু জমি, তারপর নালা, নালার পর রাস্তা। রাস্তায় না উঠে বাজারের গা বেয়ে হাঁটতে লাগল, বাঁ পাশে দোকানের সারি। অভয় আজ সাইকেল এনেছে।

হাঁটতে হাঁটতে কৃপাময় বলল, "পাঁচটা টাকা তুই ছেড়ে এলেও পারতিস, সূর্য!"

"কেন? ছেড়ে আসব কেন?"

"না, বলছিল যখন হরলিকস্ কিনবে—তখন......" কৃপাময় ইতস্তত করে বলল, "তখন না নিলেও পারতিস।"

"ও-সব ধাপ্পা! ধাপ্পা আমি জানি রে।" সূর্য কেমন অসহিষ্ণু।

"ধাপ্পা তুই কি করে বুঝলি! সত্যিও হতে পারে। নয়নাও সেদিন বাড়িতে অসুখের কথা বলছিল।"

"বললেই সত্যি হয়ে যাবে," সূর্য চটেমটে বলল, "টাকা দেবার বেলায় যত অসুখ, না কি রে!"

কৃপাময় তবু বলল, "আমার মাইরি, খারাপই লাগছে। গণাদার মুখটা কেমন হয়ে গেল তখন।"

সূর্য ব্যঙ্গ করে বলল, "তা হলে যা গণাদাকে হরলিকস্ কিনে দিয়ে আয়।..শালা, এ হল যমুনার হরলিকস্। তোর শালা, বুক ফেটে যাচ্ছে .!"

কৃপাময় আর কিছু বলল না। সামনে মাটিব ঢিবি, সাইকেলটা পাশ কাটিয়ে নিল।

চুপচাপ খানিকটা হেঁটে এসে বুলালি বলল, "সূর্যর কোনো দোষ নেই, ও ঠিক করেছে। টাকা দিতে পারছ না তো এসে বলছ না কেন? আমরা কি শালা তোমার চাকর যে রোজ রোজ তোমার বাড়ি গিয়ে ধবনা মাবব। আমি বলছি, আমবা যে ক'দিন ওর বাসায় গিয়েছি, ও ছিল, কিন্তু নামেনি, মেয়েছেলে এগিয়ে দিয়েছে।"

বুলালির কথাব কেউ জবাব দিল না। ঢালু মতন খানিকটা জায়গা দিয়ে ওরা যাচ্ছিল, বাঁ পাশে 'পাল কোম্পানী'র কাপড়ের দোকান, অনেক আলো, কাঁচেব শো-কেসে শাড়ি ব্লাউজ ফ্রক, বাচ্চাদের জামাটামা ঝুলছে; আলো রাস্তায় পড়ছিল, পথের দোকানটা রেডিও আর গ্রামোফোনেব, নতুন কোনো গান বাজানো হচ্ছে, তারপরে মস্ত এক দর্জির দোকান, জনা কয়েক লোক কাপড় পছন্দ করছে।

অভয় হঠাৎ বলল, "আমি গণাদার কপালের কথা ভাবি মাইরি। কি ছিল, আর কি হয়ে গেছে। আমরা ইজের পবা থেকে গণাদাকে দেখছি তো। আরে ব্বাস, স্কুলে পড়ার সময় থেকেই গণাদার কী প্রশংসা শুনেছি। কাজের ছেলে, ভাল ছেলে, পরোপকারী ছেলে। সেই ছেলে মাইরি কী মাতব্বর হয়ে উঠল। আমাদের এনি থিং, লীডার গণাদা।..তা রেলের অমন চাকরিটাও তো পেয়েছিল, এক কথায়। বেশ তো ছিলি, টু-পাইসের বন্দোবস্তও ছিল। চাকরিটা

ছেড়ে দিল। বন্ধ একেবারে। কি যেন বলত রে তখন, মানুষদের ফ্রিডম... স্বাধীনতাটতা কি সব বলত না! চাকরি করব না, ছোট হয়ে যেতে হয়, নোংরামিতে থাকব না, মন নষ্ট হয়ে যায়। নে শালা হালুয়া, চাকরি ছেড়ে পয়সাকড়ি যা পেল তাই দিয়ে এজেন্সি। জাপানী মাথা মাইরি! নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মেরে এখন পস্তাচ্ছে।...আরে, ওর এজেন্সি প্রথম থেকেই চলত না, টেনে টেনে চালাচ্ছিল; বাজারে ধারদেনা, মেস থেকে চলে গেল; যা রোজগার হয় ও বাড়িতে দিতে হয় না, মুফতে যমুনারা খাওয়াবে! আমার বরং মনে হয়—গণাদাকেই ওদের সংসার টানতে হয়।"

"দু-বোনই তো কামায়", কে যেন বলল।

"কিসে? চাকরিতে?"

"চাকরিতেই ধর্?"

"বড়কিটা সেলাই স্কুলের সেলাইদিদি। ক'টাকা পায়? প'চাত্তর কি বড়জোর শ।"

"মেজকি?"

"যমুনা! যমুনার হাতেখড়ি চলছে, টেলিফোনের চাকরি। সব মিলিয়ে শ' সোয়া শ' হবে।"

"য—থেষ্ট, আবার কত হবে রে?" বুলালি বলল। "ওরাই গণাদাকে পুষতে পারে।"

অভয় বলল, "তোর কোনো জ্ঞান নেই। কিচ্ছু জানিস না। বাপ দারোগা, মজাসে আছিস। আমরা শালা গরিবের বাচ্চা, আমরা জানি।"

"তুই গরিব?" সূর্য বলল, "তোর বাড়িতে গেলে পানতুয়া খাই বে।"

"একদিন; সেদিন কার জন্যে যেন হয়েছিল, তাই মা দিয়েছিল," অভয় বলল। "গরিব না হলে মা'র গালাগাল খাই দু-বেলা!...আমার মা-টা না মাইরি, একেবারে সেলফিশ্ কর্তাভজা। বাবা তো শিবশম্ভু। চাকরি করে আর বাড়িতে এসে ঘুমোয়। কথাবার্তাই বলে না, টাকা পয়সা মা'র হাতে। মা যে কি করে ভগবান জানে। একটা টাকা চাইলেই মুখের 'কালার' পালটে যায়। ঘেন্না ধরে গেছে জীবনে। একদিন শালা লোকো ট্যাংকের জলে জয় মা কালী বলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ব।"

"তুই ডুববি না, সাঁতার জানিস্", বুলালি বলল, "সাঁতার জানলে ডোবা যায় না।"

অভয় একটু ভেবে বলল, "ডুবব; তোকে গলায় বেঁধে ঝাঁপ দিলে একেবারে তলায়।"

দমকা হাসি উঠল একটা; বুলালি সাইকেল থামিয়ে অভয়ের পেছনে আলতো করে লাথি মারল। "শালা।"

আর কয়েকটা দোকান পেরিয়ে আসতেই ডানদিকে কৃষ্ণচূড়ার গাছ একটা,

নীচেটা ঝাপসা। বাঁদিকে "লক্‌ক স্টোর্স", এ শহরের হালফ্যাসনের ডিপার্ট-মেণ্টাল দোকান। আলোয় ঝলমল করছিল, শো-কেসগুলো কাচের বাসন, খেলনা, প্রসাধন সামগ্রী, মেয়েলী জিনিসে ভরতি। দোকানে ভিড় কিছুটা কম।...যেতে যেতে সাইকেল থামিয়ে সূর্য ইশারা করে শো-কেসের একটা কিছু দেখিয়ে বলল, "বুল্‌লি দেখেছিস?"

"কি?" বুল্‌লি তাকাল।

"ওই যে, রবারের বাটি; তোর বিয়েতে তোর বউকে ওই একজোড়া প্রেজেণ্ট করব।" বলে সূর্য হাত দিয়ে একটা মাপ দেখাল।

বুল্‌লি দেখল: ফিনফিনে ব্রেসিয়ার, সিল্কের, লেসের কাজ আছে; পাখির ডানার মতন দুদিকে দুই প্রান্ত ছড়িয়ে গোটা তিনেক ব্রেসিয়ার শো-কেসের মধ্যে উড়ে যাচ্ছে; গোল একটা কাপড় ঢাকা স্ট্যাণ্ডের ওপর রবারের কাপ; দেখতে দেখতে বুললির কি যেন মনে হল, বলল, "মেয়েদের এত কিসিমের আছে মাইরি, আমাদের শালা কিছু নেই।"

সূর্য কি যেন বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ দোকানের আড়াল থেকে কে যেন বেরিয়ে এসে তাকে ডাকল। সূর্যরা দোকানের কাছাকাছি ছিল, সামান্য পিছন থেকে ডাকটা এল। ঘাড় ফিরিয়ে সূর্য দেখল, মালাদি।

সাইকেল পিছন দিকে ঠেলে সূর্য মালাদির কাছে এল। ওর বন্ধুরা সামান্য সরে গেল, গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

সূর্য আর তার মালাদি কি কথা বলছে। বুল্‌লিরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল। তারপর গাছের দিকে সরে গেল।

বুল্‌লি দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে মুখ খুলে নিল, 'চপ' শব্দ হল। বলল, "ড্রেসটা কি রকম পাক মেরে দিয়েছে দেখছিস! লেত্তি! একেবারে মাড় দেওয়া কড়া মাইরি! আমার আবার...।"

অভয় দেখতে দেখতে বলল, "বেশ হেভি ওয়েট বে!..."

সূর্য তার মালাদিকে দাঁড় করিয়ে সাইকেল সমেত ফিরে আসছিল। ওরা চুপ করে থাকল।

কাছে এসে সূর্য বলল, "মালাদি আমায় সঙ্গে করে বাড়ি নিয়ে যেতে চাইছে, মাইরি! কি করব!...তোবা বরং..."

বুল্‌লি বিরক্ত হয়ে বলল, "বাঃ! তুই টেনে আনলি, এনে কাট মারছিস। আমরা শালা এখন রাস্তায় টহল মারি। পিন্‌কির ওখানে যাব বলে বেরিয়ে...। হ্যাত .."

সূর্য পকেট থেকে টাকা বের করে গুনে পাঁচটা টাকা বুল্‌লির হাতে দিল। "তোরা গিয়ে বোস। আমি পারলে আসব।"

বুলালি বিশ্বাস করল না। বলল, "ব্লাফ ঝাড়ছিস।"

"বলছি তো ট্রাই করব," সূর্য বলল; সে যে মালার সঙ্গে চলে যাচ্ছে তার জন্যে আপাতত তার ব্যস্ততা ও খানিকটা উৎফুল্ল ভাব প্রকাশ পাচ্ছিল। সূর্য

তার সাইকেল কৃপাময়ের দিকে এগিয়ে দিল। "আমি মালাদির সঙ্গে রিকশায় যাচ্ছি। সাইকেলটা তোরা বিষ্টুর দোকানে রেখে যাস।...আমি পারলে পিন্‌কির কাছে যাব।" সূর্য সাইকেল ধরিয়ে দিয়ে চলে গেল।

একটু পরেই সাইকেল-রিকশায় মালার পাশে বসে সূর্য উধাও হয়ে গেল।

রিকশার ভাড়া চুকিয়ে নামবার সময় বাদামী পুরু কাগজের মস্ত ঠোঙাটা মালা সূর্যর হাতে দিল। সূর্য নীচে নেমে দাঁড়িয়ে ছিল। নামবার সময় ধীরে-সুস্থে সাবধানে নামল মালা। নেমে বলল, "তোমাদের এই রিকশাকে আমার বড় ভয়, সূর্য; দু-তিনটে শাড়ি ফাঁসিয়েছি; সেদিন একেবারে পা—এত্তটা ছড়ে গেল!"

সূর্য হাসল।

মালা বলল, "হাসি না; ছড়ে গিয়ে কী জ্বালা! চলো না তোমায় দেখাচ্ছি।"

সূর্য মালার পা দেখাব কল্পনা করল; তার জানতে কৌতূহল হচ্ছিল, মালাদির পা ঠিক কোথায় কেটেছে!

বাড়ির বার-বারান্দাটুকু পেরিয়ে বাঁ দিক দিয়ে নিজের ঘরে এল মালা। কাছাকাছি কোথাও বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। আলোব চমক খেলে গেল। পাশাপাশি দুটো ঘব, পাশের ঘবে আলো জ্বলছিল, ভেজানো দরজা ঠেলে মালা নিজের ঘরে ঢুকল, ঢুকে বাতি জ্বালল, পাখা চালিয়ে দিল।

ঘরের মধ্যেটা একেবারে এলোমেলো অগোছালো হয়ে আছে: ক্যাম্বিসেব ইজিচেয়ারটার ওপর সাটিনের পেটিকোট আব উজ্জ্বল রঙের একটা শাড়ি টাল হয়ে পড়ে রয়েছে, বেতের চেয়ারের ওপর বিকেলের তোলা শাড়ি ব্লাউজ, বেতের মোড়ার ওপর চায়ের কাপ। ঘরের জানলা খোলা, তবু কেমন একটা গন্ধ বেরোচ্ছিল। কাগজ, বই, পাউডারের কৌটো, চিরুনি, দেশলাইয়ের কাঠি, চুলেব কালো ফিতে—চতুর্দিকে ছড়ানো। বিছানার বেডকভাব এলোমেলো, কোঁচকানো, বালিশে মাথার গর্ত।

ঘরে ঢুকে মালা হাতের খুচরো জিনিসগুলো রেখে সূর্যর হাত থেকে ঠোঙা নিতে নিতে বলল, "বসো", বলে চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিল, "বিছানায় বসো।"

সূর্য বসল না, দাঁড়িয়ে থাকল।

মালার সামনেই নিচু ড্রেসিং টেবিল, টেবিলের ওপর চকচকে মস্ত কাগজের ঠোঙাটা নামিয়ে রাখার সময় মালার কাঁধ থেকে শাড়ির আঁচল খসে কোমব পর্যন্ত গড়িয়ে পড়ল, আবও গড়িয়ে পড়ত, হয়ত সমস্ত আঁচলটাই; কনুইয়ের সঙ্গে আঁচল আটকে গিয়ে কোমর পর্যন্তই গড়াল। মালা নিচু হয়ে ছিল, পিঠ

নুইয়ে। গভীর নীল রঙের সিল্কের শাড়ির আঁচল মাটিতে লুটোচ্ছে, সূর্য লুটোনো শাড়ি, মালার পিঠ-নোয়ানো বাঁকা শরীরের সামনে এবং পিছনটা দেখছিল। বুক-পিঠের কোথাও আঁচল নেই, সাদা সিল্কের ব্লাউজের সামনেটা ভারী বুকের ভারে ঝুলে আছে; ব্লাউজের গলার দিক অনেকটা বড় করে কাটা থাকায় ওপর-বুক এবং বুকের ঢালু দেখা যাচ্ছিল। হারের ঝুলন্ত ফুল-গিট ঠিক বুকের মাঝমাধ্যিখানে। মালা ঠোঙাটা রেখে দেবার পর আয়নার দিকে তাকাল।

সোজা হয়ে দাঁড়াবার সময় মালা আলগা করে আঁচল তুলে নিতে নিতে বলল, "দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বসো না", বলে অগোছালো ঘরের দিকে চোখ বুলিয়ে হেসে বলল, "ঘরের চেহারা দেখছ?...আমার এই রকমই। একেবারে গুছিয়ে থাকতে পারি না। দেখো না যাবার সময় শাড়িটাড়ি বের করেছি, পরতে ইচ্ছে হল না, ওটা ফেলে আবার এগুলো পরলাম।...তুমি বসো, বিছানাতেই বসো।"

সূর্য সরে গিয়ে বিছানায় বসল। বসার পর সূর্যর আবার মালার পা দেখাব কথা মনে হল। ও কি পা দেখাবে?

মালা এবার দু-ঘরের মধ্যের দরজাটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। দরজা বন্ধ। কয়েক মুহূর্ত দরজার সামনে কান পেতে দাঁড়িয়ে থেকে মুখের কেমন এক ভঙ্গি করল। তারপর সূর্যর দিকে ফিরে বলল, "নিজের বাড়িতে জায়গা দিয়ে এখন আমিই চোর।"

সূর্য কিছু বুঝল না, তবু অবাক হল।

"কি খাবে বল, চা না কফি?"

"কফি?"

"কফিটফি আমি খেতে পারি না। ওঁর জন্যে রাখতে হয়েছে—" মুখ এবং চোখের ইশারায় পাশেব ঘর দেখাল মালা, দেখিয়ে ও-ঘরের মানুষটি সম্পর্কে তার মনোভাব বোঝাল।

সূর্য বলল, "চা খাব।"

"আর—?"

"আর কি—?"

"আর কিছু খাবে না?"

সূর্য মালাকে দেখল। তার ঠিক খিদে পাচ্ছিল না, অথচ পেট থেকে জিব পর্যন্ত কেমন একটা তৃষ্ণা এসেছে। এ তৃষ্ণা জলের নয়, চায়েরও নয়। চোখ দুটো সামান্য জ্বালা করল সূর্যর। হঠাৎ খুব সপ্রতিভ হয়ে জবাব দেবার চেষ্টা করল সূর্য, "যা খাওয়াবেন তাই খাব।"

মালা চোখের এবং ঠোঁটের টান দেওয়া ভঙ্গি করল, হাসিটা গাঢ় হল, বলল, "ইস, বড় লক্ষ্মী ছেলে রে, যা দেব তাই খাবে...। আচ্ছা বসো, আসছি।" মালা চলে গেল। যাবার আগে আলনা থেকে কাপড় জামা তুলে নিল।

সূর্য প্রথমটায় দরজার দিকে তাকিয়ে বসে থাকল। তারপর ঘরের মধ্যে চারপাশে চোখ বোলাতে লাগল। ছোট টেবিল, মোটা ছাপা-কাপড়ের টেবল-ক্লথ, কিছু বইপত্র, কালির শিশি, কলম, চিনেমাটির ফুলদানিতে শুকনো ফুল, স্টিলের ছোট আলমারি, আলমারির মাথায় রেডিয়ো, মস্ত একটা শাঁখ, অন্য পাশে মেহগনি পালিশ দেওয়া কাঠের একটা বাক্স। ঘরের আলনায় গাদা করা শাড়ি জামা সায়া; বুক-বাঁধুনিগুলো একপাশে ঝুলছে। নীচে চটি আর জুতো। ওষুধপত্রের কয়েকটা শিশি ভেতর জানালার দিকে মিটসেফের ওপর। ঘরটাব কোথাও কোনোরকম যত্ন নেই। সূর্য ক্যাম্বিসের চেয়ারের ওপর ছড়িয়ে থাকা শাটিনের সায়ার মসৃণতার দিকে তাকিয়ে থাকল।

মালাদি তাদের আত্মীয়। কেমন আত্মীয় সূর্য জানে না। শুনেছে মা'র তরফের কে যেন হয়, মাসতুতো পিসতুতো করে সে এক লতাপাতায় সম্পর্ক। সেই সম্পর্কে অবশ্য মালাদির মাসি হওয়া উচিত, মালামাসি। যখন এখানের চাকরিটা নিতে আসে মালাদি, বাবার কাছেই আসে, বাবার হাত ছিল, বাবাই একরকম চাকরি দেবার কর্তা, তখন মালাদিকে মাসি বলেই শুনতে হয়েছিল। দু-একবার হয়ত সূর্য মালামাসি বলে ডেকেছিল তখন। তারপর আর নয়। দিদি নাম ধরে ডাকত, মালা। সূর্যও ঠিক মালাদি বলতে চায়নি। দিদিটিদি বলতে তার ভাল লাগে না, ঘেন্না হয়, তবু বয়সে বড বলে মালাদি বলেই ডাকতে হল। অবশ্য সূর্য খুব কম, কদাচিৎ মালাদি বলে, দিদি ডাকটা এড়াবার জন্যে সম্বোধনটা বেশির ভাগ সময়েই এড়িয়ে যায়। চাকরির জন্যে মালাদি এসেছিল। চাকরি পেয়ে প্রথমটায় সপ্তাহ দুই তাদের বাড়িতেই ছিল, তারপর ঘর ভাড়া কবে এখানে চ'লে এসেছে। দিদি মালাদিকে দু-চোখে দেখতে পারত না, সহ্য করতে পাবত না। ভাল ব্যবহারও করেনি।

সূর্য এদিক ওদিক তাকাবার সময় বিছানাব মাথার দিকে মাটিতে একটা ভাঙা মাটির ফুলদানি দেখল। দেখে মাথা নিচু করল। কয়েক টুকরো সিগারেট ছাই, দেশলাই কাঠি। ঘরের মেঝেতে ছড়ানো দেশলাই কাঠিব রহস্যটা সূর্য এতক্ষণে যেন বুঝতে পারল। সিগাবেট খায় নাকি কেউ? কে? এ বাড়িতে কে আসে?

কে আসে সূর্য অনুমান করার চেষ্টা করল। কোথাও থেকে হঠাৎ কোনো গন্ধ এলে যেমন যে কোনো মানুষ চারপাশের বাতাসে নাক টেনে গন্ধটার অস্তিত্ব ও স্থান ধরার চেষ্টা করে, সূর্য তার সন্দিগ্ধ মনে সেইভাবে যেন কাউকে ধরবার চেষ্টা করল। কাউকে তার মনে এল না। কে আসে এ বাড়িতে? কোমর নুইয়ে সূর্য ভাঙা ফুলদানিটা তুলে নিল। সে যা ভেবেছিল তার চেয়েও বেশি ছাই, অনেকগুলো সিগারেটের টুকরো। দু-চারটে টুকরো তুলে নিয়ে দেখল সূর্য। মার্কা চিনতে পারল, কাগজে নাম লেখা।

ছাইয়ের পাত্রটা রেখে দিল সূর্য। তার নিজেরই সিগারেট খেতে ইচ্ছে করছিল। এ বাড়িতে আসার মতন বাবু কি তবে সুধাংশুডাক্তার? সুধাংশু-

ডাক্তারের সঙ্গে কাজকর্ম করতে হয় মালাদিকে। যা [illegible]—তবে দুজনে আটকা-আটকি হয়ে গেছে। আরে, সুধাংশুডাক্তারের যে অনেক বয়েস, গোটা তিনেক বড় বড় ছেলেমেয়ে! সূর্য যেন মনে মনে বেশ অবাক হয়ে মালাকে সাবধান করতে যাচ্ছিল, হঠাৎ তার মনে পড়ল, সুধাংশুডাক্তার সিগারেট খায় না। অন্তত সূর্য দেখেনি কোনোদিন।...তাহলে? তাহলে আর কে হতে পারে ভেবে না পেয়ে সূর্য উঠল। উঠে ঘরের মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে হাই তুলল। হাই তোলার সময় শব্দ হল। পকেটে হাত দিয়ে সূর্য সিগারেট খুঁজল। তার পকেটে সিগারেট নেই।

হঠাৎ সূর্যর মনে হল পাশের ঘরে কেমন একটা কথা কাটাকাটি হচ্ছে, চাপা গলার কথা শোনা যাচ্ছে। সূর্য মাঝ-দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। মেয়ে কলেজের প্রফেসারটাকে এ বাড়িতে সে দেখেছে, মালাদি তাকে চিনিয়ে দিয়েছে। কিন্তু সূর্যকে ও তেমন পাত্তা দেয়নি। ভীষণ ডাঁট মাস্টারনীর, পায়ের তলায় মাটি ফাটছে যেন। দেখতে সুন্দর, পেটে শালা বিদ্যের জাহাজ—রোয়াব তো নেবেই।

সূর্যর মনে হল পাশের ঘরে যেন কি একটা পড়ল। চেয়ার? অন্য কিছু?

"কি হচ্ছে, ছেড়ে দাও...আঃ ..! পাশের ঘরে লোক আছে না!"

"মিছিমিছি তুই রাগ করবি কেন?" মালাদির গলা।

"আমি রাগিনি। ছাড়ো।...কাজ করতে দাও।", মেয়েলী গলার জবাব। জয়ন্তী। সূর্য বুঝতে পারল।

"আমার কী খারাপ লাগছে জানিস? মনটা পুড়ে যাচ্ছে।"

"আমার লাগছে। মুখটা সরাও তুমি!"

"সরাব না।.. তোর রাগ আগে পড়ুক!"

"আঃ, মালাদি কি করছ! লাগছে।"

"আমারও লাগছে।"

"না, তোমার লাগে না।"

"ভীষণ লাগে।...দেখ তুই দেখ! তুই আমায় এত কষ্ট দিস কেন, জয়? বাড়ি থেকে আমি চোখের জল নিয়ে বেরিয়েছি।"

"তুমি মিথ্যুক,.. মিথ্যুক।"

"বেশ, তুই আয়, আমি তোর সামনে আলমারি খুলে সব টান মেরে বের করে দিচ্ছি। তুই দেখ...। জয়, তুই রাগ করে শাড়ি জামা সব খুলে ফেলে দিয়ে এলি। কেন? দেখে নে আমার কোন জিনিসটা লুকিয়ে রেখেছি! ছি ছি, তোর কাছে আমি শাড়ি লুকোবো।...আমি তোকে কি এমন বলেছি? তোকে কি ফাঁকি দিতে চাই আমি?"

"ফেরত নিয়ে নাও।"

"এ কি ফেরত নেবার জিনিস. ।"

"ছাড়ো।"

"বেশ ছেড়ে দিচ্ছি।...তুই ওঠ, আমার ঘরে চল। ছেলেটা এসেছে, তাকে

[illegible] । "এই, সূর্যটা ধরে ওঘরে আয়, কফি করতে বলেছি।"
"ওঘরে আমি যাব না।"

"একবারটি এখন আয়...পরে না হয় তোর পায়ে ধরব।" মালা শেষের দিকে হাসল যেন।

সূর্য মাঝ-দরজার সামনে থেকে সরে দাঁড়াল, মালাদি এবার আসবে।

মালার আসতে আরও একটু দেরি হল, সূর্য ততক্ষণে ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে। চোখে কি একটা পড়ার মতন করকর করছিল, পাতা রগড়েও করকরে ভাবটা গেল না দেখে চোখের পাতা দেখবার চেষ্টা করছিল সূর্য। কিছু না। রুমালে চোখ মুছে নিল। মালাদি এবং জয়ন্তী যে কি নিয়ে অত কথা কাটাকাটি করছিল সূর্য স্পষ্ট বুঝল না, কিন্তু অনুভব করতে পারছিল—দুজনে মান অভিমানের ঝগড়া করছিল। ঝগড়াটা সূর্যর কানে অনভ্যাসের দরুন নতুন লেগেছে, অদ্ভুত লেগেছে। ওদের কথাবার্তার সুর থেকে সূর্যর কেমন একটা কৌতূহল হচ্ছিল। তার সন্দেহ হচ্ছিল, এটা ঠিক বন্ধুতে বন্ধুতে কথা কাটাকাটি বা রাগঝগড়া নয়। অন্য কিরকম যেন! কি রকম?

সূর্য অন্যমনস্কভাবে ড্রেসিং টেবিলের ওপর রাখা মস্ত ঠোঙার দিকে তাকাল; মুখের দিকটা খোলা, কাগজ ফাঁক হয়ে রয়েছে। ক্যাডবেরীর কয়েকটা চকোলেট চোখে পড়ল। চকোলেটের পাশে কাজুবাদামের প্যাকেট। সূর্য হাত ডুবিয়ে চকোলেটের একটা টুকরো ওঠাল, উঠিয়ে ঠোঙার মধ্যেটা নেড়েচেড়ে দেখল: দু-টুকরো গায়ে মাখা সাবান, ফেস পাউডার, নেল পালিশ, সিগারেটের চার পাঁচটা প্যাকেট, ওডিকোলনের শিশি, আর ওটা? ওটা যে কি সূর্য ঠিক বুঝতে না পেরে হাত ডুবিয়ে তুলে নিল। যাঃ শালা, এ যে ..

পায়ের শব্দে সূর্য জিনিসটা ঠোঙার মধ্যে ফেলে দিল। দিয়ে টেবিলের সামনে থেকে পিছিয়ে এল দ্রুত।

মালা এসে পড়ছিল। চোখে মুখে জলের ছিটে, শাড়ি জামা পালটে এসেছে। "ইস্—তোমায় অনেকক্ষণ একা বসিয়ে রাখলাম। আমি আবার বাইরে থেকে এলে কাপড়চোপড় না ছেড়ে পারি না।.. আবার কী রকম গুমট করেছে দেখেছ! ঘেমে মরছি। বাইরে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে খুব।" প্রায় আধখানা আঁচল বুকের পাশ দিয়ে টেনে মালা ভিজে মুখের সিক্ত ভাবটা মুছতে মুছতে ড্রেসিং টেবিলের সামনে গেল।

সূর্য আরও সরে এসে বিছানায় বসল।

মালা আয়নায় দেখে দেখে কপালের পাশগুলো মুছল। "চা না, কফিই আনছে, কফির সঙ্গে তোমায় নতুন একটা জিনিস খাওয়াব। ফ্রেঞ্চ টোস্ট।...এই ছেলে, একটু মুখ ফিরিয়ে জানলাটা দেখ তো! বড্ড গুমট, গলায়-টলায় পাউডার দিয়ে নি।"

সূর্য জানলার দিকে তাকাল না। মুখ সামান্য নামাল, সেই ভাঙা মাটির ফুলদানিতে সিগারেটের টুকরো আর ছাই। মালাদি কার জন্যে সিগারেট কিনে

এনেছে? কে থাকে এ-বাড়িতে—কে আসে? [illegible]
দেখল। অনেকটা পাউডার গলার তলায় বুকে এবং কাঁধে ফেলেছে মালা;
পাউডারে সাদা হয়ে আছে ঘাড় গলা। ডান হাতে পাউডার গায়ে ঘষে নিচ্ছিল,
ব্লাউজটা ছোট, এত ছোট যে পেটপিঠের অনেকখানি এবং সমস্ত বাহুমূল দেখা
যাচ্ছিল। পাতলা, সাদা, ছাপা শাড়ি; পেছনের দিকে খানিকটা কাপড় অগোছালো
হয়ে ফুলে আছে। সূর্য লক্ষ্য করে দেখল, মালাদির গা, হাতের মাংস তেলালো
নরম মতন, চর্বিতে ভরা, পেটে ভাঁজ হাতটা খুব পরিষ্কার।

আয়না থেকে সরে এল মালা। সরে এসে সরাসরি সূর্যর দিকে তাকাল।
দৃষ্টিটায় সামান্য যেন 'কি দেখছ তুমি, বড্ড অসভ্য'—এই রকমের একটা কৃত্রিম
ভর্ৎসনা। বুকের নীচে পড়ে থাকা আঁচলটা তুলে দাঁতে করে চেপে, দু-হাত ঘাড়ের
দিকে ফিরিয়ে মাথার খোপাটা খুলে ফেলতে লাগল, এবং কাঁটা ও ক্লিপ মুঠোয়
রেখে এগিয়ে এল।

বিছানার পাশে বসে মালা এবার বলল, "আমায় একটা বাড়ি খুঁজে দাও
না। তোমার চারদিকে ঘোরাফেরা।"

সূর্য কিছু বলার আগেই মালা আবার উঠল, উঠে ড্রেসিং টেবিলের কাছে
গিয়ে কাঁটাগুলো রেখে সেই বাদামী মস্ত ঠোঙার মধ্যে থেকে অডিকোলনের
নতুন শিশিটা বের করল। করে ফিরে এল। "শিশির মুখটা খুলে দাও।"

সূর্য খুলে দিল।

মালা খোলা শিশির গন্ধ নিল নাক টেনে টেনে, চোখের পাতা বুজে। তারপর
আঙুলে শিশির মুখ খানিকটা চেপে জামায় কাপড়ে অডিকোলন ছিটোলো,
কপালে আঙুল দিয়ে ফিকে অডিকোলনের স্পর্শ নিল চুলে কয়েক ফোঁটা ছেটাল,
শেষে সূর্যর গায়ে, জামায়, বিছানায়। শিশিটা বিছানার ওপর খেলার ছলে ছুঁড়ে
দিয়ে হঠাৎ সহাস্য মুখে হাতের মুঠোটা সূর্যর মুখে বুলিয়ে দিল।

অডিকোলনের গন্ধে কেমন একটা অস্থির ভাব লাগল সূর্যর।

মালা হাসির টান ধরে বলল "গন্ধটা তোমার ভাল লাগে না? আমার তো
এটা না হলে চলেই না মাসে তিন শিশি।"

সূর্য বলল, "গন্ধটা মড়ার গায়ে ছিটোনো গন্ধের মতন লাগে আমার।"

মালা দু-পলক সূর্যর দিকে তাকিয়ে ভ্রূভঙ্গি করল, তারপর আলতো করে
সূর্যর গালে আঙুলের আগা দিয়ে মারল। "ভূত! তুমি একেবারে ভূত একটা।"

বাইরে পায়ের শব্দ। এ-বাড়ির ঝি মকর কফিটফি নিয়ে ঘরে এল।

মালা উঠে গিয়ে পেয়ালা প্লেটগুলো ধরল মকর ঘরের অদৃশ্য কোণ থেকে
একটা টুল এনে বিছানার কাছে রাখল। মোড়ার ওপর পড়ে থাকা বিকেলের
চায়ের কাপ তুলে নিয়ে চলে যাচ্ছিল মকর, মালা জিজ্ঞেস করল, "ছোট দিদিমণির
কফিতে দুধ বেশি দিয়েছ?"

মকর মাথা নাড়ল। দিয়েছি।

"দিদিমণিকে ডেকে দাও।"

[illegible] [illegible] [illegible] গোল ট্রে-টা [illegible] উপর রেখে মালা সূর্যর কফি ও খাবার তুলে ট্রের ওপর রাখল।

সূর্য বলল, "আমি একলা খাব?"

"হ্যাঁ মশাই, তুমি একলা খাবে", মজা করে জবাব দিল মালা। "আমরা বিকেলে এক রাজ্যি খেয়েছি, মকর কচুরি করেছিল।"

সূর্য ফ্রেঞ্চ টোস্ট তুলে নিয়ে মুখে দিল।

মালা চামচে দিয়ে জয়ন্তীব কফির পেয়ালা নেড়ে দেখল, দুধ বেশি দিয়েছে কি না। তারপর নিজের পেয়ালাটা হাতে তুলে নিল।

সূর্য বলল, "এটা ডিম দিযে তৈবী?"

"হ্যাঁ। খেতে ভালো না?"

"ভাল।"

"এসব ওর শেখানো"—বলে মালা জয়ন্তীব ঘবেব দিকে ইঙ্গিত কবল।

"এখানে ও ববাবব থাকবে?" সূর্য হঠাৎ প্রশ্ন কবল।

মালা যেন প্রশ্নটা বুঝতে খানিক সময় নিল। "কি জানি। তখন তো কিছু বলেনি তেমন, এখন কি কববে জানি না। কলেজের মেয়েদের একটা প্রাইভেট হোস্টেল মতন নাকি হয়েছে?"

"থাকে ক'জন. পাল গলিতে।"

"ইনিও উঠে গেলে পারেন।" মালা গাল কুঁচকে বলল, কিন্তু অন্যমনস্কভাবে।

জযন্তী এল। গায়ে হালকা সবুজ রঙের লক্ষ্ণৌ চিকনেব শাড়ি। আঁচল টেনে গা বুক ঢাকা মাথায় মস্ত এলো খোঁপা—সামান্য বাঁকা করে রাখা। চোখে মুখে জল দিয়ে এসেছে, মুখ ভিজে ভিজে দেখাচ্ছিল। বেশ গম্ভীর, কপালে কুঁচকানো রেখা পড়ে আছে যেন। বাস্তায যতটা সুন্দবী লাগে ঘবে ততটা সুন্দবী লাগছিল না সূর্যব। কেমন বাসী বাসী লাগছিল, মনে হচ্ছিল বে-ইস্ত্রি কাপড জামা যেমন দেখায় সেই বকম। এই তুলনাটা সূর্যর মাথায় হঠাৎই এল, এবং মজা লাগল সামান্য।

মালা জয়ন্তীকে ডাকল, "এস, তোমার কফি জুড়িযে যাচ্ছে।"

জযন্তী চোখ তুলে সূর্যকে দেখে নিযেছিল। সামনে এসে ঘবের গন্ধটা যেন নাকে পেযে থমকে দাঁড়াল, বাতাস শুঁকল, মালা এবং সূর্যকে পাশাপাশি বিছানায বসে থাকতে দেখল আবার, তারপব পিঠ নুইযে কফির পেয়ালা তুলে নিল।

মালা সবে বসল, 'বসো।"

জয়ন্তী বসল না। "আমাব একটু কাজ আছে।" সূর্যর দিকে তাকাল, "ভাল?"

সূর্য ঘাড় নাড়ল। নেড়ে বিছানার আরও পাশে সরে গেল, যেন জয়ন্তীকে বসবাব জায়গা দিচ্ছে। মালা আরও একটু সরে এলে ওপাশে বসার অনেকটা জায়গা থাকবে।

মালা আবার বলল, "বসো।" [illegible] তোমার আজ কাজ দেখছি।" শেষের কথাটা ঠিক সোজা নয়, একটু যেন বেঁকানো।

সূর্য লক্ষ্য করল, মালাদি জয়ন্তীকে এখন 'তুমি' বলছে; তখন 'তুই তুই' করছিল।

জয়ন্তী যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও মালার পাশে গিয়ে বসল। বসে বিছানার দিকে তাকাল। অডিকোলনের শিশিটা বিছানায় পড়ে আছে। জয়ন্তী দেখছিল। তার দৃষ্টি প্রসন্ন নয়, অপ্রসন্নও যে তা বোঝা যায় না। তবু মনে হচ্ছিল, এ যেন ত [illegible] মনঃপূত নয়।

মালা বলল, "তোমার ফ্রেঞ্চটোস্ট সূর্যর খুব ভাল লেগেছে।" বলে হাসল কেমন, "ওকে নেমন্তন্ন করে একদিন আরও কিছু খাওয়াতে হবে।"

"খাওয়াও", জয়ন্তী কফির পেয়ালায় ঠোঁট ছুঁইয়ে চুমুক দিল।

"আমি কি খাওয়াব! আমার শিক্ষা বড়জোর মাংস।.. সে তোমাদের, তোমরা অনেক ফ্রেঞ্চট্রেঞ্চ জানো।"

জয়ন্তী মালার চোখের দিকে তাকাল। "তুমিও জানো।"

"আমি ভাই মাত্র একটা জানি"—বলে মালা প্রথমে জয়ন্তীর চোখের দিকে তাকিয়ে ঠোঁট গাল টোল দিয়ে হাসল, হাসিটা ইঙ্গিতময়; হেসে সূর্যর দিকে তাকাল, চোখের পাতা এবং দৃষ্টিতে পরিহাস গাঢ় করে মাখানো, তারপর আবার মুখ ফিরিয়ে জয়ন্তীর দিকে তাকিয়ে বলল, "সে আমি একদিন ওকে টেস্ট করিয়ে দেব। পুরনো খাবার। ও কি আর একেবারে না খেয়েছে।" মালা হাসতে লাগল।

জয়ন্তীর চোখমুখ আরও গম্ভীর হল। কথা বলল না।

সূর্য কিছু বুঝল না, তার কাছে এই হেঁয়ালি অদ্ভুত লাগলেও সে নির্বোধের মতন কৌতুক ও কৌতূহল বোধ করছিল। জয়ন্তীকে খুঁটিয়ে দেখার চেষ্টা করছিল সূর্য : ছিপছিপে দোহারা গড়ন, রঙ ফরসা, কাটাকাটা চোখ মুখ নাক, চোখের চশমা ঝকঝক করছে, নাকের ডগা ফোলা, ডাঁসা কুলের মতন। ঠোঁট পাতলা, ফিনফিনে; কেমন যেন ধারালো। গলা একটু লম্বা, পুষ্ট, সোনার হার আঁট হয়ে আছে, কানে পাথর, লাল পাথর। সূর্য দেখল, জয়ন্তীর পাতলা শাড়ির তলায় জামার আঁট ভাবটা ফুটে রয়েছে; মাঝারি, শক্ত, ওঠানো বুক।..'লুক স্টোর্সে'-র শো কেসে সাজানো রবারের জিনিসগুলোর কথা মনে এল সূর্যর।

জয়ন্তী উঠে পড়ল।

মালা বলল, "কি হল? উঠছ যে?"

"যাই, আমার কাজ রয়েছে। কোশ্চেন তৈরী করছি। সামনে একটা পরীক্ষা।"

মালা হাত বাড়িয়ে বুঝি জয়ন্তীকে ধরতে যাচ্ছিল থেমে গেল; জয়ন্তী বিছানা ছেড়ে কয়েক পা চলে গেছে।

মালা হঠাৎ বলল, "ওই ঠোঙাটা নিয়ে যাও। তোমার জিনিস আছে।"

জয়ন্তী দাঁড়াল। তাকাল। "আমার জিনিস?"

"নিয়ে যাও। আমার দু-একটা যা আছে পরে নিয়ে নেব।...নিয়ে যাও।" মালা যেন কি রকম উত্তেজিত।

জয়ন্তী ড্রেসিং টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে ঠোঙার মধ্যে হাত দিল। নেড়েচেড়ে দেখল। কি ভাবল। রেখে দেবে না নেবে? শেষে তুলে নিল। নিয়ে কি ভেবে হঠাৎ হাত ডুবিয়ে সিগারেটের প্যাকেটগুলো বের করে ড্রেসিং টেবিলের ওপর ছড়িয়ে রাখল। তারপর চলে গেল।

সূর্য সমস্ত দেখছিল। কফির পেয়ালা মুখ থেকে নামাল এবার।

মালা দরজার দিকে তাকিয়ে। কিছু ভাবছে। অসন্তুষ্ট যেন। সিগারেটের প্যাকেটগুলো আড়চোখে দেখে নিচ্ছিল।

সূর্য কি ভেবে নীচু হয়ে পায়ের দিকে তাকাল। সেই মাটির ভাঙা ফুলদানি: সিগারেটের টুকরো আর ছাই। পায়ে করে একটা লাথি মারার ইচ্ছে হচ্ছিল তার।

মালা ক্রমশ নিজেকে সামলে নিয়েছে। সূর্যকে কিছু বোঝাচ্ছে, বা একটা কৈফিয়ত দিতে হচ্ছে যেন, হাসি মুখ করে বললে, "পর নিয়ে ঘর করা ঝকমারি! কী যে মেজাজ ওর! মাথায় ছিট আছে। এইরকম করলে কলেজে কতদিন থাকতে পারবে?"

সূর্য কিছু বলবে বলবে ভাবছিল, মেঘের ডাক শুনে যেন থেমে গিয়ে জানলার দিকে তাকাল।

"আজ আবার বৃষ্টি হবে", মালা বলল, "যা গরম পড়ছে বিকেল থেকে, গুমট।...হোক, বৃষ্টি হোক, বৃষ্টি হোক, রাত্রে আরাম করে ঘুমোতে পাবব।"

"এখন খুব গুমট লাগছে—" সূর্য বলল। কফিটা সে প্রায় শেষ করে এনেছে। গরম অথবা অন্য কোনো কারণে তার ঘাম ফুটছিল।

"এখানের গরমে আমার বেশ কষ্ট হয়।...গরমে কত ঘামাচি হয়েছে দেখেছ—?" মালা কাঁধের পাশ থেকে আঁচল সরিয়ে ফেলল।

মালাব কাঁধ দেখল সূর্য : পাউডারের একটা সাদা মোটা সর মাখানো রয়েছে যেন, ঘামাচি দেখা যাচ্ছিল না, দু-একটা জায়গায় লালচে দাগ। মালা ভাল করে কাঁধ দেখাবার জন্যে চুলের গোছা বাঁ হাতে তুলে গলা বেঁকিয়ে পিঠ দেখাল। ব্লাউজের বুক-পিঠ বাঁকা চাঁদের মত করে কাটা, গভীর করে। সূর্য মোটা চামড়ার সাদাটে পরিষ্কার ঘাড় পিঠ দেখল, মেদমাংস যথেষ্ট, একটা বড় জড়ুল, ঘাড়ের চুলের গুচ্ছ লালচে হয়ে গেছে। সূর্যর ইচ্ছে করছিল নখ দিয়ে মালাদির কাঁধ আঁচড়ে বক্ত বের করে দেয়। হাতের তালু খুব গরম লাগছিল, জ্বালা করছিল। আর হঠাৎ তার এখন হিংস্র হতে ইচ্ছে করছিল।

"ঘাড়ের ওই অবস্থা, এদিকে গলার হালটা দেখ একবার—।" মালা ঘুরে বসে, মুখ উঁচু করে গলা দেখাতে লাগল। গলা দেখাবার সময়, গায়ের খোলা আঁচলের খানিকটা মুঠো করে বুকের মাঝখানে ধরে থাকল মালা, যেন বুক আড়াল দিয়ে রাখছে। সূর্য মালার গলা তেমন দেখল না, মোটা গলা, কণ্ঠনালি ফুলে রয়েছে, মঞ্জরী হারের গায়ে পাউডারের গুঁড়ো। চোখের দৃষ্টি গলার

নীচে রেখে সূর্য অপলকে গভীর ঢালু এক অন্ধকার দেখছিল। গরমের জন্যে মালাদি নীচের জামা পরেনি হয়ত। সেফটিপিনটা খুলে নেবার জন্যে হাত কাঁপছিল সূর্যর। কানের দু পাশ থেকে অদ্ভুত এক জ্বালা কপাল ও গলা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে।

মালা অনায়াসে মুখ নামিয়ে মুঠোর আঁচল কাঁধে টেনে নিয়ে নিজের হাত দেখাল। "হাতটাও একবার দেখ, কত ঘামাচি! গিজগিজ করছে।"

সূর্যর প্রায় কোলের ওপর হাত মেলে ধরল মালা। হাত গোলগাল, পুরুষ্টু; কোথাও একটু লোম নেই, মসৃণ, কেমন কালচে দাগ ধরে আছে, গুঁড়ি গুঁড়ি কয়েকটা ঘামাচি, দু-এক জায়গায় লালচে চামড়া। হাতের বালা মোটা মোটা। চৌকোনো, পুরু হাত, আঙুলের ডগা চ্যাপ্টা, ছোট।

সূর্য চাপা গলায় বলল, "গায়ে একটাও লোম নেই!"

"লোম রাখতে পারি না; ঘেন্না করে। পরিষ্কার করে ফেলি।"

সূর্য আরও কয়েক পলক মালার হাত দেখে শেষে চোখ তুলে মুখ দেখল। ফোলাফোলা মুখ, প্রায় গোল, বড় মোটা নাক, বড় বড় চোখ, চোখের মণি ভেসে উঠেছে, পুরু ফুলে-ওঠা ঠোঁট, চিবুকে খাঁজ নেই। গালে ব্রণর দাগ শুকিয়ে ছিট ধরেছে, এখনও গালের দুদিকে নাকের কাছাকাছি মাছির মতন কালচে ব্রণর দাগ।

মালার সঙ্গে সূর্যর চোখাচোখি হলে মালা কি-রকম হাসল।

সূর্য অস্থির বোধ করছিল। পায়ে এবং কোমরের কাছে মাংসপেশী থরথর করে কাঁপছিল। বুকও কাঁপছে।

মালা হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। হয়ত তার মনে হল, এবার উঠে পড়া উচিত। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "বাইরে বড় মেঘ ডাকছে। বৃষ্টি আসবে। ঠাণ্ডা বাতাস এল।"

সূর্য ইচ্ছেয় হোক অনিচ্ছায় হোক, ভাঙা ফুলদানিতে হঠাৎ এক লাথি মারল। ফুলদানিটা ছিটকে মাঝ ঘরে গিয়ে ভেঙে গেল, ছাই, সিগারেটের টুকরো ছিটিয়ে পড়ল।

মালা তাকাল, সূর্যও তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল।

শেষে মালা বলল, "কাজ বাড়ালে তো, দেখি মকরুকে ডাকি।"

সূর্য এবার শুধলো, "সিগারেট কে খায়?"

"কেন, তুমি খাবে?" মালা হেসে জিজ্ঞেস করল।

"খাব।"

মালা ড্রেসিং টেবিলের সামনে গিয়ে একটা প্যাকেট তুলে এনে সূর্যর হাতে দিল, "ওটা তুমি নাও।...নরম সিগারেট খেতে পারবে তো?"

"কে খায় সিগারেট?"

"আমি। দু-চারটে খাই।"

সূর্য অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল।

মালা হেসে ফেলল। বলল, "আমার সারাদিন যা ঘেন্নার কাজ করতে হয়...।

এ আমার পুরনো নেশা।"

সূর্য কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারল না।

মালা বলল, "আমাদের ফ্যামিলি প্ল্যানিংয়ে যে কিরকম সব মেয়ে আসে। এটা বলো, ওটা বলো, এটা শেখাও, ওটা শেখাও...।" বলতে বলতে মালা হাসল, "সেদিন এক গিন্নী যা করল আমায়।...সে গল্প তোমায় বলব একদিন। হেসে মরি আমি।"

মেঘের ডাক এবং ঠাণ্ডা বাতাস পেয়েই মালা বোধহয় চঞ্চল হল। বলল, "বৃষ্টি আসতে পারে; তুমি আর দেরি করো না।"

সূর্য সামান্য বসে থেকে উঠল। সিগারেটের প্যাকেটটা হাতে।

মালা বলল, "আবার এস একদিন তুমি তো আসই না। খোঁজ খবর নাও না।"

ঘরের বাইরে এল সূর্য, মালা তার পাশে। আকাশ কালো হয়ে আছে, মেঘ ডাকছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে খুব, ঠাণ্ডা জলো বাতাস।

বার-বারান্দা পর্যন্ত সূর্যকে পৌঁছে দিয়ে মালা ফিরে গেল।

রাস্তায় নেমে সামান্য হাঁটতেই বৃষ্টি। আচমকা যেন। বেশ জোরে বৃষ্টির ঝাপটা এসেছে। সূর্য এগুতে পারল না। ধুলো বালির ঝাপটা এবং সোঁদা গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে ও পিছন দিকে ছুটল। মালাদির বাড়ি থেকে একটা ছাতা নেবে।

জলের ছাট এসে পড়ছে বারান্দায়, আকাশ ফেটে বুঝি বাজ পড়ল। ভেজা ভেজা চুল ও জামা নিয়ে সূর্য বারান্দা দিয়ে বাড়ির ভেতরে এল। মালাদির ঘরের দরজার শেকল তোলা। ঘর অন্ধকার। জয়ন্তীর ঘরের দরজা বন্ধ। মকরকে দেখা যাচ্ছে না, হয়ত বৃষ্টির মধ্যে রান্নাঘরে বসে আছে।

সূর্য জয়ন্তীর দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। বাতি জ্বলছে ভেতরে। দরজার ফাঁকে আলো।

দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে সূর্য মালাদির গলা পেল। কি যেন বলছে মালাদি, বোঝা যাচ্ছে না। চাপা গলা, অথচ জড়ানো, কখনও কখনও আকুল স্বর। বৃষ্টির ছাট ভেতর বারান্দায় এসে জলে ভিজিয়ে দিচ্ছিল। সূর্য কি করবে বুঝতে পারছিল না। দরজায় ধাক্কা দেবে?

ধাক্কা দেবার আগেই সূর্য শুনল. জয়ন্তী ব্যতিব্যস্ত গলায় জোরে জোরে বলল, "কি যে করছ?...ছাড়ো। আঃ, লাগছে...আমার লাগছে।...তোমার দাঁতে বড় ধার।"

"লাগবে না আর লাগবে না—" মালা আদর-করা গলায় বলল। তারপর সূর্যর মনে হল, যেন ঘরের মধ্যে থেকে অডিকোলনের কেমন ঘন বিশ্রী গন্ধ ভেসে এল। জলে ভিজে সূর্য কেঁপে উঠল।

৭

অবেলায় ঘুমিয়ে পড়েছিল কৃপাময়। দিন দুই ধরে তার সর্দি-জ্বর চলছে। গা হাত পিঠ ব্যথায় ভেঙে পড়ছিল, মাথা তোলার সাধ্য ছিল না। আজ সকাল থেকে খানিকটা আরাম পেয়ে এবং নির্বিচারে ক'দিন ধরে অ্যাসপিরিন ট্যাবলেট খেয়ে খেয়ে আলস্য, ক্লান্তি ও দুর্বলতাবশত দুপুরে একটা গল্পের বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম ভাঙলে তার প্রথম মনে হয়েছিল, সকাল হয়ে আসছে, তারপর বুঝল—বিকেল পড়ে যাচ্ছে। বাইরে ছোট এক টুকরো মাঠে বাচ্চা ছেলেগুলো খেলা ভেঙে চেঁচামেচি করছে, কলের জল চলে যাওয়ায় রাস্তায় নানকু চিৎকার করছিল। সাইকেলের ঘণ্টি অনবরত কানে আসছিল। আজ বাইরেব বাতাস বেশ শুকনো।

বিছানায় উঠে বসে কৃপাময় জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ; ঘুমের ময়লায় চোখের কোলে সামান্য জল, দৃষ্টি ঝাপসা। হাই উঠছিল। তারপর বিছানা ছেড়ে উঠে চোখমুখ ধুয়ে আসতে গেল।

ফিরে এসে দেখল ছোটকাকি এক গ্লাস চা নিয়ে বিছানায় বসে।

কৃপাময় মুখ মুছতে মুছতে বলল, "আরে ব্বাস, না চাইতেই জল! কি ব্যাপার, ছোটকাকি?"

প্রতিমা বলল, "এই চা নিয়ে দুবার ঘুরে গেছি।.. নাও, গরম করে আনলাম।" চায়ের গ্লাসটা এগিয়ে দিল প্রতিমা। "তোমার পুরো গ্লাস, খাও যত পার।"

কৃপাময় চা নিল। চুমুক দিয়ে বলল, "আদা দিয়ে করেছ! বাঃ! মার্ভেলাস!... সত্যি ছোটকাকি, তোমারই দেখছি একটু মায়াটায়া আছে আমার ওপর।" কৃপাময় হাসতে লাগল। এ-সময় আদা-চা তার খুবই ভাল লাগে; ছোটকাকিকে দিয়ে সে অনেকবারই আদা-চা করিয়ে নিয়েছে এ ক'দিন। আজ একেবারে গ্লাস-ভর্তি করে চা এনে দিয়েছে ছোটকাকি।

"অবেলায় পড়ে পড়ে এত ঘুমোচ্ছিলে কেন? ডেকেও সাড়া পাই না।" প্রতিমা বলল।

"বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।"

"ভার গায়ে ঘুমোতে নেই; গা ম্যাজম্যাজ করে আবার জ্বর আসবে।"

"না, আর আসবে না। ইনফ্লুয়েঞ্জার জ্বর...।"

প্রতিমা হাত বাড়িয়ে কৃপাময়ের কপাল গলা বুক দেখল, হাত দেখল। "গা বেশ ঠাণ্ডা।"

"ছোটকাকা কোর্ট থেকে ফিরেছে?"

"না, ফিরতে দেরি হবে।"

"মেজকাকা?"

"ফিরেছেন। ওঁর অফিসে আজ কে যেন মারা গেছে, মন-টন খারাপ করে ফিরেছেন।"

"কে মারা গেছে?"

"জানি না। কি যেন নাম শুনলুম মেজদির মুখে, বয়েস তেমন কিছু হয়নি; মেজঠাকুরের সমানই প্রায়।"

কৃপাময় অন্যমনস্কভাবে কিছু ভাবছিল। "কোথায় থাকে?"

"রেলপাড়ার দিকে", প্রতিমা বলল, বলে হঠাৎ তার যেন নামটা প্রায় মনে পড়ছিল, "জিতেনবাবু না যতীনবাবু বলে কেউ ছিলেন? চেনো?"

চেনবার চেষ্টা করল কৃপাময়। পারল না। মাথা নেড়ে বলল, "না। . কি হয়েছিল?"

"মাথা ঘুরে পড়ে মারা গেছে।"

কৃপাময় কয়েক মুহূর্ত ছোটকাকির মুখের দিকে তাকিয়ে অস্পষ্ট গলায় বলল, "বাবার মতন। বাবাও পড়ে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে মারা গিয়েছিল। মাথার ভেতর নাকি শিরা ছিঁড়ে যায়...।"

প্রতিমা কিছু বুঝল হয়ত, কথাটা আর বাড়তে দিল না। বলল, "থাক, এখন এই সন্ধ্যের মুখে আর-মরাটরার কথা ভাবতে হবে না। . শোনো, কাজের কথা বলি।"

কৃপাময় চা খেতে লাগল। গলায় বেশ ঝাঁজ লাগছে আদার।

প্রতিমা খানিক অপেক্ষা করে কিছু ভাবতে ভাবতে বলল, "আমায় নিয়ে একবার দেওঘরে যাবে?"

"দেওঘর? দেওঘরে তোমার কে আছে?" কৃপাময় অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

"আছে। আমার বাবার গুরুদেব আছেন।"

"গু-রু-দে-ব!" কৃপাময় চোখে চোখে তাকাল ছোটকাকির, অবাক দৃষ্টি। তারপর ঠাট্টা করে বলল, "আশ্রমটাশ্রম আছে নাকি?"

"না। তিনি আর গুরু-ঠাকুমা থাকেন। দু-একটা বাড়তি ঘর আছে, শিষ্যটিষ্যরা গেলে থাকে।"

"তুমি কেন যাবে?"

"দীক্ষা নেব।"

"দীক্ষা!" কৃপাময় কথাটা বিশ্বাস করতে না পেরে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল।

প্রতিমা কোনো জবাব দিল না কথার, বিকেলের বাঁধা খোঁপার কাঁটাগুলো

আবার গুছিয়ে জায়গা বদলে গুঁজে নিতে লাগল।

কৃপাময় ছোটকাকির মুখের দিকে তাকিয়ে ব্যাপারটা যথাসাধ্য বোঝবার চেষ্টা করল, শেষে হেসে ফেলল। "কি ব্যাপার ছোটকাকি? তোমার কি হিস্টেরিয়া হয়েছে?"

"হিস্টেরিয়া?"

"না হলে মন্তর নেবে কেন?"

"ফাজলামি!..." প্রতিমা ভাসুরপোকে যেন চোখে চোখে ধমকালো।

কৃপাময় হাসছিল। "না, সত্যি বলছি।"

"কেন, দীক্ষা কেউ নেয় না?"

"নেবে না কেন? আমার মাতাঠাকুরানীও তো নিয়েছিল।...দীক্ষার পরিণাম দেখছ না—বদ্ধ পাগল হয়ে পড়ে আছে" কৃপাময় তিক্ত পরিহাসের গলায় বলল, "ঘরে শেকল দিয়ে রাখতে হয়।"

প্রতিমা দু-পলক দেখল কৃপাময়কে, তারপর বলল, "ছি কৃপাময়, এভাবে বলতে নেই। দীক্ষা নিয়ে বড়দি পাগল হবেন কেন? ওটা ওঁর অসুখ।"

"দীক্ষাটাই অসুখ—" কৃপাময় জোর দিয়ে বলল।

"না," প্রতিমা মাথা নাড়ল, "তুমি জানো না ...তুমি ছেলেমানুষ, সব কি বুঝতে পার!"

"আমি ছেলেমানুষ আর তুমি বড়মানুষ ছোটকাকি?" কৃপাময় হাসবার চেষ্টা করল। "আমার চেয়ে তুমি ক'বছরের বড়?"

প্রতিমা বয়সের হিসেব দিল না, দেবার দরকার নেই, এ বাড়ির সকলেই জানে প্রতিমা আর কৃপাময়ের মধ্যে বয়সের তফাত বড় নেই, বছর দুই আড়াইয়ের বড় জোর। প্রতিমা হাসিমুখে বলল, "আমি তোমার মতন ছেলেমানুষ নাকি! তোমার কাকি! মনে রেখ।"

কৃপাময় লম্বা করে চায়ে একটা চুমুক দিয়ে মজার মুখ করে বলল, "কাকি তো নিশ্চয়ই, কিন্তু আমি যে তোমার বিয়ে দিয়ে আনলাম, ছোটকাকি।"

এবার প্রতিমা হাত বাড়িয়ে কৃপাময়ের চুলের গোছা আলগা মুঠোয় ধরল, ধরে খুব আলতো করে একটু টান দিয়ে বলল, "তাহলে তো তুমি আমার শ্বশুরমশাই।"

প্রতিমার সপ্রতিভ সহাস্য জবাবে কৃপাময় হেসে ফেলল। প্রতিমাও হাসতে লাগল। প্রতিমা কৃপাময়ের চুলের গোছা থেকে হাত সরিয়ে নিল না, হালকা করে আস্তে আস্তে মাথার চুল টেনে দিতে লাগল। হাসিটা শেষ পর্যন্ত থেমে গেল। বাইরে বিকেলের অবশিষ্ট আলোক-ভাব মুছে ঝাপসা আঁধার নেমেছে। হাসি থেমে যাবার পর ক্রমশ দুজনের মুখে কেমন বিষণ্ণতা জমছিল।

প্রতিমা বলল, "তুমি আগে সেরে ওঠো, দিন দশবারো পরে আমরা যাব।"

"না।" কৃপাময় মাথা নাড়ল।

"না কি, সত্যিই আমি যাব।" প্রতিমা ধীরে ধীরে বলল, "চিঠিপত্র লিখে

ব্যবস্থা করেছি। গুরু-ঠাকুমা আমায় যেতে লিখেছেন।"

কৃপাময় কি ভেবে জিজ্ঞেস করল, "ছোটকাকা তোমায় মন্তরফন্তর নিতে বলেছে?"

প্রতিমা ঘাড় হেলিয়ে বলল, "তোমার কাকা না বললে কি নিতে পারি! সবাই মত দিয়েছে।"

কৃপাময় কেমন অর্থহীন চোখে ছোটকাকির শ্যামল-সুন্দর, মিষ্টি, মমতা-ভরা মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। ছোটকাকির দুচোখ টলটল করছে, জল নেই, দীপ্তি নেই, কেমন যেন উদাস, শান্ত। কৃপাময়ের কি যেন বলার ইচ্ছে করছিল, বলতে পারছিল না।

"ছোটকাকি?"

"উঁ—!"

"তুমি মন্তর-টন্তর নিচ্ছ কেন?"

প্রতিমা কোনো জবাব দিল না। অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে থাকল। খানিক পরে, যেন কিছু একটা বলতে হবে বলে বলল, "এমনি, নিতে ইচ্ছে করছে।"

কৃপাময় যে কিছু বুঝল না তা নয়, সে বুঝতে পারছিল। অথচ ছোটকাকি তার সমবয়সী হলেও সে ছোটকাকির মনের কথা নিয়ে আলোচনা করতে পারে না; সে অধিকার তার নেই। কিছুক্ষণ চুপচাপ, শেষে কৃপাময় বলল, "তোমারও ঐ রকম হবে ছোটকাকি, মা'র মতন।"

প্রতিমা মাথা নাড়ল আস্তে করে, না হবে না। কৃপাময়ের বুকে হাত দিয়ে গা দেখল কিংবা কিছু যেন বোঝবার চেষ্টা করল নীরবে, তারপর উঠে দাঁড়াল। "যাই, সন্ধ্যে দিই গে।...আজ রাত্তিরে রুটি খাও দুটো, আলু মরিচ দিয়ে। কালও ভাত দেব না। পরশু...।"

বিছানার পাশ থেকে চলে গিয়ে প্রতিমা ঘরের বাতিটা জ্বালাল; জ্বালিয়ে চলে গেল।

কৃপাময় চুপচাপ বসে থাকল। বসে বসে বাকি চাটুকু শেষ করল। বিছানার ওপর একটা বাংলা উপন্যাস উপুড় হয়ে পড়ে আছে। বইটা মুড়ে রেখে দিল। জানলা দিয়ে বাইরের আর কিছু দেখা না গেলেও পুরনো চেনা শব্দগুলো ভেসে আসছিল। ওই শব্দ শুনে কৃপাময় অনেক কিছু বলে দিতে পারে। ওই যে শাঁখ বাজছে—ওটা বাজাচ্ছে আশামামিমা, আশামামিমা একইভাবেই শাঁখ বাজায়, পাশের বাড়িতে আজ কত বচ্ছর আশামামিমা একইভাবে সন্ধ্যেবেলায় শাঁখ বাজিয়ে এল, মনে হয় যেন আকাশের ওপার থেকে সন্ধ্যেটাকে ডেকে এনে এই পাড়ার মধ্যে শব্দে শব্দে ছড়িয়ে দিল। উলটো দিকের বাড়িতে একটু পরেই ফটফট করতে করতে একটা মোটর সাইকেল এসে দাঁড়াবে, জ্ঞানকাকা ফিরবেন কারখানা থেকে। একনাগাড়ে কাশতে কাশতে রাস্তা দিয়ে এখুনি একজন যাবে—দত্তবাবু, আজ আট-দশ বছর ওইভাবে দত্তবাবু কাশতে কাশতে যান; রাস্তায় বাতি জ্বালাতে শুরু করে দিয়েছে সদানন্দ, এ পাড়ার বাতি এখুনি জ্বালিয়ে দেবে।

পান্নাদের বাড়িতে ঝগড়া শুরু হবে সবার শেষে।...কৃপাময় বিছানার ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। তার ভাল লাগছে না। ছোটকাকি মন্ত্র নেবে, ছোটকাকি দেওঘর গিয়ে মন্ত্র নেবে...। তারপর দেখতে দেখতে তার মা'র মতন হয়ে যাবে। ছোটকাকি বলছে, হবে না। কিন্তু এই রকমই হয়। হয় না?

কৃপাময় তাদের এই সংসারে এক একজন মানুষকে এক এক রকমের দেখল। বাবা পুরোপুরি সাদাসিধে মানুষ ছিলেন। ঠাকুদা মারা যাবার পর চার ভাই, দু-বোন আর বিধবা মা নিয়ে বাবা মস্ত এই সংসারটার হাল ধরেন। বাড়িটা ঠাকুর্দার আমলের, মানুষগুলোও সেই আমল থেকে এসেছে। তার ফলে বাবা যতই দায়িত্ববান হবার চেষ্টা করুন, ভীষণ অগোছালো ছিলেন। যে যা চাইছে, যার যা ইচ্ছে বাবা তা মিটিয়ে যাচ্ছেন—কিন্তু কার পক্ষে কোনটা মানায়, কার কোনটা পাওয়া উচিত তা বিচার করতেন না। অত পুরনো কথা অবশ্য কৃপাময় জানে না, কিন্তু পরে বাবার মুখেই শুনেছে যে, বাবা যথাসাধ্য করেও সংসারের বাঁধন রাখতে পারলেন না, যে যার মতন হয়ে গেল। মেজকাকা হল স্বার্থপর, কৃপণ, আত্মসুখী; সেজকাকা কলকাতায় গিয়ে ডাক্তারী পড়ল, পড়ে হাস-পাতালের মেয়ে বিয়ে করল, তারপর তার অংশের প্রাপ্য টাকা বুঝে নিয়ে কলকাতায় ডিসপেনসারি খুলে প্র্যাকটিস করতে লাগল। এখানে আগে কালে-ভদ্রে আসত, আজকাল আসে না। বলে, মা যতদিন বেঁচে ছিল গিয়েছি, মা নেই, আমার সঙ্গে আর কিসের সম্পর্ক। ছোটকাকা ওকালতি পড়ার সময় বাবা ছোটকাকার বিয়ে দিয়ে দেন। হয়ত বুঝতে পেরেছিলেন তিনি মারা যাবেন। মারাও গেলেন হুট করে। ছোটকাকার সেই বউ বছর দুই এ সংসারে ছিল, তারপর মারা গেল। সেই কাকিকে কাকার খুব পছন্দ ছিল। অনেক পেয়েছিল কাকা শ্বশুরবাড়ি থেকে। কাকি মারা যাবার পর কাকার খেপা-খেপা অবস্থা। বাচ্চাকাচ্চা রেখে যায়নি কাকি। শেষে কাকাকে ধরে-করে এই বিয়ে। এই বিয়েটা পুরোপুরি দেখতে পায় কৃপাময় চোখ বুজলেই। সব মনে পড়ে। মেজকাকির সঙ্গে সে প্রথমে মেয়ে দেখতে যায়। ছোটকাকি তখন একেবারে এমনি একটা মেয়ে—ইনিবিনির মতন। খুব সরল ছিল। কৃপাময়ের সঙ্গে কথা বলার সময় 'আপনি' বলে ফেলেছিল; গান গেয়ে শুনিয়েছিল হারমোনিয়াম বাজিয়ে। ছোটকাকার বিয়েতে কৃপাময়কে বারবার ও বাড়িতে যেতে হয়েছে, বাজারহাট করতে হয়েছে, তত্ত্বতাবাস নিয়ে ছুটতে হয়েছে। খুব খাটুনি গিয়েছিল কৃপাময়ের সেই বিয়েতে। অথচ বিয়ের পর, ছোটকাকাই একদিন বলল, "কোত্থেকে একটা কালো মুখ্যু মেয়ে যোগাড় করে এনেছিস? আমাদের বাড়িতে এ-সব রাস্তার ভিখিরি মানায় না।" কৃপাময় কোনোদিন বোঝেনি, কে ভিখিরির মেয়ে। হয়ত রঙটাই কালো ছোটকাকির, কিন্তু কাকি মুখ্যু হবে কেন! আগের কাকির রঙ ফরসা ছিল খুব, কিন্তু চোখমুখ ভাবভঙ্গিতে যে অহংকার ও তাচ্ছিল্য ছিল তা কারও ভাল লাগেনি, এক ছোটকাকার ছাড়া। এ বাড়িতে অনেক অশান্তি করে শেষে বাপের বাড়ি চলে গেল সেই কাকি, গিয়ে মারা গেল। বাপের বাড়িতে

গিয়ে যে মারা গেল, সেই মারা যাওয়াটা সন্দেহজনক। কলেরায় কি না সন্দেহ।... এই ছোটকাকি সে কাকির তুলনায় কেন খারাপ, কোথায় খারাপ, কৃপাময় বোঝেনি। তবে আজকাল বুঝতে পেরেছে—ছোটকাকার বউটউ তেমন দরকার ছিল না, মেয়েছেলের দরকার ছিল মাঝে মধ্যে; সেই দরকারটা ছোটকাকা বাইরে থেকে যে মিটিয়ে আসে তা আজকাল বোঝা যায়। মদটদও বেশ খায়। আর টাকা : টাকা টাকা করে ছোটকাকা পাগল। ওকালতি করছে, ট্যাক্সি কিনে ভাড়া খাটাচ্ছে, বেনামা জমি কিনে কিনে রাখছে। টাকার নোংরায় গলা ডুবিয়ে কাকা বসে আছে। কিন্তু এসব কার জন্যে? কে আছে তোমার? বাচ্চাকাচ্চা নেই; হবে বলেও মনে হয় না।...কাকাদের এই; পিসিদেরও অন্য হাল। বড় পিসির সঙ্গে যে ছেলের বিয়ে দিয়েছিল বাবা, সেই ছেলে এখন মস্ত চাকরি করে নাগপুরে, পিসি সেখানে; সম্পর্ক চুকেবুকে গেছে। ছোট পিসির সঙ্গে যার বিয়ে হল সে শালা চোর। কার্তিকের মতন দেখতে, কিন্তু এত বড় চোর আর ধাপ্পাবাজ দেখা যায় না। সেই লজ্জায় পিসি বাপের বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক কাটিয়ে দিয়েছে। আর আসে না।

এই রকম বিচিত্র এক সংসারে কৃপাময় মানুষ। শহরে তাদের বনেদী বাড়ি বলে বরাবরের খ্যাতি। হয়ত ঠাকুর্দার জন্যে, এই বাড়ির জন্যে। অথচ এমন বনেদী বাড়ির বনেদটা যে কোথায় কেউ কোনোদিন দেখেনি। কৃপাময় জানে, এ বাড়ির ভিত, দেওয়াল, কড়িবরগা আর পুরনো যত আসবাবপত্র, আচার-বিচার--সমস্ত কিছুর মধ্যে বাইরে বাইরে একটা শোভা আছে, ভার আছে, পুরনো গন্ধ আছে; নয়ত আর কিছু নেই। বাবাকে এরা যন্ত্রণা দিয়ে, বিশ্বাস-ঘাতকতা করে, প্রতারণা করে, সরল মানুষকে পাঁকের মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়ে ডুবিয়ে মেরেছে। এরা কেউ স্বার্থপর, কেউ অকৃতজ্ঞ, কেউ অর্থপিশাচ, চরিত্রহীন, কেউ বা সাবধানী, সতর্ক, শঠ। মেজকাকার ছেলেমেয়েরা তার ঘরে বড় আসে না, আসে না কারণ কৃপাময় তাদের নষ্ট করে দেবে এই ভয়ে মেজকাকা আর মেজকাকি তটস্থ। মেজকাকির ছেলে সিঁথে কেটে চশমা পরে ভাল ছেলে হয়ে কলেজে পড়তে যায়, মেয়ে পিঠ নুইয়ে মাটির দিকে তাকিয়ে বনেদী কায়দায় স্কুলের বাসে ওঠে। সবাই জানে এই ছেলেমেয়ে মুখুজ্যেবাড়ির মুখ বাঁচাবে। অথচ কৃপাময় জানে, মেজকাকির সোনার টুকরো ছেলে, দিব্যেন্দু, কলেজের বন্ধুদের কাছে চা ডিম খাবার-টাবার খেতে খেতে গল্প করে বলে, তার বাবার পয়সায় এই সংসার চলে, তার বাবা এই সংসারকে পায়ে দাঁড় করিয়েছে, তার বাবার জন্যেই তার জেঠাইমা এখনও বেঁচে আছে, নয়ত মরে যেত। তার জেঠাইমার পাগলামি রোগটার ব্যাখ্যাও নাকি করেছে দিব্যেন্দু, বলেছে : ওটা জেঠামশাইয়ের রোগ, জেঠাইমা পেয়েছে।...এমন খচ্চর খুড়তুতো ভাইকে কৃপাময় অনায়াসেই একদিন জন্মকালের শিক্ষা দিয়ে দিতে পারে; দেয় না—কারণ দিলে এ বাড়িতে আর থাকা যাবে না। মেজকাকির মেয়ে, বীথি চুপ-শয়তান; হাবেভাবে তার সবসময় বড়ঘরের শিক্ষা দীক্ষা উপচে পড়ছে, ভেতরে ওই মেয়ে না জানে

এমন জিনিস নেই। কৃপাময় নিজের চোখে দেখেছে, বীথি ছোটকাকির খোলা দেরাজ থেকে টাকা চুরি করছে, দোলের দিন সিঁড়ির তলায় তার কোন মামাতো ভাইয়ের আদর খাচ্ছে অন্ধকারে।...

আসলে কৃপাময় এ বাড়ির সব নোংরামি জানে, শুধু নোংরামি নয় নিষ্ঠুরতাও। মাকে ওরাই পাগল করেছে। ঠাকুমা, বাবা, কাকারা, পিসিরা। মা'র সবস্ব ওরা শুষে নিয়ে, মা'র শেষ সম্বল স্বামীটিকে গলা পর্যন্ত সংসারের নোংরা মাটিতে পুঁতে দিয়ে দেখিয়েছে মা কত অসহায়। সেই নিঃস্ব, রিক্ত অবস্থায় মা একেবারে উল্টো মুখ হয়ে ধর্মকর্ম শুরু করল। মা'র যতটুকু বা জ্ঞানগমি; ছিল, ঠাকুরের পাল্লায় পড়ে তাও নষ্ট হল। বাবার মতন মাও এদের অন্যায় ও নোংরামির বিরুদ্ধে লড়ল না, তেজ দেখাল না, শাসন করল না, পিঠ নুইয়ে ঠাকুরঘরে ঢুকে গেল। এমন কি মা দেখল না, তার ছেলে এই সংসারে আবর্জনার মতন বেড়ে উঠতে লাগল। বাবাও সেটা দেখেনি; ভাবত—নিজের ছেলের দিকে চোখ দেওয়াটা লজ্জার, স্বার্থপরতাব। মা একেবারেই চোখ ফিরিয়ে নিল, যেন কৃপাময় এ বাড়িতে মা'র অবৈধ সন্তান। ভাগ্যিস দিদির বিয়ে হয়ে গিয়েছিল আগেই, নয়ত দিদি বেচারী মরত। তবু দিদি যতদিন কাছাকাছি ছিল কৃপাময়ের একটা অবলম্বন ছিল, দিদি আর নেই, মারা গেছে।.. বলতে নেই এই অদ্ভুত সংসারে কৃপাময় বাগানের এক পাশে বাড়া জংলা গাছপালার মতনই বেড়ে উঠেছে, তার দিকে নজর দেবার দরকার কেউ বোধ করেনি, করেও না। তবু যে সে বেড়ে উঠেছে এটা সত্য; কেউ অস্বীকার করতে পারে না। বরং এখন এতখানি বাড় দেখে তারা আতঙ্ক বোধ করে, ঘেন্না করে। .এক ছোটকাকিই তার নিজের, যেমন সে ছোটকাকির। ছোটকাকি না থাকলে কৃপাময় কারও কাছে হাত পাততেও পারত না, দুবেলা দুমুঠো খেতে পেত, থাকার জন্যে নীচের তলার এই ঘরটা পেত, আর বছরে দু-পাঁচখানা জামা কাপড়, এক জোড়া জুতো। এসব ওরা দিত। না দিলে বনেদী মুখুজ্যেবাড়ির সম্ভ্রম থাকত না। সম্ভ্রমের জন্যে এরা বাড়ির চাকরবাকর, বছরকার ধোপা-নাপিতকে দুর্গোৎসবে জামা কাপড় দেয় ভাল ভাল, বকশিশ দেয়। কৃপাময়কেও দিত। অন্তত ততদিন, যতদিন মা বেঁচে আছে। মা বেঁচে থাকতে কৃপাময়কে ওরা তাড়াতে পারে না। লোকলজ্জায় আটকাচ্ছে।...আঁরে শালা মা মরে গেলে আমিই কি থাকব এখানে ভেবেছিস? শুধু মা'র জন্যে আছি। আছি মা'র মরার সময় মুখে জল দিয়ে, কাঁধে তুলে হরি বোল বলতে বলতে শ্মশানে নিয়ে যাব বলে। নিয়ে গিয়ে মুখে আগুন দেবার সময় গলা ফাটিয়ে তোদের কেচ্ছা গাইব। সত্যি গাইব। কে আমায় কি বলবে! কেচ্ছা গেয়ে চেঁচাব, বলো হরি হরিবোল; তারপর 'বলো হরি' করতে করতে মাইরি বলছি, শালা ছাই মেখে নাচব। ল্যাংটা হয়ে নাচব। কিসের আমার পরোয়া! কোনো শালাকে কেয়ার করি না।...শালা, হারামী, সব শালা শুয়োরের বাচ্চা।

"কৃপা, এই কৃপা—"

বালিশটা দু-হাতে জড়িয়ে কৃপাময় মুখ ঢেকে ছিল। প্রথমটায় সে শোনেনি, শুনতে পায়নি, পরে শুনল; বিশ্বাস করল না। তারপর বিশ্বাস করল। কিন্তু মুখ তুলতে পারল না।

পিঠে হাত দিয়ে অভয় আবার ডাকল, "এই কৃপা—!"

বুলালি বলল, "কিরে, এই শালা—?"

কৃপাময় বালিশ আঁকড়ে নিল আরও জোরে। সে মুখ তুলবে না।

শেষে বুলালি বালিশ ধরে টান মারল। অভয় বগলের তলায় হাত দিয়ে টেনে উঠে বসাবার চেষ্টা করল।

কৃপাময় কাঁদছিল। দুই বন্ধুর মুখের দিকে ঝাপসা দৃষ্টি, জলভরা চোখ তুলে তাকিয়ে তার ফোঁপানো কান্না আরও প্রবল হল, ছেলেমানুষের মতন কেমন গলাবোজা শব্দ করে কাঁদতে লাগল।

বুলালি কয়েক পলক কৃপাময়ের দিকে তাকিয়ে থেকে কি ভেবে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিতে গেল।

অভয় স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে।

শেষে বুলালি পাশে বসল কৃপাময়ের। পিঠে হাত রাখল। "কি রে, শালা! এত কাঁদছিস কেন? কি হল তোর?"

অভয় কৃপাময়ের গা পিঠ বুক স্পর্শ করে দেখতে দেখতে বলল, "কষ্ট হচ্ছে নাকি রে? কিসের কষ্ট? তেমন হয় তো বল, ডাক্তার ডেকে আনি।"

কৃপাময় কিছু বলল না।

৮

বুলালি আর অভয়কে বসিয়ে রেখে সূর্য সেই যে চলে গেছে, তারপর আর তার পাত্তা পাওয়া যাচ্ছিল না। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে, কখনও বেশ জোরে—স্টেশনের লম্বা লম্বা শেডে প্রবল শব্দ উঠছে, কখনও জোর-দমকটা কমে এলে প্লাটফর্মের মোরমে মৃদু একটা শব্দ থেকে যাচ্ছিল। ডাউন প্লাটফর্মের রিফ্রেশমেণ্টরুমে বুলালিরা বসে ছিল, বসে বসে আরাম করে চা খাচ্ছিল। এখন এই ঘরে ভিড় নেই, টেবিল চেয়ারগুলো প্রায় সবই খালি, জানলার ওদিকে রেলের দুই সাহেববাবু বসে বসে কতকগুলো কাগজপত্র টেবিলে বিছিয়ে নীচু গলায় কথা বলাবলি করছিল। ঘরে বাতি জ্বলছে, মাথার ওপর ঝোলানো বাতি ছাড়াও দু দেওয়ালে দুটো টিউবলাইট নীলচে আভার আলো ছড়াচ্ছিল। জালতির ঠেলা-দরজা, শার্সি দেওয়া জানলা দিয়ে মাঝে মাঝে বৃষ্টির জলো বাতাস আসছে। ঘরের একপাশে কাউণ্টারের গা ঘেঁষে বসে টাকমাথা এক অবাঙালীবাবু আলস্যভরে হিন্দী কাগজ পড়ছিল, তার সামনে কাউণ্টারের ওপর বিল বই, ঘণ্টি, চাঁদার বাক্স; পেছনে দেওয়াল-সেলফে হরেক রকম টুকটাক জিনিস সাজানো। বাঁদিকে বড় বড় দুটো আলমারি, রুটি মাখন বিস্কিটের প্যাকেট সাজানো। ওপাশে কিচেন, কিচেন এবং এই ঘরের দরজার সামনে উর্দিপরা তিনটে বেয়ারা-বাবুর্চি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছিল, বাকিগুলো এখন কোথায় যে বসে আছে কে জানে, ট্রেনের সময় হলেই হুড়মুড় করে এসে পড়বে।

আপাতত কোনো বড় ট্রেন আসছে না, কলকাতার গাড়ি খানিকটা আগে চলে গেছে। শাট্‌ল ট্রেনটা বোধ হয় আর খানিকটা পরেই যাবে। প্লাটফর্ম মোটামুটি ফাঁকা, মাঝে মাঝেই মালগাড়ি যাচ্ছিল, এঞ্জিনের শব্দ, মালগাড়ির চাকার ঘর্ঘর, হুইসল আর ধোঁয়ার একটা গন্ধ বাদলা বাতাসের সঙ্গে মিশে আছে।

বসে থাকতে থাকতে বুলালি বলল, "শালার কারবার দেখেছিস, ঝাড়া এক ঘণ্টা বসিয়ে রাখল।"

অভয় বেশ তারিয়ে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিল; দিয়ে বলল, "কোথাও জমিয়েছে।"

"কোথায় জমাবে?" বুলালি খানিকটা বিরক্ত, "স্টেশনে ওর কোন মালাই-

কলসি আছে রে।"

অভয় কোনো জবাব দিল না। তার মুখ দেখে মনে হল সূর্যর কোথায় কে জমাবার লোক আছে তা জানতে তার তেমন উৎসাহ হচ্ছে না। বরং এই পরিষ্কার ঝকঝকে ঘরে বসে বৃষ্টির মধ্যে ভাল চা খেতে তার মন্দ লাগছে না।

বুলালি বলল, "শালা আজ কোনো মতলব নিয়ে এসেছে। কি বলিস?"

"কে জানে!"

"রাহার কথা বলছিল।"

অভয় জানে সূর্য রাহার কথা বলেছে। যোগেন রাহাকে অভয় চেনে। অভয়দের স্কুলের খুব ডাকসাইটে ছেলে ছিল স্পোর্টসম্যান; পরে বক্সিং শিখেছিল, নামও করেছিল। চার পাঁচবারে স্কুল ডিঙিয়ে রেলের চাকরি পেয়ে গেল, টিকিট চেকারের চাকরি। লাফ ঝাঁপ খেতে পারলে, খেলতে পারলে, ঘুঁষি চালাতে পারলেও চাকরি পাওয়া যায়; যোগেন রাহা ছাড়াও ওরকম দু-চারজনও চাকরি পেয়েছে। তবে যোগেন রাহার চাকরিটাই বেশ আমদানির চাকরি; দিব্যি গাড়িতে ঘুরছে, ডিম মাংস খাচ্ছে আর পাঁচ-দশ টাকা করে পকেটে পুরছে। যোগেনের চেহারা বরাবরই খানিকটা চোয়াড়ের মতন ছিল, হাড়-ওঠা লম্বা মুখ, নাকটা চাপা, মোটা ঠোঁট, মুখ ভর্তি দাগ। মাথায় মোটামুটি লম্বা। পা দুটো বেশ লম্বাই দেখাত। দু-তিন ক্লাস উঁচুতে পড়ত বলে একসময় অভয়রা ওকে দাদা বলত, তারপর ক্লাস নাইনে এক ক্লাসের ব্যবধান থাকল, টেন-এ উঠে আর ব্যবধান থাকল না। তখনও কেউ কেউ যোগেনদা বলত, অভয়রাও বলত। শেষে ডাকাডাকিটা যার মুখে যেমন আসত: যোগেনদা, যোগেন, রাহাদা, রাহা...এইসব। রেলের টিকিট চেকারের চাকরি করতে করতে যোগেন রাহা খানিকটা মাংস লাগিয়েছে গায়ে, মুখের গর্তটর্ত-গুলোও বুজে এসেছে, কালচে প্যান্ট-কোট এঁটে হাতে ছোট একটা এটাচি কেস ঝুলিয়ে যোগেন রাহা যখন ট্রেনের কামরায় ঘুরে বেড়ায় তখন তাকে একেবারে ট্যাঁসের মতন দেখায়, গলায় আজকাল একটা রুপোর ক্রস ঝোলায় রাহা, শালা যেন খেষ্টান। অবশ্য গুজবটা যদি সত্যি হয় তবে যোগেন রাহা এই শহরের ট্যাঁস-পাড়ার ছুঁড়িদের জন্যে খেষ্টান হয়েই গেছে।

বুলালি অপেক্ষায় ছিল অভয় কিছু বলবে। জবাব না পেয়ে বুলালি আবার বলল, "রাহার সঙ্গে সূর্যর কিসের কারবার রে?"

অভয় অনুৎসাহের গলায় জবাব দিল, "কে জানে!"

"মালফালের সাপ্লাই..., না কি রে?"

"রাহা ভাল মাল খায়, শালার চোখ দেখেছিস?"

"অন্য মাল খালাস করে নাকি; তা হলে বল তুলসীপাতা চড়িয়ে আসি।" বুলালি কৌতুহলের সঙ্গে বলল, মুখে সামান্য হাসি।

"লোকো পাড়ার, গার্ড কোয়ার্টারের দু-চারটে টেঁসো ছুঁড়ি আছে," অভয় বলল। তার চায়ের কাপ শেষ হয়ে এসেছিল।

বুলালি যেন টেঁসো দু-চারটে মেয়ের মুখ মনে করবার চেষ্টা করল, বলল, "দুঃ শালা, ও-সব খাটালের কারবারে আমি নেই, মরে যাব।" বলে বুলালি হাসল।

চা খাওয়া শেষ করে অভয় ঘরের দেওয়াল-ঘড়িটার দিকে তাকাল। বাইরে বোধ হয় বৃষ্টিটা আবার কমেছে, ইয়ার্ডের দিক থেকে এঞ্জিনের সিটি এবং স্টেশনে কোনো থেমে-থাকা এঞ্জিনের স্টিম হালকা করার শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল।

"একটা সিগারেট খাওয়া," অভয় সিগারেট চাইল।

বুলালি বুক পকেট থেকে প্যাকেট বের করে অভয়ের দিকে ছঁুড়ে দিল, বলল, "আর বসে থাকতে ভাল লাগছে না। চল্, উঠি।"

অভয় প্যাকেট থেকে সিগারেট নিল, অবশিষ্টটা বুলালির দিকে বাড়িয়ে দিল। সিগারেট ধরানো হয়ে গেলে অভয় বলল, "বৃষ্টি পড়ছে, যাবি কি করে?"

"চলে যাব, হল্ট মারতে মারতে চলে যাব।"

"সূর্য?"

"ও যখন জমাটি মেরে গেছে তখন থাক," বুলালি যেন বিরক্ত হয়েই বলল, "শালার জন্যে সন্ধ্যেটাই মাটি।"

অভয় উঠল না। একমুখ ধোঁয়া টেনে নিয়ে গলা ফুলিয়ে গিলল, মুখ বন্ধ করে থাকল সামান্য, তারপর নাকমুখ দিয়ে অবশিষ্ট ধোঁয়া বার করে দিয়ে ... "আমায় একবার কৃপার কাছে যেতে হবে।"

... কালে যাসনি?...তুই আর সূর্য যে তখন যাচ্ছিলি?"

... য়েছিলাম। একটা মালিশ আছে কৃপাকে দিয়ে আসতে হবে।"

... সের মালিশ?"

... কে পিঠে লাগাবার। কৃপার বুকেপিঠে বেশ সর্দি জমেছে। মালিশটা ... ছিল, বাবার জন্যে এসেছিল, দিয়ে আসব বলেছি।"

"কৃপার আর জ্বরটর হয়নি তো রে?"

"না।"

বুলালি অভয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্কভাবে সিগারেটের ধোঁয়া টানল বার কয়েক। কিছু ভাবছিল। হঠাৎ বলল, "কৃপাটা সেদিন অত কাঁদছিল কেন রে?"

অভয় চুপ করে থাকল।

বুলালি জবাবের অপেক্ষায় তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলল, "বাড়িতে গণ্ডগোল? তোকে কিছু বলেছে?"

অভয় মাথা নাড়ল, না বলেনি।

"তোর কি মনে হয়?" বুলালি শুধলো।

"কিছু তো বলল না। আমার মনে হয়, কৃপার মা'র ওপর ওর কাকারা খারাপ ব্যবহার করেছে কিছু।"

বুলালি প্রথমে, অভয় পরে চায়ের কাপের দিকে তাকাল। তার দৃষ্টি রুক্ষ

হয়ে উঠল। "ক্ষপার মা পাগল, পাগলের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবে কি রে!"

"কে জানে! ওর মাকে আজকাল বাইরে দেখতেই পাই না।"

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ, দুজনের কেউ কথা বলল না। বাইরে শাট্‌ল্‌ ট্রেন আসছে। আবার যেন এক দমকা জোর বৃষ্টি এসে পড়ল, রিফ্রেশমেণ্টরুমের দরজা ঠেলে এক টিকিট কালেক্টারের সঙ্গে এখানকার মেয়ে টিকেট কালেক্টার যেন দৌড়ে এসে ঢুকল। ঢুকে মেয়েটা শাড়ি ঝাড়তে লাগল, কপাল মুখ মুছতে মুছতে হেসে প্রায় গড়াতে গড়াতে একটা টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল। তারপরই অন্য টেবিলে নজর পড়তে হাসি চাপল।

বুলালি এবং অভয় দুজনেই দেখল। মেয়েটা তাদের মুখ-চেনা, টিকিট-বাবুও। মেয়েটাকে তারা এই স্টেশনে আজ বছর দেড় দুই দেখছে, মাদ্রাজী, দেখতে একেবারে গামলার মতন, গোল, বেঢপ। কাঁধ থেকে পা পর্যন্ত একই ধরনের বেড়। ওই মেয়ে আবার ছোটে! দুস্‌ শাল্‌লা।

বুলালি বলল, "ও হাসে কি করে মাইরি, ওপ্‌ন্‌ হয় কি করে?"

"ওপ্‌ন্‌ হবে না! বাঃ!" অভয় হাসি-চোখে রসিকতা করল।

বুলালি আর ও-পাশে তাকাল না; চায়ের কাপে সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিয়ে মস্ত করে হাই তুলল, হাত তুলে আড়মোড় ভাঙল। "শরীরটা বেয়াড়া লাগছে অভয়, বৃষ্টিতে ড্যাম্প মেরে গেলাম।"

অভয় চোখ ছোট করে সিগারেটের শেষটুকু টানতে লাগল। বাইরে শাট্‌ল্‌ ট্রেন এসে গেল এইমাত্র, বৃষ্টির মধ্যে দু বগির ছোট ট্রেনটা হুসহুস করতে করতে এসে থামল, আবার এখুনি চলে যাবে। এ গাড়ির আসা-যাওয়ায়, অন্তত এই সন্ধ্যের দিকে, কোনো সোরগোল থাকে না। তার ওপর গাড়িটা আপ প্ল্যাট-ফর্মের, এই ঘর থেকে কিছু শোনাও যায় না।

বুলালি কেমন ক্লান্ত, অধৈর্যের মতন হয়ে উঠছিল। "আজ পিন্‌কির ওখানে যাওয়ার দিন ছিল, বুঝলি!" বুলালি বলল।

"চলে যা..."

"যেতাম; সূর্যশালা ঝুল মেরে স্টেশনে নিয়ে এল।"

"আমি আসতাম না, তুই এলি বলে..."

"আমি ভেবেছিলাম সূর্যর কোনো কাজ আছে।..."

আজ বৃষ্টির জন্যেই হোক বা সূর্য তাদের বসিয়ে রেখে পালিয়েছে বলেই হোক, বুলালির এই স্টেশনে তেমন ভাল লাগছিল না। অন্য সময় হলে লাগত। ওরা মাঝে মাঝে চার বন্ধুই স্টেশনের দিকে সন্ধ্যেবেলা বেড়াতে আসে, ট্রেনের সময় ওভারব্রিজ বা প্লাটফর্মে বসে থাকে, ঘুরে বেড়ায়, লোকজন, মেয়ে দেখে, চা সিগারেট খায়, খানিকটা সময় কাটিয়ে আবার চলে যায়। আজ বৃষ্টিবাদলার জন্যে স্টেশনটাই কেমন নিরিবিলি, মিয়নো দেখাচ্ছিল।

বুলালি উঠলো, উঠে দরজার কাছে গিয়ে দরজা ঠেলে বাইরেটা দেখল। তারপর আবার ফিরে এল। ফিরে আসার সময় মাদ্রাজী মেয়েটাকে আবার দেখল

"আজ হল কি রে অভয়, বৃষ্টি শালা থামেই না।" বুলালি বিরক্ত।

"আর খানিকটা দেখ।"

"ও খচড়াই বা গেল কোথায়?"

"ধান্দায়..."

বুলালি খানিকটা ছটফট করল, দু হাতে মাথার চুল ঠিক করে নিয়ে কোমর হেলিয়ে দাঁড়াল।

অভয় বলল, "আমার কি মনে হচ্ছে জানিস?"

বুলালি চেয়ারের পিঠে হাত রেখে নুয়ে দাঁড়াল, অভয়ের চোখের দিকে তাকিয়ে।

"রাহা শালাদের একটা জুয়ার আড্ডা আছে, সূর্য সেখানে ভিড়েছে।"

বুলালি কথাটা শুনেছে কিন্তু স্পষ্ট জানত না। বলল, "সে তো গার্ড কোয়ার্টার্সে..."

"দূর...র; গার্ড কোয়ার্টার্সে তো আছেই, আরও আছে।"

"কোথায়?"

"এক্‌জ্যাক্ট জানি না; শুনেছি ট্রেনের মিস্ত্রীদের্‌ জন্যে ওই যে লোকো শেডের দিকে ভাঙা মালগাড়ির ঘব আছে না দু-চারটে, তারই একটাতে বেঞ্চি আর কাঠের বাক্স পেতে বসে শালারা জুয়া খেলে।"

বুলালি যেন কোনো নিষিদ্ধ ও রহস্যজনক স্থানের গন্ধ পাচ্ছে অনেকটা সেইভাবে তাকিয়ে থাকল। "কোন জুয়ো? তে-পাত্তি?"

"আবার কি খেলবে?"

"রাহার সঙ্গে কে কে খেলে?"

"কে জানে! রাহার মতন আছে অনেক। উপরির পয়সা বে, খেলতে কি! আমার থাকলে আমিও খেলতাম।"

বুলালি কি ভেবে নোয়ানো পিঠ সোজা করে দাঁড়াল, তারপর বলল, "সূর্য জুয়ো খেলবে, টাকা পাবে কোথায়."

"বাড়ি থেকে হাতাবে..."

বুলালি যেন কোথাও করবার মতন কিছু না পেয়ে আবার চেয়ারে বসল। অনেকক্ষণ থেকে সামান্য দূরে রেলের যে সাহেববাবুরা কাগজপত্র ছড়িয়ে বসে কথা বলছিল এবার তারা উঠছে। তাদের চেয়ারের পাশে ছাতা, রেনকোট। বুলালি এক মুহূর্ত ওদের দেখল। তারপর অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে মাদ্রাজী মেয়ে আর টিকিট কালেক্টারটাকেও নজর করল। চায়ের পেয়ালায় মুখ দিয়ে গল্প করছে দুজনে।

"অভয়..."

"বল্‌।"

"পাত্তা নে, জুয়ো কোম্পানীকে ফাঁসিয়ে দি।"

"ফাঁসিয়ে দিবি?"

"আলবাত দেব।...একবার ব্যাম্বু খেলে শালারা সিধে হয়ে যাবে।"

অভয় মুচকি হাসল। "তোর বাবাকে বলবি?"

"বাবাকে কেন! সে আছে...। লোক আছে, বলে দেব, তারপর বাবার কানে খবর পেঁৗছে যাবে।"

অভয় খুব বিজ্ঞের মতন মুখ করে বলল, "এই শহরে যত জুয়ার আড্ডা আছে পুলিস জানে, তোর বাবাকে আর বলতে হবে না।"

বুলালি যেন সামান্য দমে গেল; তারপর বলল, "না, বাবা জানে না।"

"জানে।" অভয় জোর দিয়ে বলল।

"দু-পাঁচটা জানতে পারে, সব জানে না," বুলালি প্রতিবাদ করল। যে যেন নিজেরই অজ্ঞাতে তার বাবার হয়ে কথা বলল।

অভয় থামল না। বলল, "তুই জানিস না।"

বুলালি চটে উঠল। "আমি জানি না, তুই জানিস শালা?"

অভয় দাঁত খুলে হাসল, "জানি। আমি তোকে পাঁচ-সাতটা জুয়ার আড্ডা বলতে পারি, পুলিসের সঙ্গে খাতির আছে।"

বুলালি ব্যঙ্গ করে বলল, "যা বে যা, তুই শালা সবজান্তা। আমার ইয়ে জানিস তুই!" বুলালি একটা খারাপ কথা বলল।

অভয় আহত হল, অপমান বোধ করল। তার কালো মুখে কেমন একটা রুক্ষতা এবং চোখে ঘৃণা ফুটল। ইচ্ছে হল বলে: হ্যাঁ, আমি জানি। তোর বাপ সাধুপুরুষ নয়। শালা যুধিষ্ঠিরের বাচ্চা আমার!

ছাতা এবং ওয়াটার প্রুফ নিয়ে রেলের সাহেব দুজন চলে গেল। অভয় দেখল। সে আর কথা বলছিল না।

বুলালিরও মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে। অভয়ের মুখের দিকে বার কয়েক তাকিয়ে সে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল।

দুজনেই চুপচাপ; হঠাৎ দুই বন্ধুর মধ্যে কোথাও একটা অস্বস্তিকর বিচ্ছেদ নেমেছে যেন। পরস্পর পরস্পরকে যে ঠিক কি কারণে অপছন্দ করছে তাও স্পষ্ট বুঝছে না।

খানিকটা সময় কেটে গেল। বুলালি হঠাৎ উঠে দাঁড়াল, দাঁড়িয়ে কাউণ্টারের দিকে চলে গেল। তারপর পয়সা দিয়ে ফিরে এসে বলল, "চল।"

অভয় উঠল।

আসবার সময় বুলালি দেখল, মস্দা টিকিট কালেক্টারটা হাতের একটা মুঠো মাদ্রাজী মেয়েটার দিকে এগিয়ে দিচ্ছে। দু-চারটে টাকা নিশ্চয়। ভাগ বাটরার টাকা।

স্টেশনের একেবারে বাইরে গাড়ির স্ট্যাণ্ডের কাছে গুপ্ত কোম্পানীর ছোট

দোকান। স্টলের মতন অনেকটা, বিস্কুট রুটি টফি চায়ের প্যাকেট সিগারেট নস্যি টুকটাক এইসব জিনিস থাকে দোকানে, স্টেশনের লাগোয়া বলে বেচাকেনা ভালই হয়। গুপ্ত কম্পানীর দোকানের সামনে সাইকেল রাখা ছিল বুলিদের, বরাবরই থাকে, চেনা-জানা লোক গুপ্তদা। তিনটে সাইকেলই গায়ে গায়ে লাগানো, আড়াল করে রাখা সত্ত্বেও বৃষ্টিতে ভিজেছে।

সাইকেল নিতে নিতে চেঁচিয়ে বুলালি বলল, "গুপ্তদা, সূর্য এলে বলবেন আমরা চলে গেছি।"

গুপ্তবাবু বিড়িমুখে খাতাপত্র নিয়ে হিসেব করছিলেন; মুখ তুলে দেখলেন বুলালিদের। "আচ্ছা।"

সাইকেল নিয়ে বুলালি সরে যাবার পর অভয় সূর্যর সাইকেল সরিয়ে নিজেরটা বের করে নিল। নিয়ে সামনের দিকে দু-চার পা এগুতেই বুঝল তার সাইকেলের পেছনের চাকার হাওয়া নেই। নীচু হয়ে ঝুঁকে সাইকেলটাকে আরও দু-পা সামনে এগিয়ে নিল, তারপর ঝাপসা অন্ধকারে চুপসে-যাওয়া চাকাটা দেখল।

বুলালি ততক্ষণে সাইকেলে উঠে পড়েছে। পেছনে তাকাল। খানিকটা তফাত থেকে সে ঠিক বুঝতে পারল না, অভয় সাইকেল নিয়ে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে কেন।

"কি হল?" বুলালি ডাকল।

অভয় কোনো জবাব দিল না। নিজের সাইকেলটাকে সে তখনও বিরক্ত ভাবে দেখছে।

একটা ছোট মতন প্যাক মেরে বুলালি ফিরে এল। খুব পাতলা গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে তখনও, গাড়ির স্ট্যান্ডে এক ডজন রিকশা, ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে গোটা দুয়েক ট্যাক্সি। ভূতের মতন গোটা দুই বাসও একপাশে দাঁড়িয়ে, আলোটালো জ্বলছে না। ওপাশে থার্ড ক্লাসের ওয়েটিং রুমে কিছু লোকজন।

বুলালি কাছে এসে পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল। "কি হয়েছে রে?"

অভয় বিরক্তির গলায় জবাব দিল, "পেছনের চাকা বসে গেছে।"

"পাঙ্চার?"

"সেদিন লিক্ সেরেছিলাম, আবার শালা গেছে।"

বুলালি অভয়কে দেখল। "কি করবি?"

"কি আর, ঠেলে নিয়ে যাব।" অভয় তিক্ত গলায় বলল, "তুই চলে যা।"

রাস্তায় পা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে বুলালি একটু যেন ভাবল। বলল, "আমার সাইকেলে আয়, তোরটা টেনে নিয়ে চ'।"

অভয় আপত্তি জানাল। "তুই যা, আমি হেঁটে যাচ্ছি।"

বুলালি অভয়ের গলার স্বরে যেন মজা পেল। "আরে শাল্‌লা, কী রোয়াব!...নে রে বাপোত, গ্যাস খুলে দে। শালার মান হয়েছে।...চলে আয়।"

"তুই যা।"

"অভয়, খচড়ামি করিস না।...ঝুট ঝামেলা করলে কালীর দিব্যি তোকে আমি আজ ঝাড়ব।" বুলালি যেন শাসনের ভঙ্গিতে বলল।

অভয় হঠাৎ কেমন হয়ে গেল। তার কোথাও যেন কিসের একটা অপমান-বোধ, দীনতা, আক্রোশ জমা আছে অনেকদিন, মাঝে মাঝে সেটা তাকে বোধহীন করে তোলে। আজ হঠাৎ কেন যেন অভয় তার আক্রোশের কুৎসিত এক জ্বালায় জ্বলে উঠল। বলল, "আয়, ঝাড়বি আয়।"

বুলালি প্রথমটায় বুঝতে পারেনি, পরে বুঝল। বুঝে তার মজা লাগল। সাইকেল থেকে নামল না বুলালি। "আবার রোয়াব নিচ্ছিস?. এক লাথিতে তোর কোমর ভেঙে দেব শালা।"

অভয় জবাব দিল না।

বুলালি এবার সাইকেল থেকে নামল। নেমে সাইকেল সমেত এগিয়ে আসছিল। অভয় তৈরী, নিজের সাইকেলটা সে হাত থেকে ফেলে দিল; মাটিতে পড়ার জোর শব্দ হল।

থমকে দাঁড়িয়ে মাটিতে পড়া সাইকেলটা দেখল বুলালি। তারপর অভয়ের দিকে তাকাল। গুপ্ত ব্রাদার্সের দোকানের সামান্য আলোয় অভয়ের মুখের খানিকটা দেখা যাচ্ছিল। বুলালি অভয়ের মুখ চোখ হাত নজর করল। সাইকেল সমেতই আস্তে আস্তে কাছে—একেবারে মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। তারপর হঠাৎ, যেন অভয়কে আরও খেপিয়ে দেওয়ার জন্যে সাইকেলের ঘণ্টি মারল। "আরে ব্বাস! তুই একেবারে পজিসন মেরে দাঁড়িয়ে পড়েছিস বে। আমায় ঝাড়বি? নে তবে ঝাড় " বলে বুলালি সাইকেল ঠেলে একেবারে অভয়ের মুখের গন্ধের নাগালে এল।

অভয় নড়ল না। তার হাত শক্ত, মুঠো প্রায় তৈরী। বুলালির হাত জোড়া, সাইকেল ধরে আছে, আচমকা সে মারতে পারবে না মনে মনে অভয় বিপরীত পক্ষের আক্রমণের সুযোগ সুবিধে হিসেব করে নিল।

বুলালি একেবারে হিসেবের বাইরে একটা কাজ করল; উটের মতন গলা বাড়িয়ে অভয়ের গালের পাশে নাক বরাবর শব্দ ক'রে একটা চুমু খেল। তারপর হেসে বলল, "শালার মান হয়েছে, লে রে কিস্ দিয়ে দিলুম, মান-ফান মুছে ফেল। চল্..."

অভয় অনেকটা হতভম্বের মতন দাঁড়িয়ে থাকল, বোকার মতন; কিছু বলতে পারল না, করতে পারল না। বুলালিকে মারার জন্য তার হাতের শক্ত মুঠো কিছুক্ষণ শক্তই থাকল, তারপর আলগা হয়ে গেল।

বুলালি হেসে বলল, "কি রে, হল! আরও কিস্ চাই? বলিস তো তোর..."

অভয় তার আলগা হাতের তালুতে নাক গাল মুছে নিল।

বুলালির সাইকেলের পেছনে বসে ডান হাত বাড়িয়ে নিজের সাইকেলটা

টেনে নিয়ে যাচ্ছিল অভয়। আস্তেই যাচ্ছে বুলালি, ভেজা রাস্তা, গাড়িটাড়ি যাচ্ছে আসছে, রাস্তার জায়গায় জায়গায় অন্ধকার, সামলেসুমলে চলছিল বুলালি।

যেতে যেতে একসময় বুলালি বলল, "তোর ওই সাইকেলটাকে এবার লটারীতে তুলে দে অভয়। দু পয়সা টিকিট কর। যা পাস তাই লাভ।"

অভয় জবাব দিল না কথার। বুলালি না বললেও সাইকেলটার ওপরই এখন তার যত রাগ পুঞ্জীভূত হচ্ছিল। এই সাইকেলটার কিছু নেই, একটা ফ্রেম আর দুটো চাকা। কতকালের সাইকেল যে কে জানে! তিরিশ টাকায় কবে যেন কেউ বাবাকে বেচে দিয়েছিল। বাবা কমই সাইকেল চড়েছে, তারপর অভয় চড়ত। তাপ্পিটাপ্পি মেরে আজ আট দশ বছর অভয় সাইকেলটাকে খাড়া রাখার চেষ্টা করেছে। এখন আর চালানো যায় না। যাও বা চলতে পারে তাও টায়ার টিউবের জন্যে চলে না। কবেকার পুরনো টায়ার টিউব, টায়ারের বত্রিশ জায়গায় সেলাই আর কাটা চামড়ার তাপ্পি, একটু লাগল কি ব্যাস টিউবটা ফেঁসে গেল। ফাঁসতে ফাঁসতে আর লিক মেরামত করার রবারের টুকরোতে টিউবটা হরিনামের মালার মতন হয়ে গেছে। মা'র কাছে সাইকেলের জন্যে টাকা চাইলে মা চেঁচিয়ে গালাগাল দেয়: 'মেয়েদের পাছার কাপড় জোটাতে মরছি তোমার পাছার দু চক্করের জন্যে টাকা দেব! লজ্জাও করে না তোর বলতে। যা না—ওই জঞ্জালটা আঁস্তাকুড়ে ফেলে দিয়ে আয়। লোহার দোকানে বেচে আসতে পারিস না।..মুরোদ থাকে তো রোজগার করে দু চক্কর কিনগে যা, সারাগে যা! আর মুরোদ না থাকে তো পায়ে হাঁটগে যা। জোর নেই তোর পায়ে? খোঁড়া নাকি?'

অভয় জানে তার সাইকেলের মেরামতি তার দ্বারা সম্ভব না। কয়েকটা টাকা হলে কোনোরকমে কাজ চালিয়ে নেওয়া যেত, অথচ মা'র কাছে সে-টাকা পাওয়া যাবে না। বন্ধুদের সাইকেলের পেছনে পেছনে বসে তার আর কত কাল চলবে? ভালও লাগে না, সূর্যরা হামেশাই ঠাট্টা তামাশা করে, কোন রকমে তাপ্পি মেরে সাইকেলটা বের করলে সূর্য বলে: 'কি রে অভয়, গ্যারেজ থেকে তোর হিলম্যান বের করলি নাকি?'

মা যেমন কখনো সাইকেল বলে না, বলে 'দু চক্কর', মানে দু চাকাঅলা সাইকেল, তেমনি সূর্যরা মাঝে মাঝেই ঠাট্টা করে তার সাইকেলকে বলে 'হিলম্যান'; অর্থাৎ তার সাইকেল চড়ার জন্যে যেন নয়, পায়ের গোড়ালি ঘষে ঘষে টেনে নিয়ে যাবার, আর অভয় হল পা কিংবা গোড়ালিঘষা লোক।

মাঝে মাঝে অভয়ের কেন যেন মনে হয়, সূর্য বা বুলালি তার অন্তরঙ্গ বন্ধু হলেও তারা অভয়ের সমগোত্রীয় নয়। ওরা পয়সাঅলা লোকের ছেলে, চেহারায় পোশাকে এই ছাপটা চোখে তো পড়েই, তাছাড়া অজান্তেই অনেক সময় ওরা ওদের বাপের মর্যাদা আর টাকার গরম দেখিয়ে ফেলে। অভয়ের বাবার কোনো মর্যাদা নেই, গরম নেই। ঠিক এই জন্যে কিংবা অন্য কোনো জটিল

কারণে অভয় অনেক সময় দীনতা বোধ করে, আক্রোশ অনুভব করে। কি আছে ওদের যার জন্যে অভয় ছোট থাকবে? ছাপোষা সংসারে জন্মানোর জন্যে অভয়ের আফসোস ও রাগ হয় কখনও কখনও। কেন তাকে সূর্য বুলালির পয়সায় চা সিগারেট মাল খাওয়ার মুখাপেক্ষী থাকতে হবে, তাদের মেজাজ বুঝে কথা বলতে হবে। কেন? কেন অভয় ওদের এই মেজাজ পাত্তা দেবে? সূর্যর বাবা কী চীজ অভয় জানে না? না কি বুলালির দারোগা বাপকে সে চেনে না?

অথচ অভয় জানে, মনে মনে এই চাপা রাগ যতই থাক, সে সূর্য এবং বুলালিকে ভালবাসে, কৃপাময়কে ভালবাসে। ওরাও তাকে ভালবাসে। তবু এ-রকম যে কেন হয় অভয় বোঝে না। সূর্য আর বুলালির চেয়ে কৃপাময়কে তার আরও বেশি নিজের বলে মনে হয়। দুঃখের সময় কৃপাময় তার যত আপন, সূর্যরা তত নয়, আবার এও সত্যি, সূর্য বা বুলালির অভাব তার পক্ষে অসহ্য। না, চা সিগারেট বা মালের জন্যে নয়, মমতার জন্যে, বন্ধুত্বের জন্যে।

এই মমতা তার একার নয়, ওদেরও। নয়ত আজ বুলালি তাকে মারতে পারত, হয়ত সেও পারত। শেষ পর্যন্ত কেউ মারামারি করতে পারল না।

অভয়ের খেয়াল ছিল না, তার সাইকেল আচমকা একটা রিকশার গায়ে লেগে হাত ছিটকে বেরিয়ে রাস্তার পাশে বাঁধানো নালার পাশে পড়ল। আর একটু হলেই অভয়দের লাগত। বেঁচে গেছে।

বুলালি ব্রেক মারল। "কি রে?...আন্ধার মতন যাচ্ছিস নাকি?"

অভয় পেছনের সিট থেকে নেমে পড়েছে। বুলালি পায়ের বুড়ো আঙুল ছুঁয়ে রাস্তার মাঝমাধ্যিখানে দাঁড়িয়ে।

ভিজে, প্যাচপেচে রাস্তার পাশ থেকে অভয় তার সাইকেলটা কুড়িয়ে নিচ্ছিল। না নিয়ে উপায় নেই। হাড়গোড় ভেঙে যাওয়া মানুষের মতন সাইকেলটা অভয়ের শক্ত মুঠোয় উঠে এল।

৯

কয়েকদিন বৃষ্টিটা ধরে ছিল, তারপর আবার শুরু হল। ভরা ভাদ্রর বৃষ্টি। আকাশ মেঘে মেঘে ফুলে ফেঁপে এমন দেখাচ্ছিল যেন মাথার ওপরটা নদী হয়ে আছে, আর চার পাশ ভাসিয়ে মেঘ বয়ে যাচ্ছে। থমথমে কালো মেঘ কখনও, কখনও ঘন ধোঁয়ার মতন পুঞ্জপুঞ্জ মেঘ, কখনও বা জলসাদা মেঘ। বৃষ্টি হচ্ছে, থামছে, আবার হচ্ছে। এই যদি নামল তো সারাবেলা একটানা চলল। জলে জলে শহরটা স্যাঁতসেঁতে, পানসে। রাত্রে গুঁড়ি-বৃষ্টির ছিটেয় পথঘাট দোকান পসার ম্রিয়মাণ, আলোয় অবেলার ভাব। ময়লা, ধোঁয়া, কাদা, দুর্গন্ধ, মাছি, আর ঘিনঘিনে বৃষ্টি, জলে ভেজা কাকের কর্কশ ডাক, রাত্রে ব্যাঙের স্বর। শুনে শুনে নয়নারা যখন আর পারছে না, মনে হচ্ছে এবার তাদের মাঠকোঠা বাড়িটা, এই পুরো পাড়াটাই, আবর্জনা হয়ে গেছে—তখন বৃষ্টি থামল।

আকাশে সেদিনও প্রথম মুক্ত রোদ ফুটল। সকালে, সূর্যর গোল চেহারাটা স্পষ্ট করে চোখে পড়ল।

ঘুম ভেঙে প্রথমেই রোদ দেখেছিল নয়না। টিনের ভেজানো জানলার ফাঁক দিয়ে আলো চোখে পড়তেই নয়না মশারি সরিয়ে নেমে এসে জানালাটা খুলে দিল। এক চিলতে জানলা, কিন্তু দুটো পাট খুলে ধরতেই পুবের রোদ বাতাসে ওড়া শুকনো কাপড়ের মতন মুখে এসে পড়ল; প্রায় যেন চোখ বুজে ফেলেছিল নয়না, অত রোদ চোখে সয়নি। তারপর চোখ মেলে তাকাতে রোদের আবির্ভাবটা দেখল। পুবের সবটাই সকালের রোদে কাচের মতন চকচক করছে; মেঠো জমিতে বর্ষার জলে ভেজা ঘাসে রোদ নেমেছে, গাছের পাতায় রোদ, পেছনের পুকুরের কচুরি পানায় রোদ পড়ে সবুজ আভা উঠেছে।

নয়না জানলা থেকে সরে এল, যেন বাইরের রোদকে ঘরে আসতে দিল তাড়াতাড়ি। তারপর মাথার দিকের জানলা খুলে দিতে দিতে ডাকল, "যমুনা, এই যমুনা, ওঠ।"

নয়নাদের ঘরে জগদ্ধাত্রীর পট আছে, জগদ্ধাত্রী আর দুর্গার। বাসীমুখে অন্যদিন পট প্রণাম করার সময় নয়নার চোখের সামনে মেঘলা দিনের একটু আলো বা বৃষ্টির ময়লা, সাদাটে রঙটা চোখে লেগে থাকে, জগদ্ধাত্রী বা দুর্গার মুখ দেখা যায় না। আজ নয়না পট প্রণাম করার সময় মুখ দেখল জগদ্ধাত্রীর; রোদের জন্যে ভাল লাগল, নতুন লাগল।

"ও রত্না, রত্না, রতন—" নয়না এবার বিছানার কাছে এসে দাঁড়াল। "কই রে, ওঠ। উঠে পড়।"

ঘরের মধ্যে নিচু নিচু দুটো তক্তপোশ, একটা সরু, অন্যটা সামান্য চওড়া। যমুনা একলা সরু তক্তপোশটায় শোয়; আর বড়টায় তারা দু বোন—নয়না আর রত্না।

নয়নার হঠাৎ আজ আদর করে যমুনাকে পুরনো আদুরে নাম ধরে ডাকতে ইচ্ছে করল। মশারিটা সরসর করে টেনে তুলে বোনের গায়ে হাত দিয়ে ডাকল, "যমনি, এই যমনি, ওঠ। উঠে দেখ কেমন রোদ উঠেছে আজ।"

যমুনা চোখ খুলল অল্প। খুলে শুয়ে থাকল, যেন এখনও ঘুম থেকে জাগরণে আসতে পারছে না।

"কি রে, ওঠ—" নয়না গা ধরে নাড়া দিল যমুনার।

ঘুম ভেঙে গিয়েছিল যমুনার, জড়ানো গলায় বলল, "উঠি।"

"উঠি উঠি করে বিছানায় গড়াস না, উঠে পড়।" বলে বিছানার পাশ থেকে সরে আসতেই চোখে পড়ল, তার বিছানায় মশারির মধ্যে রত্না উঠে বসে হাই তুলে আড়মোড়া ভাঙছে।

আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতেই ঘরে রোদ দেখে রত্না বলল, "রোদ উঠেছে, বড়দি?"

"হ্যাঁ; আমি নীচে যাচ্ছি। তুই বিছানাপত্র তুলে ঘর পরিষ্কার করে আসিস।" নয়না দরজা খুলে চলে গেল।

বাইরে আসতেই চারপাশের টাটকা ধোয়ামোছা রোদে নয়নার চোখ যেন জুড়িয়ে গেল। সামনের তালগাছের মাথার ওপর দুটো পায়রা উড়ছে, ফুল-কাঁটার ঝোপে শালিক চড়ুই ফরফর করে উড়ছে আর চিকচিক কলরব করছে, কাক ডাকছিল।

পাশের ঘরে গণনাথ থাকে। গণনাথের ঘরের দরজা বন্ধ। নয়নার ইচ্ছে হল গণনাথকেও ডাকে। অথচ কি মনে করে ডাকল না। কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেল।

এই বাড়িটা মাঠকোঠা। দোতলা। নীচের তলাটা ইঁট দিয়ে গাঁথা, ওপরের সবটাই টিন: টিনের দেওয়াল, টিনের ছাদ, ছাদের তলায় চেটাইয়ের সিলিং। নীচের তলায় ইঁটের গাঁথুনি ভাল নয়, কোনোরকমে সাজানো যেন, পাতলা একটু প্লাস্টার আর দু-এক পোচ চুন আছে ভেতর-দেওয়ালে, পাকা মেঝে হলেও এবড়ো-খেবড়ো ফাটাফুটো। তবু এই বাড়িটা ভাল। ভাল এই জন্যে যে, আর কোনো গৃহস্থ ভাড়াটে এখানে থাকে না। ওপরের একটা টিনের ঘরে পাল-মশাইদের দোকানের কিছু জিনিসপত্র তালাবন্ধ হয়ে পড়ে থাকে; আর নীচের তলার বাইরের দিকে দুটো ছোট ছোট ঘরে ছাপা শাড়ির কারখানা। ওই ঘর দুটো এমন যে, তার সঙ্গে ভেতর বাড়ির তেমন একটা সম্পর্ক নেই, সদর দিয়ে নয়নাদের আসা-যাওয়া করতে হয়। বাড়িটা পাল-মশাইয়ের দোকানের এক বুড়ো

কর্মচারীর, বিশ্বাসবাবুরে। বিশ্বাসবাবু নিজের মালিকের দোকানের কিছু জিনিস, খাতাপত্র ওপরের ঘরে তালাবন্ধ করে রেখে দিয়েছে, আর নীচেটা যে ছাপাঅলাদের ভাড়া দিয়েছে তারাও পাল-কোম্পানীতেই ছাপা শাড়ি দেয় খোয়। আলাদাভাবেও কাজ করে।

নীচের একখানা ছোটঘরও নয়নাদের। সেটাই তাদের ভাঁড়ার, খাবারদাবার টুকটাক অন্য সব কাজের। দাওয়ার দিকে রান্নাঘরের মতন আছে একটু, ওপাশে কুয়া, কলঘর। কলঘরের মাথায় একটা টিন চাপানো হয়েছে ইদানীং। কাঁচা দাওয়ার একপাশে একটা পেঁপেগাছ, নীচে কিছু দোপাটি ফুলের চারা, বেল-ফুলের গাছ একটা, আর ওরই একদিকে নয়নার শখের একটা টগর।

উনুনে আঁচ দিয়ে নয়না কুয়োতলার দিকে চলে গেল। মুখটুখ ধুয়ে কাপড় ভিজিয়ে নীচের ঘরে এসে বাসী কাপড় ছাড়ল। বাদলায় বাদলায় নীচের ঘরটা স্যাঁতসেঁতে হয়ে গন্ধে ভরে গিয়েছিল, অজস্র পিঁপড়ে আর আরশোলা হয়েছিল। চাল-আটার টিন, ডালমশলা, তেলের তক্তা, মিটশেফ আর রাখা যাচ্ছিল না। আজ দরজা জানলা হাট করে খুলে দিতে রোদ এল খানিকটা। নয়না মনে মনে ভেবে নিল, সেখানে যা আছে সব রোদে দিতে হবে। রত্নাকে রোদে দিতে বলে যাবে; তারপর সেলাই-স্কুল থেকে ফিরে এসে নয়না নিজের হাতে গুছিয়ে তুলবে সব। আজ শনিবার। একটায় তার সেলাই-স্কুল।

দাওয়ায় ভেজা শাড়ি জামা মেলে রান্নাঘরে উঁকি দিল নয়না; উনুন প্রায় ধরে এসেছে। আবার এ-ঘরে এল, আসার সময় দেখল যমুনা সিঁড়ি দিয়ে নামছে। ঘরে এসে চায়ের কেটলিটা নিচ্ছে, জানলার ওপার দিয়ে একটা পাখি ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল। ডাকটা চেনা, অনেকদিন কানে আসেনি। দোয়েল না শ্যামা? দোয়েল বোধ হয়।

যমুনা ঘরে এসে দেখল, দিদি চায়ের কেটলি হাতে জানলার সামনে দাঁড়িয়ে কি যেন দেখার চেষ্টা করছে।

একপাশ থেকে দাঁতের মাজন তুলে নিয়ে হাতের তালুতে ঢালতে ঢালতে যমুনা বলল, "কি দেখছ?"

নয়না ঘাড় ফেরাল। তার বলার ইচ্ছে হল, দোয়েলটাকে খুঁজছিলাম, উড়ে গেছে। কিন্তু নয়না তা বলল না। তার এই বয়সে সকালবেলায় দোয়েল পাখি দেখার এত সাধ শুনলে যমুনা হয়ত হাসবে। নয়না বলল, "কিছু না, এমনিই দেখছিলাম। আজকের রোদটা বেশ। কতদিন পরে একটু রোদের মুখ দেখলাম।"

নয়না ঘরের বাইরে এল, পেছনে পেছনে যমুনা। চায়ের জল ভরে আনতে গেল নয়না। ফিরে এসে দেখল যমুনা আকাশ, পেঁপে-গাছ, দোপাটি ফুলের চারা দেখছে অলস চোখে, দেখতে দেখতে দাঁত মাজছে আঙুলে। যমুনার চোখ-মুখে প্রসন্নতা। এই প্রসন্নতা আজকাল যমুনার প্রায়ই থাকে। কেন থাকে, নয়না খানিকটা বোঝে।

"আজকের রোদ দেখে শরৎকাল বলে মনে হচ্ছে, না রে?"

"হ্যাঁ।"

"আকাশটাও পরিষ্কার, নীল নীল।"

"শরৎকাল তো পড়েই গেছে। ভাদ্রমাস শেষ হতে চলল।"

নয়না যেন মাস তারিখের হিসেবটা দেখল মনে মনে। পরে বলল, "আমি চায়ের জল চড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছি। তুই চা করে আনিস।"

নয়না রান্নাঘরে চলে গেল।

ওপরে এসে নয়না দেখল গণনাথের ঘরের দরজা খোলা। তাহলে জেগেছে। ঘরের সামনে দিয়ে দেড়হাতি টানা বারান্দা, কাঠের রেলিং, লোহার শিক গাঁথা। বারান্দা থেকেই গণনাথের ঘরের মধ্যে মুখ বাড়িয়ে নয়না বলল, "ঘুম ভাঙল?"

গণনাথ একটা খয়েরী রঙের লুঙ্গি পরে বাসী মুখে বসে বিড়ি টানছিল। তার বিছানা একটা ক্যাম্পখাটের ওপর। ছোট বিছানা। গণনাথ বলল, "ভেঙেছে।... তোমার কি চানটানও হয়ে গেল নাকি, বড়দি?"

এই 'বড়দি' সম্বোধনটা ঠাট্টার; গণনাথ মাঝে মাঝে পরিহাস করে 'বড়দি' বলে। আজ এত সকালে ঠাট্টার কারণ নয়না বুঝল না। বলল, "না, এখন চান কিসের? ঠাট্টা হচ্ছে?"

গণনাথ হেসে বলল, "সকাল থেকেই আজ যেরকম হুড়োহুড়ি করছ, ভাবছি কোথাও বোধহয় যাবে।"

"সকাল থেকে হুড়োহুড়ি আবার কি করলাম গো?"

"করেছ। শুয়ে শুয়ে টের পেয়েছি।"

"মিচকে মেরে ঘুমোচ্ছিলে বুঝি?.. দরজা নিজেই খুলেছ, না যমুনা ডেকে দিয়েছে!"

গণনাথ হাসছিল।

চৌকাটে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল নয়না, ভেতরে ঢোকেনি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গণনাথের ঘরের মধ্যে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। এখনও এঘরে রোদ আসেনি, রাঙা ভাবটা আলো হয়ে এসেছে, সামান্য পরেই রোদ ঢুকবে ঘরে। নয়না বেশ বুঝতে পারল, যমুনাই কিছু বলে গেছে গণনাথকে। হয়ত বলেছে, সকালে রোদ উঠেছে দেখে দিদি বাড়ি জাগিয়ে বেড়াচ্ছে; উঠে পড়।

নয়না বলল, "তা নাও, মুখটুখ ধুয়ে এস, চায়ের জল হয়ে এল প্রায়।"

নয়না চলে আসছিল, গণনাথ বলল, "আজ আমি বাইরে যাব একবার।"

"বাইরে?"

"সাড়ে ন'টার গাড়িতে যাব। ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যে হবে।"

"কোথায় যাবে?"

গণনাথ নির্দিষ্ট কোনো জায়গার নাম বলল না। যা বলল তাতে মনে হল, তার এজেন্সির মালপত্র নিয়ে বাইরে নানা জায়গায় ঘুরতে যাবে।

নয়না বলল, "স্নান খাওয়া-দাওয়া করেই বেরিয়ো একেবারে।"

গণনাথ মস্ত একটা হাই তুলে বিছানা থেকে উঠল।

ঘরে এসে নয়না দেখল, বাসী বিছানাপত্র সব তুলে ঝেড়েঝুড়ে রেখে দিয়েছে রত্না। ঘরটাও ঝাঁট দিয়ে ফেলেছে; দরজার কাছে উবু হয়ে বসে জড়ো করা ময়লাগুলো কুড়িয়ে নিচ্ছে।

এ-ঘরে দুটো চৌকি থাকায় হাঁটা-চলার জায়গা প্রায় নেই। তার ওপর বাক্সটাক্স, পোঁটলাপুঁটলি, একটা সেলাই-মেশিন, আলনা, খুঁটোয় বাঁধা দড়িতে ঝুলন্ত শাড়ি জামায় এবং আরও পাঁচ রকম টুকটাকে ঘর জুড়ে গেছে। নয়না গুটোনো বিছানার ওপর রোদ পড়তে দেখল। ময়লা শতরঞ্জির ওপর রোদ জলের মতন আস্তে আস্তে চারপাশে গড়িয়ে যাবে।

রত্নার কাজ শেষ হয়েছে দেখে নয়না বলল, "ও ঘরটাও একেবারে পরিষ্কার করে দিয়ে যাস।"

না বললেও রত্না ও-ঘর পরিষ্কার করে তবে নীচে নামত, বার বার ঝেঁটা ধরার চেয়ে একবারেই কাজ সেরে ফেলা ভাল।

রত্না চলে গেলে নয়না আরও একবার জগদ্ধাত্রী দুর্গার পট দেখল, দেখে একপাশে ঝুলোনো বাংলা ক্যালেণ্ডারটার তারিখ দেখল। তারপর বিছানায় এসে বসল। হাতে তার অজস্র সময় নেই। দেখতে দেখতে বেলা বাড়বে। রান্নাবান্না আছে: গণনাথ যাবে ন'টা নাগাদ, তার ভাত চাই, যমুনা কাজে যেতে শুরু করেছে, তারও অফিসের ভাত; নিজের সেলাই স্কুল। সামনে পুজো, কিছু কিছু সেলাইয়ের কাজ দিয়েছে চেনাজানা মেয়েরা, প্রতি বছরই দেয়, সেই সব কাজ জমছে। পুজোর মুখে আরও জমবে। সেলাই, ছাঁটকাটে বড় খ্যাতি নয়নার; বরাবর। মেয়েদের জামা আর বাচ্চা মেয়েদের ফ্রকটক তার হাতের কাটা হলে কোথাও খুঁত থাকে না। তার ফলে পেশাদারী না হয়েও দর্জিগিরি নয়নার পেশা। সারা বছরই। তবে অন্য সময় অবসর মতন করা যায়; এখন আর ফেলে রাখার সময় নেই।

কোন কালে বাবা অথর্ব পঙ্গু হয়ে পড়েছিল। তার ওপর কুষ্ঠ। খুব হিসেবী বলে পয়সাকড়ি যা রেখেছিল তাই দিয়েই প্রথমটায় চলেছে। মা ছিল না সংসারে; নয়নাই সব। ক্রমেই কলসির জল ফুরিয়ে আসতে লাগল, অভাব অনটন বাড়তে থাকল সংসারে. নয়না মেয়ে স্কুলের সেলাই-দিদির চাকরি নিল। চাকরি আর সংসার। বিয়ে-থার কথা বড় ওঠেনি; যেটুকু উঠেছে সেটুকু ঠাট্টা পরিহাস করে হয়ত, বা উপহাস করে। বাবা মারা যাবার পর এ প্রসঙ্গটা পাড়ার লোকেও আর তুলত না। সেলাইদিদির সামান্য আয়ে তিনজনের সংসার কি চলে! তবু চালিয়ে বা টেনেটুনে যতটা পেরেছে নিয়ে গেছে নয়না। সেই দুঃসময়ে যে কিভাবে জল গড়িয়েছে ভাবলে ভয় করে! সে কী কাদাটে নোংরা জল, বাড়ি ভাড়া জোটেনি, দুবেলা দুমুঠো ডালভাত জোটাতে পারেনি নয়না, দু বোনে ভাগাভাগি করে একই শাড়ি সায়া পরেছে, একই চটিতে দু বছর চালিয়েছে। মান সম্মান তো ছিলই না, উপরন্তু নানান নোংরামির মধ্যে নিজেরাও যেন নিজেদের অপমান করত, খামচাখামচি করত। যে-নয়না মায়ের মতন করে ছোট দু

বোনকে মানুষ করেছে সেও কামনা করত, নয়নাকে ওরা মুক্তি দিক, যেভাবে হোক, যেমন করে হোক। এমন কি নয়না একদিন অতি দুঃখের মধ্যে এমনও চেয়েছিল, যমুনা একটা ছেলেছোকরা জুটিয়ে চলে যাক। একেবারে অকারণে এটা চায়নি। বাস্তবিক পক্ষে তখন একটা ছেলে, মোহিত, ঘুর ঘুর করছিল যমুনার পাশে। ছেলেটা মালগাড়ি-ভাঙাদের দলের ছেলে, গুণ্ডা বজ্জাত, লেখা-পড়া শেখেনি, একেবারেই ছোটলোক, তবু সেই ছেলের সঙ্গে যদি যমুনা চলে যেত নয়না কিছু মনে করত না। হোক না বেজাত, বজ্জাত; তবু গলা থেকে একটা মস্ত কাঁটা নামত নয়নার। যমুনা যায়নি। তার অনেক আশা। সে স্কুল থেকে পাশ করেছে, তার চেহারা ভাল, রঙ ফরসা, কায়স্থ ঘরের ভদ্র মেয়ে, সে আকাশের চাঁদ না হলেও অন্তত ভাল গাছের ভাল ফলটি পেড়ে নিতে চায়। যমুনা যায়নি, অথচ নয়নাকে আগে থেকেই আর-একজনের দয়াদাক্ষিণ্য নিতে হচ্ছিল; পাল কোম্পানীর মেজবাবুর। মেজবাবুর বাড়িতে বউ ছিল না। বউ থাকলেও হয়ত দয়াদাক্ষিণ্য পাওয়া যেত মেজবাবুর। কেননা মেজবাবুর বেশ চোখ পড়ে গিয়েছিল নয়নার ওপব। জগতে কোন মেয়ের ওপর কোন পুরুষের চোখ পড়ে বলা মুশকিল। রোগা, রুক্ষ, বেপরোয়া, দাম্ভিক মেজবাবুর কেন যে নয়নার মতন কালো-কুচ্ছিত সেলাইদিদির ওপর চোখ পড়েছিল নয়নাও জানে না। মেজবাবু তাকে রসিকতা করে সব সময় 'সেলাই দিদি' বলত। সেলাই দিদির সঙ্গে শোয়া-বসাটা আড়াল করে রাখার জন্যে মেজবাবুর গা ছিল না। বদনাম রটল; এবং স্কুলের চাকরিটাও গেল। পুরনো পাড়া ছেড়ে এখানে চলে আসার এও অন্যতম একটা কারণ। মেজবাবুই দোকানের বিশ্বাসমশায়কে বলে এই মাঠকোঠার বাড়ি করিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু ভগবানের কী খেয়াল মাঠকোঠার বাড়িতে মেজবাবু পুরো দুমাসও আসতে পারেনি, হাঁপানীর চিকিৎসা করতে কলকাতায় গিয়ে মারা গেল।

মেজবাবু যদিও আর এল না, কিন্তু বুড়ো বিশ্বাসমশাই নয়নার আশ্রয় ভেঙে দিল না। নয়না এই মাঠকোঠাতেই থাকতে লাগল। ওপরের দুখানা ঘরের একটা ছিল যমুনা ও রত্নার, অন্যটা তার নিজের। মেজবাবু আসত বলে তার আলাদা একটা ঘর দরকার ছিল। এ বাড়িতে মেজবাবু যতদিন এসেছে, খুব অল্প দিনই, নয়না বড় ভয়ে ভয়ে থেকেছে। কোনদিন কাঠের সিঁড়িতে পা হড়কে পড়ে গা-গতর ভাঙবে, কোনদিন বা টিনের খোঁচাখুঁচিতে হাত-পা কেটে জখম হয়ে বসে থাকবে; আবার বলা যায় না, খেপে গিয়ে কোনদিন বা নয়না-দের সংসার টেনেটুনে অন্য কোথাও নিয়ে গিয়ে বসাবে। মেজবাবুর ওপর নয়নার ক্রমেই কেমন মায়া পড়ে গিয়েছিল। বয়স হয়ে আসছিল মেজবাবুর, স্বাস্থ্য ভেঙে গিয়েছিল, চোখে দেখার কষ্ট পেত। মানুষটা মনেও তেমন সুস্থ ছিল না। একমাত্র মেয়ের বিয়ে দিয়েছিল কাশীতে; কোনোদিন আর তাকে কাছে আনেনি; ভাইদের সঙ্গে বনিবনা নষ্ট হয়ে সংসার ভাঙাভাঙি হতে বসেছিল; দোকানের ব্যাপার নিয়ে মামলা-মোকদ্দমা গড়াতে যাচ্ছিল; নয়না

যতদূর জানে এবং বোঝে, এই যে মাঠকোঠার একটা ঘরে বিশ্বাসবাবু দোকানের অনেক পুরনো খাতাপত্র, এটা-সেটা তালাবন্ধ করে রেখেছে—এটা মেজবাবুর জন্যেই। ব্যাপারটা মেজবাবুরই ছিল। পারিবারিক এইসব গোলমালের ভেতরের কথা মেজবাবু কোনোদিন নয়নাকে বলেনি। তবে একটা কথা নয়না বুঝেছিল, কোনো গোপন আক্রোশ ও দুঃখ মেজবাবুর আছে, গোটা সংসারের ওপর। এমন কি নিজের মৃত স্ত্রী এবং মেয়েকেও মেজবাবু ভাল মুখে উল্লেখ করত না। নয়নার সঙ্গে মেজবাবুর ব্যবহারটাও ছিল অদ্ভুত। শোয়া-বসা সত্ত্বেও মেজবাবু ঠিক মেয়েছেলে রাখার মতন ব্যবহার করত না। মনে হত, নয়নাকে যেন মেজবাবু পালন করছে। 'তুই-তোকারি' করত, আদর করত, গালাগাল দিত, আবার রাগ চড়লে কথাই বলত না। মানুষটা মরে গেল। মরে যাবার পর নয়নার বেশ কিছুদিন ফাঁকা ফাঁকা লেগেছে। তার কে মরেছে একথা সে স্পষ্ট করে বোঝেনি। কিন্তু অনুভব করেছে, এমন কেউ মরেছে যে মরলে রাত্রে শুয়ে শুয়ে চোখের জল ফেলতে হয়।

এ বাড়িতে তারপর এল গণনাথ। গণনাথকে নয়নাই ডেকে এনেছে। এনে একটা ঘর ছেড়ে দিয়েছে। নিজের ঘর। কিন্তু গণনাথকে আনল কেন?

যমুনা চা নিয়ে এসেছিল। এসে দেখল, দিদি বিছানার ওপর বসে, অন্য-মনস্ক, গালে হাত।

যমুনার ডাকে সাড়া দিতে গিয়ে নয়না আনমনা হয়ে কি যেন বিড়বিড় করে বলে ফেলেছিল। তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে হাত বাড়িয়ে চা নিল।

যমুনা বলল, "কি বললে যেন!"

নয়না চোখ অন্যদিকে করে বলল, "কিছু না।...এক কাজ কর তো, গণনাথের ঘরে একটা কিছু পেতে দে।"

"এ ঘরে বসবে না?"

"না, অসুবিধে হয়; ও ঘরেই দে।"

যমুনা নিজের জন্যে পাতলা করে চা করেছিল। সেই চা খেতে খেতে বলল, "চা-টা খেয়ে দিচ্ছি।"

নয়না চুপচাপ চা খেতে লাগল। তার মুখের কোথাও সকালের সেই প্রসন্ন ভাব আর নেই, কেমন বেদনা ও মলিনতার ছায়া নেমেছে।

যমুনা বলল, "গণাদা সকাল সকাল চান করে খেয়েদেয়ে বেরিয়ে যাবে বলছে।"

"জানি।"

"বাজারের কি হবে?"

"কি আছে দেখিনি।"

"কিছু নেই।"

"গণনাথকে বলছি"—নয়না পাশের জানলার দিকে তাকাল।

নীচে গণনাথের গলা শোনা যাচ্ছে: গণনাথ আর রত্না চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে

কথা বলছে। হাসি-তামাশার কথা হচ্ছিল।

নয়না হঠাৎ বলল, "তুই আরও ক'দিন ছুটি নিলে পারতিস।"

"আবার ছুটি"—যমুনা এমনভাবে বলল যেন ছুটি নেওয়ার কথাটা আর ওঠেই না; যা নিয়েছে তাই যথেষ্ট, ওই ক'দিন ছুটি পাওয়াই ভাগ্য।

নয়না বলল, "শরীরটা আরও একটু সেরে উঠত। নয়ত অফিস করতে গিয়ে বারো চোদ্দ আনা রিকশা ভাড়া। গায়ে লাগে।"

যমুনা এতক্ষণে বুঝতে পারল কথাটা। প্যারা টাইফয়েড হোক আর যাই হোক, পালটাপালটি দুবার পড়েছিল। ওই জ্বরজ্বালা তার শরীর বড় দুর্বল করে দিয়েছিল। সে-দুর্বলতা কি এখনও আছে! অফিসটা কম করেও মাইল দেড়েক দূর। আসলে রিকশা করে যেতে যমুনার ভাল লাগে। দুবেলা যে রিকশা ভাড়া গুনতে হচ্ছে যমুনা তা জানে, কিন্তু উপায় কি!

যমুনা বলল, "কি করব, অতটা হাঁটতে পারি না।"...

নয়না বুঝল না, রাগ করল কি না যমুনা। যদি করে, করুক। নয়নার এখন বেশ টানাটানি যাচ্ছে। জমানো পুঁজি বলতে পঁচিশ-পঞ্চাশটা টাকা। তাও কি আছে নাকি?

যমুনা চায়ের পাত্র রেখে নিজের বিছানার ওপর পাতা ময়লা শতরঞ্জিটা উঠিয়ে নিয়ে পাশের ঘরে পাততে যাচ্ছিল, দিদির কথায় দাঁড়াল।

নয়না বলল, "তোর গালের তলায় ওটা কি হয়েছে?"

যমুনা সামান্য অপ্রস্তুত। "কোথায় আবার কি হল!"

"নীচের গালে ওটা কি? কই এদিকে আয়।"

যমুনা এবার হাত দিল গালে। "এটা?...ফোস্কার মতন মনে হচ্ছে।"

"কি করে ফোস্কা হল?"

যমুনা হাত দিয়ে নীলচে দাগটা ঢাকা দিল। "কি জানি!"

নয়না লক্ষ্য করে বোনের মুখ দেখছিল, যমুনা কেমন অস্বস্তি বোধ করে তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে চলে গেল।

যমুনা চলে যাবার পরও নয়না দরজার দিকে তাকিয়ে থাকল, যেন চোখ দুটো যমুনার পিছন পিছন এঘর থেকে ওঘরে গিয়ে যমুনাকে দেখছে। নয়নার খটকা লাগছিল, সন্দেহ হচ্ছিল। অসুখ থেকে ওঠার পর যমুনা রান্নাঘরে গিয়ে হাতাখুন্তি ধরেনি; ভাতের ফেন, গরম তেলের ছিটে ছিটকে এসে গালে লেগেছে যে তাও নয়। তবে? অত বড় একটা দাগ পড়ল কি করে? কালও চোখে পড়েনি নয়নার। যমুনার হাবভাব দেখে আরও সন্দেহ হয়।

চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল নয়নার। উঠে পড়ে ঘরের এক পাশে গিয়ে দাঁড়াল। ডালা-ভাঙা একটা সুটকেশের মধ্যে নানারকমের টুকরো কাপড়, পাশে একটা কাপড়ের থলে—টুকরো-টাকরা কাপড়ে সেটা পেটমোটা হয়ে পড়ে আছে। নয়না কি যেন ভাবল, তারপর পেটমোটা থলেটাই হাতে নিল। একটা এক্সারসাইজ খাতা, টেপ, লালনীল পেন্সিল, কাঁচিটাচি নিয়ে সে পাশের ঘরে এল। গগনাথের

ক্যাম্পখাট একপাশে সরিয়ে রাখা, মেঝেতে শতরঞ্জি পেতে দিয়েছে যমুনা। হাতের জিনিসপত্র শতরঞ্জির ওপর রেখে নয়না আবার নিজের ঘরে গেল। ফিরে এল একটু পরেই। আসার সময় বারান্দা থেকে গণনাথকে ডাকল।

শতরঞ্জির ওপর বসে একে একে কাপড়ের থলির মধ্যে থেকে টুকরো কাপড়গুলো বের করে করে রাখছে নয়না, দেখছে, পরখ করছে, ভাবছে, মাঝে মাঝে এক্সারসাইজ খাতাটা দেখছে—গণনাথ ঘরে এল।

নয়না গণনাথের দিকে তাকাল না; বলল, "একবার বাজারে যাও..."

গণনাথ বলল, "রত্নাকে বলছিলাম; বলছিলাম, তুই আমায় ঠিক মতো বলিস না কেন, আসবার সময় আমাদের বড়বাজার থেকেই আলুটালু এটাওটা কিনে আনতে পারি। এখানে রাস্তার ধারে দু-তিনটে লোক বসে, তিন গুণ দাম নেয়।"

সাদা জমির ওপর সবুজ ও লালের ফোঁটা দেওয়া এক টুকরো কাপড় পাট করে ফিতেয় মাপতে মাপতে নয়না বলল, "নিজেকে নিয়ে ফিরতেই তোমার রাত হয়, আবার বাজার।"

গণনাথ খুব একটা রাত করে না, আটটা ন'টা নাগাদ ফেরে। বিড়ি ধরিয়ে নিয়ে গণনাথ বলল, "কত আর রাত হয়, বাজার আনতেই পারি।"

মাপ হয়ে গিয়েছিল, কাপড়টা মেঝেয় রেখে হাত দিয়ে টেনে টেনে সমান করে নিচ্ছিল নয়না। গণনাথ চলে যাচ্ছে দেখে নয়না বলল, "পয়সা নিয়ে যাও।"

"আমার কাছে আছে।"

নয়না এবার চোখ তুলল। "তা থাক। এটা নিয়ে যাও।" শতরঞ্জির একপাশ থেকে দুটো টাকা তুলে নয়না হাত বাড়াল।

গণনাথ বলল, "ঠিক আছে, ওটা রেখে দাও; আমার কাছে আছে।" গণনাথ চলে যাচ্ছিল, চৌকাট ডিঙোচ্ছে. নয়না বলল, "কি আনবে তুমি জানো?"

"নীচে ওদের জিজ্ঞেস করে নেব।"

গণনাথ চলে গেল। তার পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। সিঁড়ি দিয়ে নামছে গণনাথ। নয়নার মনে হল চেঁচিয়ে বলে, তুমি মাছটাছ এনো না। বলার ইচ্ছে থাকলেও নয়না বলল না। গণনাথ যমুনার জন্যে খুঁজেপেতে কিছু আনবেই, একটা মাগুর বা সিংগি, নিতান্ত দুটো চুনো মাছও। এই মাছ আনার জন্যে সে সাইকেল ঠেলে বাজার যেতেও তৈরী। তবে এদিকেও মাঝে মাঝে পাওয়া যায়।

কাপড়ে কাঁচি বসাবার আগে কি ভেবে নয়না উঠল। নীচে থেকে একবার ঘুরে আসাই ভাল। কি করছে ওরা দুটোতে কে জানে! বলে না এলে হয়ত এক করতে আর-এক করবে।

নীচে থেকে ঘুরে এসে নয়না দেখল, গণনাথের ঘরে রোদ ঢুকতে শুরু করেছে। বেশ আলো। মাটি মাটি একটা গন্ধ দিচ্ছে বাতাসে; হয়ত ভেজা মাটি শুকিয়ে আসার গন্ধ। জানালা দিয়ে একটা ভোমরা ঢুকছে ঘরে, শব্দ করে

উড়ছে। কয়েক মুহূর্ত অন্যমনস্কভাবে থেকে নয়না আবার নিজের কাজ নিয়ে বসল।

গণনাথের সঙ্গে বরাবরই একটা মুখচেনার বেশি জানাশোনা ছিল নয়নার' দুজনে প্রায় সমবয়সী না হলেও খুব একটা ছোট বড় নয়। নয়নার বয়েস এখন প্রায় পঁয়ত্রিশ। গণনাথদের মেস আর নয়নাদের আগের বাড়ি এক পাড়াতেই ছিল। নয়নারা কিশোরী বয়সে ও-পাড়ায় এসেছিল। যমুনা তখন খুবই ছোট, রত্না হয়নি। তখন পাড়াটা ছোট এবং ফাঁকা ছিল। গণনাথ তখন মেসে আসেনি। আরও দু-চার বছর পরে গণনাথ মেসে এল। আসার পরই সকলের চোখ পড়ল। গণনাথের খুব নাম-ডাক ওই বয়েস থেকেই: পাড়ার তো বটেই, শহরের সমস্ত ছোট-বড় কাজে গণনাথের মুখ দেখা যেত, তাকে ডাকাডাকি চলত। দেখতেও তখন গণনাথ খুব জীবন্ত, সপ্রতিভ ছিল। সহাস্য, সুন্দর, সরল।

গণনাথের সঙ্গে মাখামাখি কখনও হয়নি নয়নার, কিন্তু কথা বলাবলির একটু বেশিই ভাব ছিল। প্রয়োজনে গণনাথকে পাওয়া যেত। একবার মেসের একটা ছেলে, জগন্নাথদা, নয়নাদের বাড়িতে আসা-যাওয়া শুরু করে নয়নাকে বেশ বিপদে ফেলেছিল। মাথার তেলটেল, ফিতে, পাউডার, ব্লাউজের ছিটফিট কিনে দিত। তারপর একদিন ফাঁকা মেসবাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল শীতের দুপুরে। খানিকক্ষণ রেখে নয়নাকে অনেক আদরটাদর করে বলল, নয়নাকেই সে বিয়ে করবে, আর কাউকে নয়; বলে নয়নাকে যে কত ভালবাসে জগন্নাথ তার প্রমাণ হিসেবে গায়ে হাত বুলিয়ে চুমুটুমু খেয়ে বিছানায় শোয়াল।... আসবার সময় পাঁচ টাকার একটা নোট ব্লাউজের মধ্যে গুঁজে দিয়েছিল। ব্যাপারটা শীতের দুপুরে ফাঁকা মেসে ঘটলেও চোখে পড়ে গিয়েছিল মেসের ঠাকুরের। একটা কেচ্ছা কেলেঙ্কারি ঘটতে পারত। গণনাথ সেটা সামলে দেয়। সে মেসে ছিল, গর্হিত কিছু ঘটেনি—এই রকম একটা মিথ্যে সাক্ষী দিয়ে নয়নাকে বাঁচাল। জগন্নাথকেও তাড়াল মেস থেকে। তারপর থেকে লজ্জায় নয়না গণনাথের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারত না।

এ-সব লজ্জাটজ্জা, বা সেই বয়সের বোকামি, ভুল, লোভ বেশিদিন থাকেনি। কারই বা থাকে। জীবনের আরও কত বড় বড় ঘটনা ঘটল, কত রকম মোড় খেল, কত দুঃখ আঘাত লজ্জা এল—জগন্নাথের কথা কেউ আর মনে রাখল না। নয়নাও নয়। গণনাথও পরে নিশ্চয় ও বিষয়ে কিছু ভাবেনি। স্কুলের সেলাই দিদিমণির চাকরি, বাবার মৃত্যু, অভাব অনটনের কুচ্ছিত সংসার, মেজবাবুর বদনাম, স্কুলের চাকরি-যাওয়া—এসব ঘটনা ঘটতে ঘটতে নয়না কত বড় আর বুড়ো হয়ে এল। গণনাথের সঙ্গে পরিচয়টা ফিকে হয়ে এসেছিল। যে যার নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। পথেঘাটে দেখা হলে হত, খুব একটা বিপদে পড়লে যোগাযোগ করতে হত। তারপর তো পুরনো পাড়া ছেড়ে চলেই আসতে হল। মেজবাবুও মারা গেল।

মেজবাবু মারা যাবার পর একজন কারও দরকার ছিল এ বাড়িতে, কোনো পুরুষের। বড় ফাঁকায় ফাঁকায় তারা থাকে, নতুন বসতি সবে গড়ে উঠছে, যারা

যারা থাকে তারাও পাঁচ ধরনের মানুষ, গৃহস্থ আছে আবার অ-গৃহস্থও আছে, বস্তি আছে, মাঠকোঠা আছে, মদোমাতালের আসা যাওয়াও আছে, চোর-ছ্যাঁচড় বদমাশ রয়েছে; তার উপর নয়নারা এখানে খুব একটা সুনাম নিয়ে আসেনি, নয়না আর মেজবাবুর কথা কে বা না শুনেছিল। কাজেই এ-বাড়িতে কেউ না থাকলে তিন-তিনটে মেয়ের জন্যে লোকের উপদ্রব ঘটবে। মেজবাবু থাকতে এ ভয় ছিল না। সবাই জানত, ও বাড়িতে কড়া নাড়তে গেলে গোলমাল হবে। তবু দু-একবার কি না নড়েছে! মেজবাবু মারা যাবার পর একেবারে সন্ত্রস্ত অবস্থা। বিশ্বাসবাবু থাকে অন্য জায়গায়, তার বলাকওয়া সত্ত্বেও বেশ উৎপাত হতে শুরু হয়েছিল। নীচের কাপড় ছাপাইয়ের কারিগররা থাকে দুপুরে, তাদের ওপর ভরসা কি! এই কারিগরদের মধ্যে কাশী তো বেশ কয়েকবার তাদের সঙ্গে মেলামেশা করার চেষ্টা করেছে। নয়না পাত্তা দেয়নি। ছোঁড়াটা দুপুর বেলায় রত্নাকে যে মজাবার চেষ্টা করে তাও নয়না জানে। তবে অন্যদের জন্যে তেমন সাহস পায় না, রত্নার ওপর কড়া শাসন আছে নয়নার।

চোর, ছ্যাঁচড়, বদমাশ ছাড়া আপদবিপদও আছে বই কি। একজন পুরুষ মানুষের খুব দরকার ছিল। একেবারে সহায়সম্বলহীন তিনটি মেয়ে মাঠকোঠায় এভাবে পড়ে থাকে কি করে! যমুনার পেছনে ফেউ লেগে গিয়েছিল, রাত্তিরে সিঁড়ির নীচে দু-তিনটে ছোঁড়া রোজ জমায়েত হয়ে হল্লা করতে শুরু করেছিল। নয়না নিজেও দু-একদিন অপ্রস্তুতে পড়েছে। তার ওপর রত্না। একজন পুরুষ মানুষ না হলে একেবারেই যেন চলছিল না।

আচমকা গণনাথকে পাওয়া গেল।

কি জানে যেন গণনাথ এসেছিল একদিন এ পাড়ায়। খোঁজ নিয়ে এসেছিল নয়নাদের সঙ্গে দেখা করতে। গণনাথের সঙ্গে রাস্তাঘাটে দেখা হত অবশ্য আগে, ইদানীং আর বড় হয়নি—, গণনাথকে দেখে নয়না অবাক। শরীর স্বাস্থ্য ভেঙে কি রকম হয়ে গেছে। বয়সটা বড় বড় দেখায়. মুখে চোখে শুকনো মলিন ভাব, আগের মতন প্রাণ নেই, হাসি নেই, সজীবতা নেই। নয়নার বড় দুঃখ হল, মায়া হল। পেটের একটা ঘায়ে নাকি ভুগছে অনেকদিন, মেস আর সহ্য হচ্ছে না।

নয়না বলল, "তুমি আমার এখানে এসে থাক না!"

"এখানে? কেন?"

"তুমি তো বলছ মেস ছাড়বে..."

"তা বলছি। কিন্তু এখানে—!"

"থাকতে চাও না?" নয়না সন্দেহ করছিল, মেজবাবুর ঘটনার পর গণনাথ এখানে থাকতে রাজী হবে না। সম্মান নষ্ট করতে চাইবে না গণনাথ।

গণনাথ বুঝল, অন্তত নয়নার চোখের দিকে তাকিয়ে এবং গলার স্বর শুনে বুঝতে পারল। হেসে বলল, "আমায় ঘরভাড়া দেবে? কত ভাড়া?... আমার অবস্থা খুব খারাপ, ভাড়াটাড়া বাকি পড়তে পারে।"

নয়না তখন সব বলল। শেষে বলল, "তুমি থাকলে আমি ভরসা পাই।"

গণনাথ গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল সামান্য। ভাবছিল অনেক কিছু। পরে বলল, "আমার ওপর ভরসা করে কি ভাল করবে?" যদি ভাল না হয়?"

নয়না আর কথা বাড়াল না; বলল, "মন্দ হলেও বেশি হবে না।...যাকগে, তুমি একটু ভেবে দেখো।"

এর দিন দশেক পরে গণনাথ চলে এল।

গণনাথ আসায় নয়না এখন নানাদিক দিয়েই অনেকটা নিশ্চিন্ত।

বাজার থেকে ফিরে গণনাথ ওপরে এল।

নয়না এর মধ্যেই একটা ফ্রক, একটা পেনি ফ্রক মোটামুটি কেটে ফেলেছে, ফেলে এবার ব্লাউজ কাটতে বসেছিল।

গণনাথ এসে শতরঞ্জিতেই বসল, বসে বিড়ি ধরাল।

নয়না শুধলো, "মাছ এনেছ নাকি?"

"এক পাতা মোরলা", গণনাথ বলল। "শালপাতার ঠোঙা করে সাজিয়ে রেখেছিল, একপাতা নিয়ে নিলাম।"

"মাছ আনতে বারণ করতে যাচ্ছি—তুমি চলে গেলে! রোজ রোজ মাছ আনার কি আছে?"

"রোজ আনছি কোথায়? পয়সা কই?"

নয়না ব্লাউজের বুকের দিকটা সাবধানে কাটতে লাগল। পরে বলল, "গরীবের শরীর এমনিতেই সারবে, মাছ দুধের দরকার নেই।"

গণনাথ দেখল নয়নাকে; হেসে বলল, "কার শরীর দেখে বলছ, আমার?"

মুখ তুলল নয়না। "না, তোমার নয়।...যমুনাকে আর বেশি আস্কারা দিও না।"

"কে দিচ্ছে! আমি? আমি কখনও আস্কারা দিই না।" গণনাথ হাসিহাসি মুখে রোদের দিকে তাকিয়ে বিড়ি টানতে লাগল।

নয়না বলল, "হাসিঠাট্টার কথা নয়, আমি সত্যিই বলছি। যমুনার অসুখ এমন কিছু হয়নি যার জন্যে তোমায় ধারকর্জ করে এত করতে হবে।"

"বাঃ, বেশ তো বলছ, বড়দি! আমি করলাম, না তুমি করলে!"

"দরকারটুকু আমি করেছি, তুমি তার বেশি করছ।"

গণনাথ কথাটায় গা করল না। বরং কথা ঘোরাবার জন্যে জানলা, রোদ, সামনে-মেলা ছিট কাপড় দেখতে দেখতে বলল, "আজ বাইরে বেশ একটা শরৎকালের ভাব হয়েছে, বুঝলে বড়দি। পুজো পুজো গন্ধ ছাড়ছে।"

নয়না এবার একটু অসন্তুষ্ট হল; বলল, "আমি বেশ বুঝতে পারছি, এ বাড়ি আর ওর ভাল লাগছে না।"

"কেন?"

"আগেও কি লেগেছে, লাগোন; তবু বাধ্য হয়ে বাড়তে ছিল। এবার আর থাকবে না।"

"কি বলছ তুমি?"

"যা বলছি তা সত্যি হয় কিনা, দেখ।"

গণনাথ বিড়ির টুকরোটা ফেলে দিল। মুখ আর অত হাসিখুশী নয়। নয়নাকে দেখছিল লক্ষ্য করে। বলল, "সুখের মুখ দেখার আশা সবাই করে, নয়না। সংসারের এটাই নিয়ম। যমুনার নিজের একটা আশা থাকতে পারে। তাতে দোষের কি?"

নয়না অনেকক্ষণ জবাব দিল না কথার। অকারণে কাটা ব্লাউজের গলার স্ট্রাপটা কাঁচি দিয়ে আরও পরিষ্কার করে নিতে লাগল। শেষে বলল, "সংসারের নিয়ম সবার বেলায় খাটে না কেন?"

গণনাথ বুঝল বোধ হয়; কোনো জবাব দিল না।

অপেক্ষা করে থেকে থেকে নয়না বলল, "তুমি তো লেখাপড়া শেখা মানুষ, আমি মুখ্যু। কিন্তু একটা কথা আমায় বলো, ঘর-সংসার বিয়ে-থা করার ইচ্ছে আর ছেলে ধরার লোভ কি এক জিনিস হল? যে লোভী হয় তার মন বলে কিছু থাকে না, শুধু লাভটাই দেখে। যমুনার স্বভাবটাই লোভীর।"

গণনাথ কিছ বলল না; দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম গুছিয়ে নেবার জন্যে উঠল।

নয়না বলল, "তুমি কেন লোভী হলে না?"

চুরুটের একটা পুরনো বাক্স আর দাড়ি কামাবার সাবান নিয়ে গণনাথ রোদের দিকে এল। বাক্সটার মধ্যে তার সেফটি রেজার, ব্লেডটেড্ থাকে। ছোট মতন একটা আয়নাও নিয়েছে। জলের ছোট্ট একটা বেকালাইটের বাটি হাতে পাশের ঘরের কুঁজো থেকে জল আনতে গেল।

ফিরে এসে দেখল, নয়না কাঁচিতে আঙুলের ডগা কেটে চুপ করে বসে আছে। তার সদ্য কাটা ব্লাউজের ওপর রক্ত পড়েছে, শাড়িতেও রক্ত। নয়না এমন করে আঙুলটা টিপে ধরে আছে যাতে রক্তটা বেশিই পড়ছে। তবু তার কোনো হুঁশ নেই, চোখ কেমন স্থির, দৃষ্টি শূন্য।

গণনাথ জলের বাটি রেখে দিয়ে তাড়াতাড়ি ডেটল খুঁজতে লাগল।

১০

বুলালি এসে দেখল, অভয় নেই।

শোভা বলল, "দাদা এক্ষুনি আসবে।"

"কোথায় গেছে রে?" বুলালি জিজ্ঞেস করল।

"বাবার জন্যে একটা ওষুধ আনতে।"

"কি হয়েছে মেসোমশাইয়ের?"

"কিছু না। চোখ দুটো লাল হয়ে জ্বালা করছিল, কি একটা ওষুধ আনতে গেছে।"

বুলালি ভাবছিল অপেক্ষা করবে, নাকি চলে যাবে। এমন সময় জানলা দিয়ে আভার মুখ চোখে পড়ল। বুলালি তাকাল। আভার চোখে অস্পষ্ট কোনো সাড়া ছিল।

শোভা বলল, "বসুন না, দাদা এলো বলে।"

বুলালি সাইকেলটা বাইরের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে রাখল। শোভা অভয়ের ঘরের বাইরের দিকের দরজাটা খুলতে গেল।

বুলালি ঘরে ঢুকে দেখল, শোভা চলে যাচ্ছে। আভা ঘর পরিষ্কার করছিল; বুলালিকে দেখে কোমরে জড়ানো আঁচলটা খুলে ফেলল।

ঘরের মধ্যে রাশীকৃত জিনিসপত্র নামানো; মেঝেতে ধুলো, চারপাশে ঝুল ঝরে পড়েছে। বিছানাপত্র ঘরে নেই, বাইরে রোদে মেলে দিয়ে এসেছে হয়ত, টেবিল চেয়ার উলটেপালটে রাখা: একদিকে ঝাঁটা, ঝুলঝাড়া লাঠি। জানলার দুটো পরদাই খুলে নেওয়া। রাজ্যের ময়লা, কাগজ, বইপত্র ডাঁই করা।

বুলালি ঘরের চারদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে আভার চোখের দিকে তাকাল, "আরে বাব্বা! ব্যাপারটা কি?"

আভা জানলার দিকে সরে গিয়ে দাঁড়াল। বলল, "ঘর পরিষ্কার হচ্ছে।"

"তা তো দেখছি! হঠাৎ..?"

"বাঃ, পুজোর আগে বাড়িঘর ঝাড়ামোছা করতে হবে না!"

"পুজো!...কবে যেন পুজো—" বুলালি মনে মনে সময়টা ভাববার ভান করল, তারপর বলল, "সে এখনও অনেক দেরি।"

"ক—ত?"

"মাসখানেক

"অত নয়", আভা বলল।

বুলাল হাসল। "তুমি একলাই কি সব পরিষ্কার করে ফেলবে নাকি?"

"তা ছাড়া আর কে! মা পারে না, বেশি ওঠানামা করলে বাতের ব্যথা ধরে। আমিই করব, শোভা আছে।"

"তুমি খুব কাজের মেয়ে হয়ে গিয়েছ।" বুলালি হাসল।

আভা জবাব দিল না কথার। জামার হাতায় মুখটা মুছল। আভার মাথার চুলে ধুলো পড়েছে, ঝুল পড়েছে গায়ে। আধময়লা মুখে ধুলো ধুলো ভাব। বাসন্তী রঙের সাধারণ শাড়িটা অগোছালো, ছিটের ব্লাউজ ময়লা দেখাচ্ছে।

বুলালি অন্য জানলার সিমেন্টে কোনোরকমে বসল। রগড় করে বলল, "তোমার কাজের ডিস্টার্ব হচ্ছে। তুমি ঝেঁটা-ফেঁটা চালাও, আমার কিছু হবে না।"

আভা হাসি সত্ত্বেও রাগের মুখ করল। "অসভ্যতা!"

বুলালি হাত বাড়িয়ে জানলার শিক ধরে পিঠ হেলিয়ে বসে হাসল। "অসভ্যতার কি হল, তোমারই সময় নষ্ট হচ্ছে।"

"আমার অঢেল সময়।"

"কি কর?"

"যা ইচ্ছে"

"আরে বাস, তুমি একেবারে টকাটক অ্যানসার দিতে শিখেছ", বুলালি চোখ বড় বড় করে বলল। পরে ড্যাবড্যাবে হাসিচোখে চেয়ে থাকল।

আভা তক্তপোশের ওপর নামানো বইটইগুলো মোছবার জন্যে একটা ময়লা চিট ছেঁড়া লুঙ্গি নিয়ে তক্তপোশে গিয়ে বসল।

বুলালি আভাকে দেখছিল। আভাকে দেখতে তার বরাবরই বেশ ভাল লাগে। আধময়লা রঙ হলেও আভার গড়ন খুব সুন্দর; ছিপছিপে, মাথায় মাঝারি, নাকচোখ অভাবের মতনই, কাটা কাটা, পরিষ্কার, পাতলা ঠোঁট, বাঁ দিকে গজদন্তের মতন দুটো ছোট দাঁত, মাথার চুল কালো, অঢেল চুল আভার। বুলালি লুকিয়ে আভার গলাবুক দেখবার চেষ্টা করল। দেখা যাচ্ছে না; তবু বুলালি জানে, আভার বুকও ছোট, সুন্দর।

বই মুছতে মুছতে আভা ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, "তুমি ভীষণ মিথ্যুক।"

"আমি!" বুলালি অবাক হয়ে বলল, "কেন? মিথ্যুকের কি করলাম।"

আভা কোনো জবাব দিল না।

বুলালি আবার বলল, "মিথ্যুকের কি করলাম বলছ না তো?"

আভা মুখ ফিরিয়ে মাথা নেড়ে বলল, "বলব না তো।"

"কেন?"

"না, বলব না। কেন বলব!"

আভার মুখ ফেরানোর ভঙ্গি, চোখ একটু কুঁচকে রাগ রাগ ভাব করে কথা বলা বুলালির খুব ভাল লাগছিল। এরকম সে দেখে না বাড়িতে। বুলালি মুগ্ধ

চোখে হাসি হাসি মুখে আভাকে দেখছিল। দেখতে দেখতে বলল, "বললে তোমার জিভ খসে যাবে না। বলেই ফেল।"

"না।" আভা মুখ ফিরিয়ে কাজ করতে বসল।

বুলালি ভাবল। তার কিছু মনে পড়ছিল না। ভাববার আরও চেষ্টা করে সে অন্যমনস্ক ভাবে ঘরের এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল।

হঠাৎ বাঁশিটা চোখে পড়ল। অভয় বাঁশি বাজাত আগে, আজকাল আর বাজায় না। তাদের একবার কনসার্ট ক্লাব হয়েছিল, তাতে অভয় বাঁশি, কৃপাময় গীটার, বুলালি অ্যাকরডিয়ান, আর সূর্য ম্যারাকাস বাজাত। তাদের বাজনা শেখাত মোহনমাস্টার। মোহনমাস্টার কলকাতায় চলে গেছে। তার আগেই কনসার্ট ক্লাব ভেঙে গিয়েছিল। যন্ত্রগুলো যার যার বাড়িতে পড়ে ছিল। বাঁশিটার দিকে তাকিয়ে বুলালির মনে হল, অভয় তারপরও কখনো-সখনো বাঁশি বাজিয়েছে, এখন আর বাজায় না। বেটা ভালই বাজাত। সেই গৎটাও মনে পড়ল বুলালির; তারা বাজাত: 'সাবধানীরা বাঁধ বাঁধে সব আমরা ভাঙি কূল...।'

"অভয় এখনও বাঁশিটা রেখে দিয়েছে", বুলালি যেন খানিকটা অবাক হয়ে বলল।

"কেন, ফেলে দেবে?"

"ও রেখে কি হবে!"

"ফেলে দিয়েই বা কি হবে!"

"আমারটা যে কোথায় কে জানে! ভেঙে-ফেঙে গেছে হয়ত।"

"তোমার কথাই আলাদা।"

"কেন?"

"বড়লোক মানুষ, কি থাকল না থাকল, কে কি বলল—গ্রাহ্য করো নাকি!" আভা বেশ টেনে টেনে চোখমুখের পাকা পাকা ভঙ্গি করে বলল।

বুলালি বুঝল, আভা তাকে টিপ্পনি দিল। আসলে আভাকে সে কি বলেছিল তা মনে না পড়ায় আভার এই খোঁচা মারা। বুলালি আবার ভাববার চেষ্টা করল, আভাকে সে কি এনে দেবে বলেছিল। কিছুতেই মনে পড়ছে না। বুলালি হেসে বলল, "আমার একেবারে ব্রেন নেই। কি বলেছিলাম তোমায় বলো না, বাবা।"

আভা এবার যেন ভেংচি কেটে জবাব দিল, "অত বড় মাথাটা রেখেছ কেন?"

"কেটে ফেলব?" বুলালি ডান হাতটা দিয়ে নিজের গলার কাছে কোপ মারার ভঙ্গি করল।

আভা হেসে ফেলল এবার। হাসলে আভার সমস্ত মুখ খুলে যায়, গজদন্ত দেখা যায়, গলা কাঁপতে থাকে, বুকটাও যেন স্পন্দিত হয়। বড় চমৎকার দেখায় ওকে, অন্তত বুলালির চোখে।

বুলালি হাসি দেখতে দেখতে নিজেও হাসল, "এবার বলো।"

"কি?"

"কি আনব বলেছিলাম!"

আভা হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কপাল আর চোখের ওপরকার চুলের গুচ্ছগুলো সরাল। সরিয়ে হাত উলটে পিঠের দিকে নুয়ে পড়া আলগা খোঁপাটা তুলে নিচ্ছিল। তার ব্লাউজের বগলে ভিজে দাগ বুলোলি দেখছিল। "তুমি বলেছিলে না, তোমার বউদির কাছ থেকে সোয়েটারের ডিজাইনের বইটা এনে দেবে।" আভা বলল।

বুলোলি অপ্রস্তুত। কথাটা তার মনেই ছিল না, যখন বলেছিল তখন বেমক্কা বলে ফেলেছিল। বেশ মুশকিলে পড়ে বুলোলি। বলল, "ও! হ্যাঁ...! ঠিক তো! ভুলেই গিয়েছিলাম মাইরি।...এসব মেয়েলী ঝামেলা কি আমাদের মনে থাকে। কালই এনে দেব।"

আভা ডান গাল আর চোখের এমন একটা ভঙ্গি করল, যার অর্থ: তুমি আর দিয়েছ!

বুলোলির বউদির কাছে বাস্তবিক এ রকম কোন বই নেই। কিন্তু সেদিন আভা যখন তার সামনে চার-ছ পাতার একটা সোয়েটারের বই উলটেপালটে দেখছিল, তখন বুলোলি নিতান্ত চাল মেরেই মিথ্যে কথাটা বলেছিল। বলেছিল যাতে আভা বইটার দিকে মুখ না রেখে তার দিকে তাকায়। সেই ভুলের বইটাকে একেবারে তুচ্ছ করে দিতে না পারলে বুলোলির চলছিল না। তাছাড়া, বউদিকে নিয়ে কখনো-সখনো চাল মারতে হয় বুলোলিকে, বেকায়দায় পড়লে।

বুলোলি বলল, "কাল পরশুর মধ্যেই তোমার বই দিয়ে যাব।"

"দেখি।" আভা ঠাট্টা করল।

"দেখো।...কার সোয়েটার বুনবে?"

"কেন?"

"আমি একটা চয়েস করে দিতে পারি।"

"তোমাদের চয়েস?"

"কেন, আমরা কি?"

"বকাটে।" আভা অক্লেশে হেসে বলল।

বুলোলি নাকচোখ কোঁচকালো। "গালাগাল দিচ্ছ?"

"বা, গালাগাল খাবার মতন কাজ করবে, আর তোমাদের লোকে পুজো করবে নাকি?"

বুলোলি জানলা ছেড়ে উঠে আস্তে আস্তে কাঠের বেঁটে আলমারিটার দিকে এগিয়ে গেল। কি যেন দেখছিল। আভার দিকে না তাকিয়েই বলল, "আমাদের পুজো করলে কিন্তু প্যাণ্ডেল বাঁধতে হবে না; খরচাই নেই।"

আভা প্রথমটায় চুপ, এমন জবাব সে আশা করেনি। একেবারে বোকা। তারপর জিভ বের করে ভেংচে বলল, "অ্যা-হ্যা, কি আমার কথা! আর কিছু না হোক, কথা শিখেছ খুব।"

বুলোলি একবার বাইরের দরজা, পরে ভেতরের দরজার দিকে চকিতে তাকিয়ে দেখে নিল। কান বেশ সজাগ তার। তারপর হঠাৎ আলমারির মাথার ওপর থেকে

হাত বাড়িয়ে কি একটা খপ করে ধরেই আভার দিকে ছুঁড়ে দিল।

আভা কিছু বোঝবার আগেই বুলালি আভাকে আঁতকে দিয়ে চেঁচিয়ে বলল, "টিকটিকি!"

সঙ্গে সঙ্গে আভা লাফিয়ে উঠল। শিউরে, লাফিয়ে, আঁতকে সে জামা-কাপড় ঝাড়তে লাগল; একেবারে এলোমেলো।

বুলালি বলল, "ওই যে পিঠে—পিঠের দিকে।"

আভা গায়ের আঁচলটাই পুরো খুলে ফেলল! তার চোখমুখ ঘেন্নায় ভয়ে কেমন হয়ে উঠেছে, জোরে জোরে আঁচল ঝাড়ছে, হাত ঝাড়ছে, চুল ঝাড়ছে।

বুলালি হাসছিল। হাসতে হাসতে বলল, "এখনও যায়নি।...দাঁড়াও, ফেলে দিচ্ছি।"

বুলালি পা টিপে টিপে কাছে এল, দরজা দেখল, জানলা দেখল। আভা ততক্ষণে যেন বুঝে ফেলেছে সব। আঁচলটা তাড়াতাড়ি পিঠে গায়ে জড়িয়ে নিচ্ছিল।

বুলালি কাছে আসতেই আভা মুখ ফিরিয়ে নিল।

বুলালি বলল, "পিঠটা দেখি।"

"না।"

"টিকটিকিটা এখনও আছে।"

"থাক।"

"তোমার ঘেন্না করছে না?"

"না। তুমি যাও।"

বুলালি তবু নড়ল না। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে একেবারে আচমকাই আভার পিঠ জড়িয়ে কাছে টেনে নিল, নিয়ে টপ্ করে একটা চুমু খেয়ে ফেলল। চুমু খাবার পর সরে এসে নিজের ঠোঁট চুষতে চুষতে কেমন হয়ে গেল। ভীষণ একটা আবেগ যেন মুখে।

আভা বুলালির দিকে প্রথমে, পরে চকিতে জানলার দিকে তাকিয়ে সরে গেল পেছনে।

বুলালি কিছুক্ষণ আর কথা বলতে পারল না। শেষে নিজেকে কোনোরকমে সামলে নিয়ে বলল, "এত ভীতু তুমি! ফিট হয়ে যাবে নাকি?"

আভার তখনও বোধহয় বুক কাঁপছিল। গলার নলীর কাছটা শুকনো। বিমূঢ়, বিশুষ্ক মুখ। কপালে ঘাম। হাত কয়েক তফাত থেকে বুলালির চোখের দিকে তাকিয়ে সে যেন কি দেখল, তারপর চোখ নামিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

বুলালি আর কিছু বলল না। কেউ আসছিল।

অভল এল।

বুলালির সঙ্গে অভয় বেরুল। সাইকেল নিল না অভয়। তার সাইকেলে

টায়ার দুটো পালটাতে না পারলে আর বের করবে না। বেশ কয়েকটা টাকা দরকার; মা'র কাছে টাকার কথা তুলতেই পারে না; তুললেই মা'র মুখের কল খুলে যাবে। মা'র মুখ ভাল লাগে না অভয়ের।

বুললিকে সাইকেলে চড়তে দেয়নি অভয়, হেঁটে হেঁটে যাচ্ছিল; বুললি তার সাইকেল ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে।

যেতে যেতে বুললি বলল, "তোর সঙ্গে আমার একটা প্রাইভেট টক আছে।"

অভয় তাকাল। "কি?"

"এখন নয়, পরে বলব।"

অভয় তেমন কৌতূহল বোধ করল না।

বুললির মাঝেমাঝেই প্রাইভেট টক থাকে, তারপর বলার সময় বুললি এমন সব কথা বলে যার কোনো মাথামুণ্ডু নেই। কোনো কোনো ব্যাপারে বুললি অত্যন্ত বোকা।

কয়েক পা এগিয়ে অভয় বলল, "আসছে বুধবারে আমি একটা পরীক্ষা দিতে যাচ্ছি, জানিস?"

"পরীক্ষা? কিসের?"

"চাকরির।.. লিখে পরীক্ষা নেবে, মাইরি। তারপর ইন্টারভিউ।"

"রেলের চাকরি?"

"হ্যাঁ এসব পেঁয়াজীর কোনো মানে হয়! নিবি শালা তোদের পেয়ারের লোকের ছেলে-ভাইপোকে অযথা আমাদের হয়রানি করে লাভ কি!"

বুললি কি ভেবে বলল, "তোর বাবা তো চেষ্টা করলেই একটা চাকরি হয়ে যায়।"

"দূর, আমার বাবার দ্বারা কিছু হবে না" অভয় মাথা নেড়ে সাফসাফ জবাব দিল। "কোনো কাজের নয়, একেবারেই বাবা ভোলানাথ।"

অভয়ের কথা বলার ধরনে বুললি মজা পেয়ে হেসে ফেলল। "তুই ভোলানাথের বেটা।"

অভয় এই রসিকতার কোনো জবাব দিল না। পাড়া প্রায় ছাড়িয়ে এসেছিল অভয়। হাঁটতে হাঁটতে শিমুলগাছটা পার হয়ে এসে অভয় বলল, "দেখ বুললি, আমি তোর মতন দারোগার পুত্তুর নই। তুই পেয়ারের ছেলে, আরামসে আছিস। বাড়ির ব্যাপার তুই কিছু বুঝিস না শালা!.. সাইলেন্টলি অনেক কিছুই দেখি। আমার বাবা মাইরি এ সংসারে মা ছাড়া কাউকে জানে না। চাকরি করে আর ঘুমোয়। যা কিছু বলা-টলার সব মা'র সঙ্গে। আমাদের সঙ্গে কথাবার্তাই হয় না বড় একটা।"

বুললি অভয়ের কথা শুনতে শুনতে কিছু ভাবল, বলল, "সব বাবাই ওরকম রে। আমার বাবা কি আমার সঙ্গে কথাটথা বলে! ওই দু-চারটে। তাও দরকারে।"

অভয় কেমন অদ্ভুত আক্ষেপের সুরে বলল, "বাবারা বউ ছাড়া সংসারের

কিছু জানবে না, মাইরি।"

কথার পর দুজনেই হেসে ফেলল। বুলালি হাসতে হাসতে বলল, "জানতে দে। বুড়োরা খুব রসে আছে।"

অভয় অন্যমনস্কভাবে পাশের শিবমন্দিরটার দিকে তাকাল; মন্দিরের চারপাশে বাঁধানো দেওয়াল, গাছপালার মাথা এবং মন্দিরের চুড়ো দেখা যাচ্ছিল। চুড়োর ওপরে নীলচে আকাশ। সাদা হালকা তুলো-মেঘ ভাসছে।

অভয় বলল, "আমি দেখেছি, মা আমাদের যতটা দেখে, বাবাকে তার চেয়ে বেশি। বাবা বাড়ির কর্তা; সত্যি সত্যি বলছি, বাবা যে গায়ের রক্ত জল করে আমাদের খাওয়াচ্ছে পরাচ্ছে তা আমরা বুঝি। কিন্তু মা মাইরি অ্যায়সা করে যেন বাবার জন্যেই সব, মা ছাড়া বাবার আর কেউ নেই, মা-ই সব বোঝে, আমরা বুঝি না।...এই পার্সেলিটি আমার ভাল লাগে না। আমরা কি বানের জলে ভেসে এসেছি।" অভয় বলতে বলতে একটু থামল, সে যেন খানিকটা বিরক্ত, ক্ষুব্ধ। আবার বলল, "কাল মা'র সঙ্গে এক চোট হয়ে গিয়েছে।"

"লড়ে গিয়েছিস?"

"কেন লড়ব না!...খেতে বসে, রাত্তিরে বে, আমি আভা শোভা খাচ্ছি, মা সামনে বসে। পুজোর কেনাকাটার গল্প হচ্ছিল। শোভা আর আভা কি মাইরি একটা শাড়ি কিনবে বলল, তাতে মা'র মুখ হাঁ হয়ে গেল। এত দাম তত দাম, কে তোদের গেলাচ্ছে কোটাচ্ছে, কার ঘাড়ে দুটো দু' মনের পাথর ঝুলছে। —এইসব ফালতু বাত বলতে লাগল। আভা তো কচি খুকি নয়, বেশ বড় হয়েছে, বেচারীর খুব মনে লাগল। সে কেঁদে ফেলল। আমার মেজাজটা গেল খারাপ হয়ে। মাকে বললাম, নিজের কর্তার বেলায় তো পুজোয় কার্তিকের সাজ ধরলে আর ওর বেলায় পঁচিশটা টাকা বেশি হল। ব্যাস, এতেই মাইরি, মা ফায়ার। একেবারে পেট্রল-ফায়ার।...আরে, আমাদের মুখের কি ঠিক আছে, ফাট্ করে কার্তিক কথাটা বেরিয়ে গেল।...তারপর মাইরি, মা আমার যা করল কি বলব, শুনলে তুই শালা তাজ্জব বনে যাবি!..ফায়ারম্যানের বাচ্চা হয়ে লাইফটাই বরবাদ হয়ে গেল।"

বুলালি হাসবে, নাকি অভয়ের দুঃখে দুঃখী হবে বুঝতে পারল না। বলল "তুই মেসোমশাইকে ফায়ারম্যান বলিস কেন। মেসোমশাই তো ইনচার্জ..."

"ওই হল, ইঞ্জিনের বয়লার নিয়ে কারবার তো।...আসলে আমার মা হল ফায়ার, আর বাবা ম্যান। ফায়ারের ম্যান তো ওইজন্যে বলি।" বলে অভয় নিজেই কেমন হেসে উঠল।

বুলালি কেন যেন অপ্রস্তুত বোধ করল। বলল, "বাঃ, মাসিমা ভাল লোক।"

"তোদের কাছে ভাল। তোরা—তুই আর সূর্য মাকে খুব ভাল ভাল বলিস। বলবি না কেন, মা যে বাবা বাছা করে, নারকেলের সন্দেশ, কচুরি, চা-ফা খাওয়ায়: ব্যাস, শালা তাতেই ধন্য হয়ে গেছিস। আমার মা'র গর্ভে জন্মাতে হয়নি তো, তাহলে বুঝতিস ঠেলা!"

বুলালি অট্টহাস হেসে বলল, “দাড়া, আমি একদিন মাসিমাকে বলব।”

“বলিস। আমি আজকাল আর কিছু কেয়ার করি না।...একটা চান্স পাচ্ছি না। পেলেই কেটে পড়ব।”

“কোথায়?”

“জাহান্নামে।...আমার ঘেন্না ধরে গেছে শালার সংসারে।”

“যাবার আগে ঠিকানা দিয়ে যাস।”

“কেন?”

“আমাদেরও যেতে হবে।” বুলালি হাসল।

বুলালির হাসি দেখে অভয়ও হাসল। তারপর বলল, “তোকে সত্যি বলছি বুলালি, আমার আজকাল আর মায়াটায়া হয় না। কারও ওপরে নয়। আমি সাংঘাতিক সেলফিশ হব।”

বুলালি জবাব দিল না কথার; শালা অভয়টার মাথায় ছিট হচ্ছে দিন দিন!

নিত্য দিনের মতন সূর্য আর কৃপাময় নিউ কাফেতে বসে ছিল। বুলালি আর অভয় দুটো ক্রীম রোল খেতে খেতে ঢুকল। চেয়ার টেনে বসবার আগে বুলালি ঠোঙায় মোড়া আরও দু-তিনটে ক্রীম রোল সূর্যদের সামনে রেখে দিয়ে বলল, ‘নে, খা; জগাশালার দোকান থেকে এনেছি। বেশ টাটকা।”

কৃপাময় হাত বাড়িয়ে একটা ক্রীম রোল বের করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখল। তারপর অলসভাবে মুখে পুরে কামড় দিল।

সূর্য খানিকটা গম্ভীর, অন্যমনস্ক।

অভয় চেঁচিয়ে কেষ্টকে চা আনতে বলল। বলে কৃপাময়ের দিকে হাত বাড়াল। “দে, একটা সিগারেট দে।”

কৃপাময় বাঁ হাত পকেটে ঢুকিয়ে গোটা চারেক বিড়ি বের করে টেবিলের ওপর রাখল, কিছু বলল না, ক্রীম রোল চিবোচ্ছিল।

অভয় অবাক হয়ে বলল, “বিড়ি! বিড়ি কি বে?”

কৃপাময় উদাস গলায় জবাব দিল, “এখন থেকে বিড়ি...।”

“কেন?”

“আমার ব্যাংক বন্ধ হয়ে গেছে।” বলে সামান্য চুপ করে থেকে কৃপাময় যেন নিজের কথা সংশোধন করে বলল, “ব্যাংক ছেড়ে দিয়েছি।”

অভয়রা জানত, কৃপাময়ের ব্যাংক তার ছোটকাকি। এটাও জানত, কৃপাময় ছোটকাকিকে নিয়ে দেওঘর ঘুরে এসেছে। দেওঘরের গল্প কৃপাময় সবই করেছিল, ছোটকাকির মন্ত্র নেওয়া থেকে শুরু করে ট্রেনে একটা মেয়ের কান থেকে পোকা বের করে দেওয়া পর্যন্ত। ছোটকাকির দীক্ষা নেওয়াটা যে কৃপাময় পছন্দ করেনি, দেওঘরের গুরুদেবকে খুব ঠোক্কর মেরে এসেছে—এ-সব অবশ্য কৃপাময় বলেছিল; কিন্তু তারপর যে কি হয়েছে অভয়রা জানত না। ব্যাংক

[illegible] [illegible] মুখে অভয় সন্দেহ করল, কৃপাময়ের সঙ্গে ছোটকাকির ঝগড়াঝাটি কিছু হয়েছে। তা যদি হয়ে থাকে তবে শালা ডুবেছে।

অভয় বলল, "ছোটকাকির সঙ্গে ঝগড়া করেছিস?"

"না," কৃপাময় মাথা নাড়ল। "ঝগড়া-ফগড়া আমি করি না; বাড়িতে একেবারেই নয়। ছোটকাকির সঙ্গে ঝগড়া কবব কী. আমি একেবারে অ্যালুফ হয়ে গিয়েছি, কথাবার্তা বলছি না। লাস্ট দু' দিন একটাও টাকা চাইনি।"

"কেন?"

ভেবে দেখলাম, না চাওয়াই ভাল।.. নিজের তো কেউ না, কাকি। আজ ভাল মুখ করছে, কাল খারাপ মুখ করতে পারে। কি দরকার।"

কৃপাময় যে কথা ভাঙছে না অভয় বুঝতে পারল। অগত্যা সে একটা বিড়ি উঠিয়ে নিল। তার নাকমুখের ভঙ্গি খুব সুখকর দেখাচ্ছিল না।

সূর্য সামান্য বিরক্ত চোখে অভয়ের দিকে তাকিয়ে নিজেব সিগারেটেব প্যাকেটটা টেবিলের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিল। অভয় বিড়ি রেখে বিনা দ্বিধায় সিগারেটের প্যাকেটটা উঠিয়ে নিল।

বুলালি সূর্যকে বলল, "কি রে, তুই যে খাচ্ছিস না?"

সূর্য কাগজের ঠোঙাটা নাড়াচাড়া করে বলল, "ও আমি খাব না। দেখলেই শালা ঘেন্না করে।"

"তুই ক্রীম রোল আগে খেতিস না? খচড়ামি?"

"আগের কথা বাদ দে। এখন দেখলেই গা ঘিনঘিন করে।

"শালা! নে, খা।"

সূর্য যেন উপায় নেই দেখে একটা ক্রীম রোল বেব করে নিয়ে দেখল, অন্যদের দেখাল; তারপর বলল, "তুলসীব খবর শুনেছিস?"

"না, কি হয়েছে?"

"তুলসীকে পরশুদিন খুব পেঁদিয়েছে।"

"তুলসীকে!" অভয় আর বুলালি একসঙ্গে বলল। দুজনেই রীতিমত অবাক।

শেষে অভয় বলল "কে বলল তোকে?"

"হীরু। হীরুর সঙ্গে দেখা হল আজ, হীরু বলল।"

"তুলসীকে মারল কি রে?" বুলালি যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না "তুলসীর আছে কি যে মারবে! টিঙটিঙে চেহারা! মারলে ও শালা তো মরে যাবে।...কে মেরেছে।"

"ওর পাড়ার দিকের ক'টা ছোকরা।"

অভয় আরও যেন অবাক হয়ে বলল, "ইয়ের মতন বলছিস কেন—খোলসা করে বল। ব্যাপারটা কি?...মারল কেন?"

কৃপাময়ই একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিল। বলল · তুলসী যে-বাড়িতে থাকে তার বাইরের রোয়াকে বসে ক'টা ছোকরা রোজই মাতব্বরি করে। ঝাণ্ডা ওড়ায়।

মাঝে মাঝে ওরা ওখানে বসে তাসটাসও খেলত। তুলসী ওদের চেঁচামেচি হইচই সহ্য করতে পারত না। তবু চুপচাপ থাকত। দু-চারবার বলেছে মুখে, কেউ কোনো পাত্তা দেয়নি। শেষে, বদমায়শি করে একদিন, ওর ঘরের দেওয়ালে লম্বা চওড়া একটা পোস্টার সেঁটে দিল, তুলসী ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে। তারপরই পরশু সন্ধেবেলা তুলসীকে রাস্তায় ধরে ক'জনে মিলে মারধোর করেছে। তুলসী এখন বিছানায়।

বিবরণ শুনে একটু সময় বুলালিরা কেমন বিমূঢ় হয়ে বসে থাকল। আজকাল এই শহরে ঝান্ডাফান্ডা বেশ ওড়ানো হচ্ছে, তবে এ-রকম কিছু হয়নি। ভোটের সময় মারপিটটিট দু-চারটে হয়েছিল। দাঙ্গার একটা হুজুগেও খুব গরম হয়েছিল শহরটা। ঝান্ডাবাজীর বেশির ভাগটাই হয় খেলার মাঠে, ইঁট-পাটকেল ছোঁড়াছুঁড়ি, খিস্তি খেখিস্তি চলে· তবে একেবারে পাড়ার মধ্যে আজ পর্যন্ত কিছু হয়নি। অথচ তুলসীকে—ওইরকম নিরীহ, রুগ্ণ, অসহায় একটা ছেলেকে ঝান্ডাবাজরা মারল।

বুলালি সূর্যর দিকে তাকিয়ে রাগের গলায় বলল, "মগের মুলুক পেয়েছে শালারা নাকি?"

কৃপাময় জবাব দিল, "তা তো পেয়েইছে।

সূর্য খুব সংক্ষেপে বলল, "অনেকদিন হাত পা চালাইনি। মরচে ধরে যাচ্ছে। চল, আজ একবার সন্ধ্যেবেলায় হাত চালিয়ে আসি।"

চা এসেছিল। চা খেতে খেতে সূর্য বলল, "তোদের কতদিন ধরে বলছি চল একদিন তুলসীর কাছ থেকে ঘুরে আসি, তা তোরা আজ কাল করছিস।"

অভয় বলল, "বাঃ শালা! খুব পরের দোষ ধরছিস। আমি কতবার বলেছি, সেদিনও বললাম, তুই-ই তো ভেগে পড়লি।"

"গণাদার কাছে গিয়েছিলাম।"

"তোর লজ্জা নেই। গণাদা দেবে না, দিতে পারবে না—তবু তোর ওর কাছে যাওয়া চাই।"

"দেখছি।"

"ছেড়ে দে; ভাব, টাকাটা জলে গেছে।"

"জলের টাকা কিনা! মাছ শালা, জলে পয়দা হয়। আমাকে লেকচার ঝাড়িস না, অভয়। মারব শালা লাথি—টমটম ফাটিয়ে দেব।"

অভয় আর কিছু বলল না, বরং হাসল। সূর্যর সবতাতেই একগুঁয়েমি আছে। অসম্ভব জেদী। অভয়ের এখন রীতিমত সন্দেহ হয়, সূর্য গণাদার কাছে ঠিক কত টাকা পায়। আগে পঞ্চাশ-ষাট মনে হত, এখন তিন-চার দফা পাঁচ-দশ করে পাবার পরও যখন টাকা শোধ হচ্ছে না, তখন নিশ্চয় অন্য কোনো ব্যাপার আছে। সূর্য কি যমুনার গন্ধে গন্ধে ছুটছে, না রত্নার?

কৃপাময় চা খেতে খেতে সূর্যর একটা সিগারেট ধরাল, বলল—"তা হলে আজ সব যাচ্ছিস?"

মাথা নাড়ল সূর্য। "আলাবাত যাব।"

বুলালিও বলল, "যাব আজ; চল। আমাদের এটা অন্যায় হচ্ছে। হাজার হোক বন্ধু।"

অভয়ও মাথা হেলাল।

কৃপাময় সামান্য ভেবে বলল, "আমার একটা কথা আছে।"

ওরা কৃপাময়ের দিকে তাকাল।

কৃপাময় বলল, "মারপিট করতে আমি রাজী নই।"

"কেন?" সূর্য শুধলো।

"লড়ে কোনো লাভ নেই। বেপাড়ার ছেলে গিয়ে মারপিট করে আসব, তারপর তুলসীকে ওরা খুন জখম করে রাখবে, ওতে আমি নেই।"

কথাটা অন্য তিনজনে শুনল, কেউ কিছু বলল না।

চায়ের দোকান থেকে বেরোতে বেলা হল। সামান্য হেসে বুলালি বলল, "আমি একবার লুক স্টোর্সে যাব।"

"লুকে যাবি?" কৃপাময় অবাক।

বুলালি সঙ্গে সঙ্গে বলল, "বউদির একটা জিনিস কিনতে হবে।"

"তার জন্যে লুকে যাবি কেন?" অভয় বলল।

"ওখান থেকেই নেব, বউদি বলে দিয়েছে", বুলালি বলল, "তোরা চলে যা, আমি সূর্যকে নিয়ে ঘুরে আসি।"

কৃপাময় আর অভয় চলে গেল। বুলালি আর সূর্য সাইকেলে না চড়ে ছায়া ধরে ধরে বাজারের গা দিয়ে যেতে লাগল।

যেতে যেতে বুলালি বলল, "সূর্য, তোর সঙ্গে আমার একটা প্রাইভেট টক আছে।"

"কি?"

"এখন বলব না, পরে বলব।"

সূর্য বুলালিকে দেখল। বুলালির মুখে কথা, ঠোঁট খুলতে পারছে না। সূর্য বলল, 'বলে ফেল না!"

"না রে, এখন নয়।...পরে।"

"কি ব্যাপার নিয়ে তা বল..."

"তা বললেই তো সব বুঝে যাবি।" বুলালি হাসল, মৃদু হাসি। শেষে নিজে থেকেই বলল, "আজ একটা জিনিস হয়ে গেল। এর আগে একদিন হয় হয় করেও হয়নি, শুধু টাচ্..."

সূর্য ভাল বুঝল না, তবু তার কোনোরকম সন্দেহ ও কৌতূহল হল না। বলল, "টাচ্ কি রে, তুই তো..."

"টাচ্ আগে হয়েছিল; আজ...। না রে, এখন নয়; টাইমে বলব। যাক

একটা কথা, আমি যা কিনব, তুই কাউকে বলবি না। প্রমিস!"

"কি কিনবি?" সূর্য বেশ অবাক।

"একটা বই।...তুমি শালা কাউকে বলবে না।" বুললির কাছে বাড়ির টাকা ছিল।

"বই কিনতে লুকে যাবি কি রে, শালা। কমলা লাইব্রেরীতে চল।'

"দুঃ শালা, এ তোর অন্য বই।"

"কিসের?"

"চল না, দেখবি।"

সূর্য বুললির এত রহস্য বুঝছিল না। কিছু অনুমানও করতে পারছিল না! "তোর বউদির জন্যে লুকে কি বই আছে রে?"

"বউদির জন্যে নয়। ওদের এমনি বললাম!"

"কি বই? কারবারের?"

"ভাগ্ শালা। সে তো তোর কাছে আছে।"

সূর্য হাসল। বই তার কাছে নেই, দিদির আলমারিতে আছে। কোথা থেকে যে এসেছিল কে জানে। খান কয়েক আছে। সূর্য দুটো চুরি করেছিল। পরে আবার রেখে দিয়েছে। ছবিঅলাটা অবশ্য দেয়নি।

লুক স্টোর্সে পাওয়া যেত কিনা সে বিষয়ে বুললির একটু সন্দেহ ছিল। কিন্তু পাওয়া গেল। সোয়েটার ডিজাইনের একটা বই কিনল বুললি। আর অনেকক্ষণ থেকে ছেলেদের সাজানো খেলনার রাশি দেখতে দেখতে সূর্য হঠাৎ বুললির কাছ থেকে টাকা ধার করে একটা ছর্‌রা বন্দুক কিনল ছোকনুর জন্যে। ছোকনুকে সে আজ পর্যন্ত সেই খেলনাটা কিনে দিতে পারেনি। আজ দেবে। বন্দুক তাগ করে মারতে শেখাবে বেটাকে।

১১

সন্ধ্যেবেলা তুলসীর বাড়ি এসে ওরা দেখল, বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে তুলসী কি লিখছে, মাথার কাছে টুলের ওপর লণ্ঠন। রাস্তার দিকের জানালাটা খোলা। খোলা জানালা দিয়ে চার বন্ধু এ ওর ঘাড়ের পাশ দিয়ে উঁকি দিয়ে তুলসীকে দেখে নিল। তারপর ডাকল : তুলসী!

তুলসী বিছানা থেকে উঠে বসল। উঠে জানালার দিকে তাকাল।

সূর্য বলল, "কি রে, আমরা।"

"ও, তোরা! আয়। দরজা ভেজানো আছে।"

ফালি বারান্দায় সাইকেল রেখে চারজনে ঘরে এল। ঘরে এসে তুলসীকে ভাল করে দেখতে লাগল। ওরা যা ভেবে এসেছিল তেমন কিছু দেখতে পেল না। ওদের ধারণা হয়েছিল, এসে দেখবে তুলসী বিছানায় পড়ে কোঁকাচ্ছে, মুখ-চোখ ফোলা, এখানে ওখানে কেটে থেঁতলে কালচে হয়ে আছে। সেরকম কিছু দেখল না। শুধু গালের এক পাশে কালসিটে পড়ার ছোট একটু দাগ, এবং ডান চোখের ভুরুর পাশে টিঞ্চার বেঞ্জিনের একরত্তি তুলো দেখল।

বুলবুলি বলল, "কি রে, শুনলাম তোকে মেরে ময়দা করে দিয়েছে—।"

তুলসী বলল, "কে বলল?"

"হীরু", সূর্য জবাব দিল।

তুলসী হাসবার মতন মুখ করল। "ও একটা হয়েছিল। বোস।"

তুলসীর ঘরে আসবাব বলতে একটা দড়ির খাটিয়া, কেরোসিন কাঠের নড়বড়ে এক টুল, এক চিলতে পলকা একটা টেবিল। দেওয়ালের এক কোণে দড়ি টাঙানো, ধুতি গামছা ঝুলছে, পেরেকে টাঙানো জামা।

ঘরটা খুবই ছোট। মাথার ওপর টালির ছাদ, তলায় চটের সিলিং। ঘরের মধ্যে ধুলো, নোংরা, বিড়ি সিগারেটের টুকরো, দেশলাইয়ের কাঠি, ছেঁড়াখোঁড়া কাগজের অন্ত নেই। টেবিলে এবং এদিক ওদিকে বই, কাগজ, একটা শিশি, এটা-সেটা অগোছালো নোংরা হয়ে পড়ে আছে।

দড়ির খাটিয়ায় চারজনে এসে বসল। তুলসী তার লেখার খাতা, ফাউন্টেন পেন সরিয়ে রাখল, রেখে সরে বসে ওদের বসবার জায়গা করে দিল।

কৃপাময় বলল, "কেমন আছিস এখন?"

তুলসী হাসিমুখে বলল, "দেখতেই পাচ্ছিস।"

সূর্য বাঁ হাত বাড়িয়ে লণ্ঠনটা তুলে নিয়ে তুলসীর মুখের দিকে আনল। "কই দেখি, তোর মুখটা দেখি।"

তুলসী যেন লজ্জা পেল, বলল, "যাঃ, রেখে দে। লণ্ঠনটা বিক্ করে গায়ে তেল পড়বে।"

সূর্য অভয় বুলালি কৃপাময় চারজনেই তুলসীর মুখটা দেখে নিল।

অভয় বলল, "কি হয়েছিল রে?"

তুলসী যেন ভাবল, কি জবাব দেবে। পরে বলল, "তেমন কিছু নয়। ওই কথা-কাটাকাটি।"

"তাতেই তোকে মারল!" অভয় মারার সঙ্গত কারণ খুঁজে না পেয়ে কথাটা বিশ্বাসই করল না।

তুলসী যেন জেরার সামনে কৈফিয়ত দিচ্ছে, দুর্বল গলায় বলল, "মেরেছে মানে কি, রাগারাগির সময় টানাহেঁচড়া করতে গিয়ে জামাটা ছিঁড়ে গিয়েছিল, আর আমার মুখে একটু লেগেছে।"

সূর্য বিশ্বাস করল না, বরং রীতিমত রেগেই বলল, "তোর এইসব মাগীগিরি ছাড়। কিছু না হলে তোর গালে চুমু খেলেই পারত, ঘুঁষি ঝাড়বে কেন? বাকতল্লা মারিস না, কি হয়েছে সেরেফ বল। আমরা শালা মরে যাইনি। তোর গায়ে যারা হাত তুলেছে সেই হারামীদের আমি দেখতে চাই।"

তুলসী বোধহয় আবহাওয়াটা অনুভব করতে পারছিল। সূর্যকে রীতিমত ভয় তার, বুলালিকেও। সূর্য বরাবরই বেপরোয়া, মারপিট করতে তাব বাধবে না, বুলালি আরও সাংঘাতিক, রেগে গেলে তার কাণ্ডজ্ঞান একেবারেই থাকে না। সে সব কিছু করতে পারে। তুলসী বেশ সন্ত্রস্ত বোধ করল। সে কোনো হাঙ্গামা বাধাতে চায় না।

ভেবেচিন্তে তুলসী বলল, "বোস না, অত মাথা গরম করছিস কেন।. দাঁড়া, চায়ের কথা বলে আসি, পাশেই একটা তেলেভাজার দোকানে ফার্স্ট ক্লাশ চা করে।" বলতে বলতে তুলসী উঠে পড়ল।

তুলসী চলে গেলে তার দড়ির খাটিয়ার চার বন্ধু আরও একটু এলোমেলো হয়ে বসল। কৃপাময় প্রায় আধশোয়া, অভয় কৃপাময়ের কাঁধেব ওপর ঝুঁকে আছে। সূর্য বুলালির কাছে সিগারেট চাইল। এপাড়ার আর শহরের মধ্যে একটা সীমারেখা আছে, রেললাইন· রেললাইনেব ওপাশ থেকে শহরের শুরু, আর এপাশে বাড়তি শহরের জঞ্জালের মতন ঘবদোর, পথঘাট, মানুষজন।

কৃপাময় বলল, "তুলসীর চেহারাটা সত্যিই খুব খারাপ হয়ে গেছে রে। আরও রোগা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।"

"ব্লাডলেস!" সূর্য বলল। "বলেছিলাম না মাছের মতন সাদা হয়ে গেছে। এখন আরও খারাপ।"

"টি বি-ফিবি হয়েছে নাকি রে?" অভয় বলল।

"হতে পারে", বুলালি উদাস গলায় জবাব দিল, "হলে খরচের খাতায়.."

কৃপাময় হাত বাড়িয়ে তুলসীর লেখা খাতাখানা উঠিয়ে নিল। একটা সস্তা চটি এক্সারসাইজ বুক। কৃপাময় ভেবেছিল, তুলসী কিছু লিখছিল, খাতা খুলে দেখল, চিঠি—চিঠি লিখছিল তুলসী। লণ্ঠনের আলোয় চিঠির দু-চারটে লাইন পড়ে খাতাটা আবার ফেলে দিল কৃপাময়।

সূর্য কি ভেবে হঠাৎ বলল, "কৃপা, তুলসীটাকে এখান থেকে চ্যাঙদোলা করে উঠিয়ে নিয়ে গেলে কেমন হয়?"

"কোথায় নিয়ে যাবি?"

"কেন, ওর বাড়িতে।"

"বাড়িতে ও যাবে না। বাড়িতে থাকতে পারলে এখানে কি জন্যে আসবে!"

"তবু ওটা ওর বাড়ি। ওর এক্তিয়ার আছে থাকবার।" সূর্য জোর দিয়ে বলল, "এখানে থাকলে শালা মরে যাবে।"

কৃপাময় নিস্পৃহ গলায় বলল, "বলে দেখ। ওই কাঠির মতন দেখতে হলে কি হবে, শালার তেজ তো খুব।"

তুলসীর স্বাস্থ্য বলতে কিছু নেই, রোগা কয়েকটা হাড় ফরসা চামড়া, মাঝারি একটা মাথা, ছোট মতন মুখ। মাথায় বেশ খাটো বলে ওর এই রুগণ চেহারাটা অতটা চোখে লাগত না আগে, এখন স্বাস্থ্য আরও নষ্ট হয়ে যাওয়ায় চোখে পড়ে। নিরীহ, শান্ত, শিষ্ট হলেও তুলসীর চরিত্রে কেমন একটা বাঁকা ভাব আছে। না বললে আর হ্যাঁ করানো যায় না। আর ওর এই না এবং হ্যাঁ-র মধ্যে অদ্ভুত একটা খেয়াল কাজ করে। তুলসীর চোখের দিকে তাকালে তার অসম্ভব এলোমেলো, কল্পনাপ্রবণ, ছেলেমানুষী দৃষ্টিও যেমন চোখে পড়ে, সেইরকম ওর চরিত্রের অস্থিরতা, প্রচণ্ড বিস্ময় বোধ ও অপছন্দর মনোভাবও বোঝা যায়।

তুলসী ফিরে এল। হাতে শালপাতায় সদ্যোভাজা আলুর চপ। বন্ধুদের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'নে, খা। গরম ভাজছিল।"

অভয় প্রায় কৃপাময়ের ওপর দিয়ে ঝাঁপিয়ে হাত বাড়িয়ে আলুর চপ তুলে নিল। ভীষণ গরম; হাত পুড়ে যায়। চপটা তুলে কৃপাময়ের গালের ওপরই ফেলে দিল। কৃপাময় লাফিয়ে উঠে বসল। অভয় হাসতে লাগল। বলল, "বড্ড গরম মাইরি, পড়ে গেল!"

কৃপাময় তেড়ে উঠল, "পিঁয়াজী হচ্ছে, শালা! পড়ে গেল!"

ঝুলালি জোরে হেসে উঠল। সূর্যও হাসল। কৃপাময়, অভয়, তুলসীও হাসতে লাগল।

হাসির দমকে ঘরের মধ্যে বোধহয় হালকা ভাব নামল। চপ খেতে খেতে সূর্য বলল, "ব্যাপারটা কি, এবার ঝটপট বলে ফেল।"

তুলসী যা বলল তার মর্ম এইরকম: এই পাড়ায় একটা ইউনিয়ন অফিস হয়েছে আজ মাস কয়েক হল। অফিসটা বেশির ভাগ দিনই বন্ধ থাকে, মাঝে মাঝে সন্ধ্যেবেলায় লণ্ঠন জেবলে দু-চারজন এসে বসে, বিড়ি-টিড়ি খায়, গল্প-

গুজব করে। ইদানীং ধাঙ্গুরিয়ার দিকে যে ফায়ার ব্রিকসের কারখানা রয়েছে, সেখানে একটা গণ্ডগোল চলছে। দুটো দল হয়েছে সেখানে; একটা দল তার লোকজন নিয়ে ইউনিয়ন অফিসে বসে মিটিং-ফিটিং করছে। অন্য দলও একটা ঘর ভাড়ার জন্যে এই বাড়ির বাড়িউলীকে ধরেছিল। বাড়িউলী রাজী হয়নি। ওর একটা সোমত্ত ভাইঝি আছে, স্বভাবটভাবও তেমন ভাল নয়। একে সেই ভাইঝি, তার ওপর যত কারখানার ছোঁড়া এসে হল্লা করবে এই ভয়ে সে বাড়ি দিতে নারাজ। ঘর অবশ্য আছে একটা, ভেতরের দিকটায়। তুলসীকে ভেতরে পাঠিয়ে রাস্তার দিকের এই ঘরটা তারা ভাড়া নেয় এই তাদের মতলব ছিল। তুলসী রাজী হয়নি। ভাড়া না পেয়ে বাড়িউলীর ওপর তারা রেগে আছে। বাড়িউলীকে জব্দ করার জন্যেই বোধহয় কয়েকটা ছোঁড়াকে তুলসীর ঘরের বারান্দায় বসে হল্লা করতে উসকে দিয়েছিল। তা ইদানীং প্রায় রোজই ছোঁড়া-গুলো বসে হল্লা করত, ফায়ার ব্রিকসের পাল্টা ইউনিয়নের লোক, বাবুটাবু গেলে গালাগাল দিত, খিস্তি খেখিস্তি করত। তুলসী কয়েকবার তাদের বারণ করেছে, বলেছে এভাবে অন্য লোকের বাড়ির রোয়াকে বসে হইচই করলে বাড়ির লোকের অসুবিধে হয়। কথাটা তারা কানে নিত না, তামাশা করত। সেদিন কোথা থেকে, এক পোস্টার এনে সেঁটে দিল· চেটাইয়ের ওপর আঁটা এক জঘন্য ছবি, আর খেউড়-পদ্য। বাড়ির বারান্দার সামনে টাঙাতে বাড়িউলী বারণ করেছিল, শোনেনি। তুলসী সেটা খুলে রাস্তায় ফেলে দিয়েছিল। এই নিয়ে কথা কাটাকাটি, তুলসী রাগের মাথায় বলেছিল, বেশি গোলমাল করলে সে থানায় যাবে; বড় দারোগা তার চেনা, নিজের লোক। তখন অবশ্য ওরা আর হাঙ্গামা করেনি, কিন্তু পরের দিন সন্ধ্যেবেলা তুলসী বাড়ি আসার সময়—রেল টানেলের কাছে—একজন সাইকেলে চড়ে এসে তাকে ধাক্কা মারে। আশে-পাশে আরও ক'টা ছিল। ঝগড়া লাগিয়ে দিয়ে চড়চাপড় মেরেছে, জামাটামা ছিঁড়ে দিয়েছে। পরে অবশ্য পাল্টা ইউনিয়নের লোক এসে বলে গেছে, তাদের কেউ একাজ করেনি; কয়েকটা গুণ্ডা গোছের ছেলে করেছে; থানায় ডায়রি করে দিন।

পাশের দোকান থেকে মগে করে চা আর খুরি নিয়ে এসেছিল একটা ছোকরা; চা দিয়ে চলে গেল। ওরা চা খেতে লাগল।

সূর্য বলল, "কারা তোকে মেরেছিল, তুই তাদের চিনিস না?"

"চিনি", তুলসী বলল, "গোটা চার পাঁচ ছিল। তার মধ্যে দুটো এখানে রোজ বসত। বাকিগুলোকে দেখেছি, কোথায় থাকে চিনি না।"

সূর্য বুলালির দিকে তাকাল। তার ইচ্ছে, বুলালির মতামতটা শোনে।

বুলালি বলল, "কোথায় থাকে? কাছাকাছি?"

তুলসী এবার আর স্পষ্ট কিছু জবাব দিল না। বরং বলল, "যা হবার হয়ে গেছে; আবার হাঙ্গামা করে লাভ কি?"

সূর্য ধমকে উঠল, "কেন রে! হাঙ্গামা করব না কেন?...যে শালারা

মেরেছে তারা বাপের বেটার মতন একবার আমাদের সামনে আসুক।"

তুলসী সূর্যর ধমক খেয়ে আরও ম্রিয়মাণ হয়ে গেল। একটু সময় কথা বলতে পারল না। চা খেয়ে গলা ভিজিয়ে শেষে বলল, "আমারই একটু দোষ হয়ে গিয়েছিল। ওই যে বুলালির বাবার কথা, মানে বড় দারোগার কথা বলে শাসিয়েছিলাম, তাতেই ওরা আরও খাপ্পা হয়ে গিয়েছিল। আজকাল দারোগা পুলিসের কথায় সবাই খেপে যায়।"

বুলালি অদ্ভুত ধরনের হুঙ্কার দিল, বলল, "বাঃ, রাস্তায় লোক ধরে মারবে আর পুলিসের কথায় খেপেও যাবে!"

তুলসী চুপ। তার যেন বলার কিছু নেই আর।

সূর্য বলল, "আমরা পুলিস নই; আমাদের নিয়ে চল, দেখি সে শালাদের কত বড় কলজে।"

বুলালি বলল, "তুই শালা বাবার কাছে গেলি না কেন? বলেছিলি যখন তখন চলে গেলেই পারতিস।"

তুলসী চায়ের খুরি নামিয়ে রেখে বুলালির প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট নিয়ে ধরাল। পরে বলল, "মুশকিল কি জানিস, এ দিকটায় অনেক মালগাড়ি-ভাঙা ছেলে-ছোকরা হয়েছে, তাদের কোনো ভালোমন্দের বালাই নেই, অ্যাপ্রেন-টিস গুণ্ডা, লেলিয়ে দিলেই লেগে যায়।" বলে তুলসী হাসল।

সূর্য ভুরু কুঁচকে বলল, "আমরাও গুণ্ডা", বলে যেন নিজের গুণ্ডামি প্রমাণ করার জন্যে পকেটে হাত দিয়ে হঠাৎ একটা কি বের করে কল টিপতেই ছুরির ফলা বেরিয়ে এল। ছুরিটা সূর্য এমনভাবে মুঠোয় ধরল যেন অতি অক্লেশে এটা সে যে-কোনো মানুষের বুকে পেটে বসিয়ে দিতে পারে।

ছুরি দেখে তুলসী বোধহয় ভয় পেয়ে গেল। ফ্যাকাশে মুখ আরও ফ্যাকাশে দেখাল।

কৃপাময়, অভয়, বুলালি কেউই জানত না সূর্য পকেটে করে ছুরি এনেছে। ওরাও ছুরিটা দেখছিল। প্রায় বিঘতখানেক লম্বা ছুরি, চকচক করছে। ফলায় ধার আছে কিনা বোঝা যায় না, তবে সন্দেহ হয়—আছে।

কৃপাময় কয়েক পলক সূর্যর দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "দেখি বে।"

সূর্য কৃপাময়কে ঠাট্টাচ্ছলে ভয় দেখিয়ে ছুরিটা দেখতে দিল। কৃপাময় দেখল; কৃপাময়ের হাত থেকেই বুলালি আর অভয় দেখল। ছুরিটা বিলিতী বোধহয়, খাপের পাশগুলো হাড়ের, ভাল ইস্পাত, কোথাও মরচে ধরেনি। ধার মরে গেছে, তবে আছে। বেশ জমকালো ছুরি। ভারী বেশ।

ছুরিটা দেখতে দেখতে কৃপাময় সেটা বন্ধ করে ফেলল। বলল, "এটা কোথায় পেলি?"

কোথায় পেয়েছে সূর্য স্পষ্ট বলল না। শুধু বলল, "ছিল।"

কৃপাময় ছুরিটা ফেরত দিল না। "আমি তোদের আগেই বলে দিয়েছি, মারপিটে আমি নেই। গোলমাল করে আমরা কেটে পড়ব. তারপর তুলসীকে

ও বেটারা আরেক দিন ধরবে ; ধরে মেরে লাট করে লাইনের নালায় ফেলে দেবে। মাথা গরম করে কাজ একটা করলেই হল না। তুলসীকে এখান থেকে সরা আগে, তারপর নে চল, লড়ে আসি।"

কৃপাময়ের কথায় তুলসী ভরসা পেল। বলল, "না না, মারপিট করে লাভ নেই ; যা হবার হয়ে গেছে, এখন আর ওরা এদিকে আসছে না। পরে যদি আবার কিছু করে তখন..."

সূর্যর যদিও এভাবে পিছু হটে যাওয়া মনঃপুত নয়, তবু সে খানিকটা গালিগালাজ করে শান্ত হল। অবশ্য এটা ঠিক যে, সূর্য বা কুলাদি সত্যি সত্যি মারপিট করতে নামত না আজ। কেননা, ঘটনাটা বাসী হয়ে গেছে, মারপিট করার মতন গরম হতে তাত লাগবে। তবু সূর্যর ইচ্ছে ছিল যথাস্থানে একবার শাসিয়ে যাবে। যাওয়া দরকার। যদি তাতে গরম হয়ে যেতে পারে তখন লেগে যাবে। সোজা কথা, সুযরা কোনদিন এদিকে আধিপত্য বিস্তার করতে আসেনি। তাদের যে একটা দাপট আছে সেটা এরা জানে না। এবার তাদের জানানো দরকার যে সূর্যরা আছে, বেশ জলজ্যান্ত ভাবেই আছে, এই শহরে তাদের বন্ধুর গায়ে হাত তোলার সাহস দেখালে পরিণাম খারাপ হবে।

ছুরিটা ফেরত নিয়ে সূর্য পকেটে রাখল।

তারপর অন্য প্রসঙ্গ এল। তুলসীর শরীরের কথা; বাড়ি ফিরে যাবার কথা। তুলসী বাড়ি ফিরে যেতে রাজী না। বলল, "এখানে ভালই আছি। বাড়ি আমার ভাল লাগে না। অশান্তি করার চেয়ে সরে থাকা ভাল।"

কৃপাময় বলল, "তা হলে থাক পড়ে, মরবার সময় একটা খবর দিস আসব।"

তুলসী হাসল, অন্যরাও হাসল সামান্য।

কিছুটা চুপচাপ। চটের সিলিংয়ের আড়াল থেকে টিকটিকি ডাকল, দূরে রেল লাইনে একটা এঞ্জিন অনেকক্ষণ থেকে সান্টিং করছিল, তার শব্দ ভেসে আসছে, অদ্ভুত এক জন্তুর মতন মাঝে মাঝে তেড়ে এসে ডাকছে, ডেকে আবার চুপ যেন ; ঝিঁঝি ডাকছিল চারপাশে, অস্পষ্ট একটা গলা শোনা যাচ্ছিল বাড়ির ভেতর থেকে।

চুপচাপ থাকতে থাকতে তুলসী হঠাৎ বলল, "কাল পোস্ট অফিসে যাব একবার, তোরা কোথায় থাকবি?"

"কখন?"

"এই ধর—বেলার দিকে, দশটা নাগাদ।"

"চায়ের দোকানে থাকব, চলে আসিস।"

"যাব।"

পোস্টাফিসের কথায় কৃপাময়ের চিঠির কথা মনে পড়ল। বলল, "কাকে অত কড়া করে চিঠি লিখছিলি রে?"

তুলসী কৃপাময়ের দিকে তাকাল। তার চিঠি কৃপাময় দেখেছে নাকি?

তুলসী বলল, "কলকাতার একজনকে, চেনাশোনা ছিল।"

"তোর বন্ধু নাকি?"

"না", তুলসী মাথা নাড়ল, "আমার বন্ধু কেন হবে, কবি লোক।"

"কবি।...আরে শালা তবে তো তোর বন্ধুই।" অভয় হেসে বলল।

তুলসী হাসিমুখ করল, কোন জবাব দিল না। দড়ির খাটিয়ায় পাঁচজন গায়ে গায়ে, এ ওর পিঠে, ও এর পেটে হেলে ঝুঁকে শুয়ে বসে আছে। চা খাওয়া শেষ। সিগারেট ফুরিয়ে আসায় শেয়ার চলছিল, একজনের হাত থেকে অন্যজন কেড়ে নিয়ে টানছিল। লণ্ঠনের আলোটা লালচে হয়ে জ্বলছে; ঘরের মধ্যে আলো কম, অন্ধকারই বেশী, বাইরে জ্যোৎস্না, ঢাকা বারান্দার জন্যে জানালা দিয়ে জ্যোৎস্না আসতে পারছে না। খুব ঘনিষ্ঠ, অন্তরঙ্গ, গভীর হয়ে পাঁচ বন্ধু জড়াজড়ি করে বিছানায় বসে, দড়ির খাটিয়াটা ঝুলে গেছে।

তুলসী বলল, "মানুষ যে কিরকম হয় বুঝি না। আমার কাছ থেকে পঁচিশটা টাকা নিয়েছিল, আজ পর্যন্ত ফেরত দিল না।"

"গণাদা", সূর্য সঙ্গে সঙ্গে বলল, "ও গণদার টাইপ্।"

মাথা নাড়ল তুলসী! বলল, "যাঃ, গণাদা কেন হবে!" গণাদা সম্পর্কে সূর্য কেন যে এ রকম একটা কথা বলল তা নিয়ে ভাবল না তুলসী, কলকাতার কথা ভাবছিল, বলল, "এসব জিনিস তোরা দেখিসনি।"

"কলকাতার মাল!" বুলালি বলল।

"ঠিক কলকাতার মালও নয়, অন্য জিনিস।"

"তবে মালপো—" কৃপাময় হেসে বলল।

ওরা হাসল সমস্বরে। তুলসী বলল, "টাকা ফেরত পাবার জন্যে আমি চিঠি লিখি না। এতদিন পরে পঁচিশটা টাকার জন্যে কে চিঠি লেখে রে! দু' বছর হতে চলল। ইচ্ছে করেই লিখি, পারপাসলি।"

কৃপাময় বলল, "তোর কী বুদ্ধি রে তুলসী! আরও পঁচিশ টাকা চিঠিতেই যাবে।"

তুলসী বলল, "যাক। আমি ওকে বার বার মনে করিয়ে দেব, ও ধাপ্পাবাজ, চিট, ডিসঅনেস্ট।"

"তুই শালা দামড়া", সূর্য বলল।

তুলসী কৃপাময়ের পেটে মাথা দিয়ে সূর্যর পায়ের ওপর দিয়ে পা চালিয়ে শুয়ে পড়ল। চটের কালচে অন্ধকার সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলল, "পঁচিশটা টাকা কিভাবে দিয়েছিলাম জানিস! ঘড়ি বেচে। সেই কলেজ থেকে টাকা পেয়ে যেটা কিনে ছিলাম।"

"দিলি কেন?"

'দেব না! বলল, খুব বিপদ; মা'র বড় অপারেশন, রক্ত কিনতে হবে। তখন তো শুনেছিলাম ও-রকম কবি বাংলাদেশে আর জন্মায়নি। সাংঘাতিক ট্যালেণ্ট। ট্যালেণ্টের বিপদের জন্যে পঁচিশটা টাকা দিতে পেরে ইণ্টিটাক বুক

ফ্লে গিয়েছিল।

তুলসীর কথার পরিহাসে ওরা খুব একটা হাসল না। এসব ওরা বোঝে না, জানে না। তুলসীর মুখেই যা গল্প শোনে। তবে গল্পগুলো শুনতে মন্দ লাগে না।

অভয় বলল, "চিঠিতে হবে না রে, তোর কলকাতার ফ্রেন্ডকে এখানে নেমন্তন্ন করে নিয়ে আয়, চেহারাটা একবার দেখি।"

তুলসী পাতলা করে হাসল। বলল, "চেহারা দেখে কি করবি। চেহারা বানানো যায়, আজকাল চেহারা বানাতে তিরিশ চল্লিশ টাকা খরচ, দরজির দোকানে গেলেই বানিয়ে দেবে, না হয় রেডিমেড দোকানে আর সেলুনে যা।"

কৃপাময় হেসে বলল, "সূর্য শালা যেমন বানায়, বুলালিও।"

সূর্য কৃপাময়ের পেছনে হাঁটু দিয়ে গুঁতো মারল।

বুলালি শুয়ে শুয়ে শেষ সিগারেটটা ধরাল।

তুলসী বলল, "চরিত্র, এ-রকম চরিত্র ভাই আমি দেখিনি। আমরা মফস্বলের

"কত টাকায় ক্যারেকটার হয় রে? কলকাতার তোর ফ্রেন্ডদের ক্যারেকটার?"

দেখিনি।..."

"কত টাকায় ক্যারেকটার হয় রে? কলকাতার তোর ফ্রেন্ডদের ক্যারেকটার? কৃপাময় শুধলো।

তুলসী প্রথমে জবাব দিল না, পরে বলল, "তাও হয়। বিলেতি মাল খাওয়ালে একরকম হয়, দিশী খাওয়ালে একরকম হয়, কবিতা গল্প ছেপে দিলে আর-একরকম হয়, বেশ্যাবাড়ি নিয়ে গেলেও—"

"আরে, ব্যাস! কত রকম ক্যারেকটার রে! রাজকাপুরের সিনেমা বল।" সূর্য বলল।

ওরা দমকে হাসল। তুলসীও হাসল। বলল, "একজনকে আমি জানি, তার ছ'রকম গলার স্বর। আপন্ম ভয়েস কন্ট্রোল প্র্যাকটিস করেছে। কোনো পুরনো নামকরা কবির বাড়ি গেলে গলার ভয়েস হিজ মাস্টার্স ভয়েস, সাহিত্যিকের দাদার কাছে গেলে, মাইরি বলছি একেবারে তেলাতেলা, কবিতা পাঠ করার সময় নাদ ওঠে, মালখানায় রিয়েল ভয়েস, মেয়েদের কাছে বাটা শু"

বুলালি অধৈর্য হয়ে বাধা দিল, "তার ক'টা ফুটো রে?"

সূর্য প্রচণ্ড জোরে হেসে উঠল। অভয় এবং কৃপাময়ও হাসতে লাগল। তুলসী হাসতে হাসতে বলল, "তার একলার কেন, বেশির ভাগেরই ওই রকম। জায়গা বুঝে বাঁশি বাজায়।"

অভয় কি যেন একটা বলল।

তুলসী কোনো জবাব দিল না কথার। বুলালির হাত থেকে আধ-খাওয়া সিগারেটটা নিয়ে ঠোঁটে ঠেকিয়ে চুপ করে শুয়ে থাকল। সহসা যে নীরবতা সৃষ্টি হল সেই নীরবতার পাঁচজনের হৃৎপিণ্ড যেন মুহূর্ত একসঙ্গে বেজে আবার বিচ্ছিন্ন হল।

অভয় বলল, "এখন ক'টা টিউশানি করছিস?"
"তিনটে। সকালে একটা; সন্ধ্যেবেলা দুটো।"
"টাকা পয়সা দিচ্ছে ঠিকমতন?"
"দিচ্ছে।"
"এখানে বাড়িউলীর কাছেই খাচ্ছিস এখনও? কি খাওয়ায় রে? শরীর তো বাতাস করে দিয়েছিস।"
"পেটের গোলমাল—"
"পেটের নয়, মাথার।"
তুলসী ম্লান হাসল।
সূর্য বলল, "রোজ একটু করে মাল খা...। তোদের এখানে তো আছে একটা।"
"খেতে ভাল লাগে না।"
"লাগবে, আস্তে আস্তে লাগবে। আমাদের কাছে আয়, তোকে পিনাকির দোকানে নিয়ে যাব। পিনাকির খুব পয়া আছে, একবার গেলে আর কাটাতে পারবি না।"
তুলসী কোনো কথা বলল না। শুয়ে শুয়ে আরও কিছুক্ষণ কাটল, দু-চারটে ছোটখাটো কথা হল, তারপর সূর্য মস্ত একটা হাঁপ ছেড়ে উঠল, বলল, "নে ওঠ বুলালি। চল কৃপা।"
কৃপাময়রাও একে একে হাই তুলে উঠল। রাত হয়ে আসছে। সাড়ে আটটা প্রায়।
বাইরে এসে সাইকেল নিতে নিতে সূর্য বলল, "কাল চায়ের দোকানে আসছিস তো?"
"আসব।"
"আসিস। আমরা থাকব।"
"তুই আমাদের দিকে যাওয়া একেবারেই ছেড়ে দিয়েছিস। দেখাটেখাই হয় না। মাঝে মাঝে আসিস না কেন!" কৃপাময় বলল, "আমাদের ওদিকে গেলে তোর ভালই লাগবে। আসিস। বুঝলি।"
"দেখি, সময় কই। সন্ধ্যেটা টিউশানি করে কাটে।"
"রোববার আসবি", বুলালি বলল, "কত খবর আছে, শুনবি।...শোন, এই ব্যাপারটার কথা বাবাকে আমি কিছু বলব?"
"না, না।"
"বেশ।...পরে কিছু হলেই আমাদের খবর দিবি।...পড়ে পড়ে মার খেলে কেউ তোকে দয়া দেখাবে না। এই দুনিয়াটা যীশুখৃষ্টের নয় রে শালা। সোজার সঙ্গে সোজা, বেঁকলেই পেটে লাথি, ব্যাস, সব ঠিক থাকবে।"
অভয় একেবারে শেষে গেল, যাবার আগে তুলসীর কাঁধে হাত রেখে বলল, "চলি রে। আমি আরেকু দিন আসব।" বলে গলার স্বর নীচ করে বলল, "উমা

মাঝে মাঝে তোর কথা জিজ্ঞেস করে।" উমা অভয়দের পাড়ার মেয়ে, [illegible] থাকে প্রায়, হালে মেয়ে স্কুলে মাস্টারী করছে। ছেলেবেলা থেকেই অভয়-তুলসী-দের সঙ্গে উমার পরিচয়, বন্ধুর মতন। তুলসীর ওপর উমার টান ছিল বরাবর। "একদিন বাড়িতে আয় না। মাও তোর কথা বলে।" অভয় বলল।

"যাব", অস্পষ্ট করে তুলসী বলল।

সাইকেল রাস্তায় নামিয়ে নিয়েছে ওরা; বারান্দাটা বেশ উঁচু, তুলসী দাঁড়িয়ে থাকল। ওরা সাইকেলে উঠল, চার গলায় চার রকম স্বর উঠল: 'চলি রে', তারপর জ্যোৎস্নার আলো দিয়ে সাইকেলগুলো চলে গেল।

সামনে রাস্তা, রাস্তার ওপারে পড়ো জমি খানিকটা, পাশ দিয়ে নালা, নালার গায়ে গায়ে বালিয়াড়ির মতন টানা উঁচু জমি, ইট দিয়ে বাঁধানো, ওপর দিয়ে রেল লাইন চলে গেছে, কাছেই স্টেশন, রেল লাইনের ফাঁকে ফাঁকে মস্ত উঁচু বাতি, আলোগুলো শূন্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে জ্বলছে, মাথার ওপর সাদাটে আকাশ, চাঁদ উঠে রয়েছে। কয়লার গুঁড়ো, ধোঁয়ার গন্ধ, রেল লাইনের ঢালু জমিতে জন্মানো বনতুলসীর গাঢ় গন্ধ—এবং সামান্য দূর থেকে ভাটিখানার গন্ধও যেন এখানের বাতাসে মেশানো।

তুলসী বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বন্ধুদের চলে যেতে দেখে, রেল লাইন, আলো ও আকাশ দেখে শেষে চাঁদ দেখছিল। আজ কি তিথি কে জানে!

সামান্য সময় চাঁদ এবং আকাশ দেখার পর তুলসী নিশ্বাস ফেলল। ওই আকাশ ও ভালবাসত, ওই যে ওপাশে কয়েকটা নক্ষত্র, ওই নক্ষত্র তুলসী কতদিন মন দিয়ে দেখার চেষ্টা করেছে। আজ আর আকাশ, নক্ষত্র, চাঁদ—কিছুই বড় খেয়াল করে দেখে না।

ছেলেবেলা থেকে যে তার আকাশের ওপর একটা স্বতন্ত্র টান ছিল তা নয়, অন্য পাঁচজনের মতনই সে মাথার ওপর আকাশটাকে রোদে জলে দিনে রাত্রে দেখেছে। সে কাচের ভাঙা টুকরোতে ভুসো মাখিয়ে ছেলেবেলায় সূর্যগ্রহণ দেখার সময়ও জানত না, ওই আকাশ একদিন তার আকর্ষণের বস্তু হয়ে উঠবে। মা মারা যাবার পর সে আকাশের দিকে তাকায়নি, বরং কোথাও বেশি ধোঁয়া দেখলে তার বুক ধকধক করত, মনে হত কেরাসিন তেলের গন্ধ পাচ্ছে; সে উনুন দেখত। অথচ একদিন বেশ বড় হয়ে, স্কুলের উঁচু ক্লাসে পড়ার সময় আকাশের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ সে অনুভব করল, দূরান্তরের নক্ষত্রগুলি যেন তার দিকে তাকিয়ে আছে। ওটা কিছু নয়, কিছুই না। তবু সে ভয় পেয়েছিল এবং বিস্ময় বোধ করছিল। আলো যে তাকাতে পারে না এ-জ্ঞান তুলসীর ছিল, কিন্তু এত আলো এমন করে কেন জ্বলে, কে জ্বালায়, কতকাল ধরে জ্বলছে, কবে নিববে, এই অদ্ভুত এক চিন্তা তার মাথায় এল। তখন থেকেই আকাশ আর নিছক আকাশ থাকল না, কেমন একটা রহস্য ও আকর্ষণের বিষয় হল তুলসীর। ওই বয়সেই দু-চারটে বই, যা স্কুলের লাইব্রেরীতে পাওয়া যেত, তুলসী পড়ে নিয়েছিল। পাড় অঙ্ক। তারপর কলেজ। কলেজে পড়ার সময় থেকেই তুলসীর

ইচ্ছে ছিল সে অ্যাস্ট্রনমি পড়বে। বি. এস-সি-তে নামগন্ধ ছিল। বি. এস-সি পাশ করার পর তুলসী কলকাতায় পড়তে গিয়েছিল। তার বাবার ইচ্ছে ছিল না সে যায়, বি. এস-সি পড়ার সময়ও বাবার মত ছিল না, নতুন মা সব সময় গজগজ করেছে। তুলসী নিজেই গরজ করে, জেদ করে, ছেলেটেলে পড়িয়ে পড়াটা শেষ করেছিল। কলকাতা যাবার সময় সে বাড়ি থেকে কোনো সাহায্য পায়নি, ভবিষ্যতেও পাবার ভরসা করেনি। ভেবেছিল কলকাতায় গিয়ে একটা ব্যবস্থা করে নেবে। তুলসীর ভাবনায় ভুল হয়েছিল। সে পড়ার ব্যবস্থা করতে পারেনি, তার সুপারিশ ছিল না, খুব ভাল ফলও ছিল না পরীক্ষার। মোটামুটি ছেলে, মোটামুটি ফল। কলকাতায় যেখানে উঠেছিল তুলসী সেটা মেস; এই শহরের জানাশোনা এক দাদা ছিল। দাদা তাকে ফিরে যেতে বলেছিল। তুলসী সংগে সংগে ফেরেনি; মাস কয়েক ছিল। একথা বোঝানো মুশকিল আকাশ-রহস্য থেকে ক্রমশই তার মনে কেমন এক ধরনের বিস্ময় ও রহস্য সৃষ্টি হচ্ছিল যা তার নিজের। বোধ হয় ওই আকাশ-তত্ত্ব যাকে বলা হয়, এক্সপিরিআন্স অ্যান্ড স্পেকুলেশানের সীমায় বসে থাকা অনন্ত রহস্য, তার চিন্তা বা তার কথা ভাবতে বসে কৌতূহল, বিস্ময় ও রহস্য-হেতু তুলসী মনের দিক থেকে কি রকম যেন বিমোহিত বিমূঢ় ও কল্পনাপ্রবণ হয়ে উঠেছিল। 'এ মালটিটিচিউড অফ ভেরি কোয়াএট্ স্টার্স স্ক্যাটার্ড উইথ রেগুলারিটি' এ-সব পড়তে বসলে তুলসীর বার বার কবিতার কথা মনে পড়ত। সে কবিতা পড়তে পড়তে কবিতা ভালবাসতে শুরু করেছিল; কবিদের সম্পর্কে তার রহস্যময় ধারণা গড়ে উঠেছিল। কখনও সখনও তারও কবিতা লেখার বাসনা হত।..কলকাতায় এসে মেসবাড়ির পাড়ায় থাকা একটি ছেলের সংগে তার আলাপ হয়, সে কবি, কবিতা লিখত আর স্কুলমাস্টারী করত। গগন, খুব সুন্দর ছেলে। গগন বলত, তার নানা দুঃখকষ্টের মধ্যে একমাত্র কবিতা লেখার সময়ই সব যেন সরে যায়, রোদ পেয়ে যেভাবে কুয়াশা মেলায়। এই সান্ত্বনাটুকু না থাকলে গগন বাঁচত না। তুলসীর মনে হত, কথাটা ঠিক। কোনো একটা সান্ত্বনা ছাড়া জীবন বাঁচে না, শুকিয়ে যায়।...গগনই তাকে তার সমবয়সী কবিদের সংগে আলাপ করিয়ে দেয়। আলাপের পর তুলসী দেখল, গগন, অমলেন্দু.. এই ধরনের ছেলে আর সদ্য পরিচিত অন্যরা একেবারে আলাদা। অন্যদের সংগেও কিছু মেলামেশা হয়েছিল তুলসীর। তাদের একটা দল ছিল, সেই দলে তুলসী কয়েক দিন ভিড়েছে। শেষ পর্যন্ত ভাল লাগেনি।

একটা সামান্য ঘটনার কথা মনে পড়ল তুলসীর। বোকা লাজুক নিরীহ একটি গ্রাম্য ছেলে একবার ধারকর্জ করে নিজেই কবিতার বই ছেপেছিল একটা। তার খুব সাধ বইটা সকলকে দেয়, দিয়ে ওই দলের কোথাও একটু জায়গা পায়। কবিতার বই দেওয়ার কথা উঠতেই দলের ছেলেরা বেশ আগ্রহ দেখাল। একেবারে নিছক কি কবিতার বই দেওয়া যায়, না আলোচনা হয়! 'সেলিব্রেট করো' বলে রব উঠল। মতিশীল স্ট্রীটের একটা মদের দোকানে এক শো বাইশ টাকা দিয়ে

বেচারী কবির কাব্যগ্রন্থ-প্রকাশ সেলিব্রেট করা হলো। মদের দোকানে বসে নবীন কবি যত প্রশস্তি পেল তার কয়েক টুকরোও যদি সত্যি হত তবে ওই কবি ক্ষণজন্মা পুরুষ বলতে হবে। 'আহা...' 'ব্রিলিয়ান্ট', 'ইমেজটা এত ফ্রেশ অ্যান্ড অরিজিন্যাল ভাবাই যায় না', 'গদ্যছন্দ এভাবে মুঠোয় ধরতে দেখিনি, মেরে দিয়েছেন আপনি', 'আমি একটা রিভিউ লিখব আমাদের কাগজে...।' মদের পালা শেষ করে সেই তরুণ, বোবা, লাজুক কবি যখন বেরুল তখন মনে হচ্ছিল সে যেন হঠাৎ বিখ্যাত হবার লটারিটা জিতে গিয়ে উত্তেজিত, অধীর, আনন্দিত, তৃপ্ত। সে চলে যেতেই একজন মাতাল গলায় বলল, 'ইডিয়েট। একটা লাইন পড়া যায় না।' আর-একজন হেঁচকি তুলে বলল, 'মোদক আবার কবি হয় কোন জন্মে! ট্র্যাশ। করুণানিধানের লাইনে পদ্য লিখেছে।' ট্রাম লাইন পর্যন্ত আসতে, একশো বাইশ টাকার মদ উবে যাবার কথা নয়। কিন্তু তারই মধ্যে বিচিত্র মন্তব্য, হাসাহাসি, রগড়, নোংরামি হল। শেষে দল ভাগাভাগি হয়ে যে যার বাড়ির দিকে চলল। তুলসী ছিল গ্রেট একজন এবং আধা-গ্রেট দুজনের সঙ্গে। আধা-গ্রেটরা গল্পও লেখে, বিজ্ঞাপনও লেখে। ফাঁকায় এসে এক আধা-গ্রেট বলল, 'পেচ্ছাপখানায় চলো। মোদকের কবিতার মূল্য দিতে হবে।' অন্য আধা-গ্রেট বলল, 'খোঁজ নে তো, মোদক শালার বাবার তেলকল আছে কি না, থাকলে একটা পোয়েট্রি পাবলিকেশন করা যায়।' গ্রেট পেচ্ছাপখানার দিকে যেতে যেতে বলল, 'বেনামায় আমি চার-পাঁচ লাইন লিখে দেব কাগজে। স্বনামে পারি না। নামের ডিগনিটি থাকবে না। তবে যা লিখব তাতেই ওর কাব্য সাধ ঘুচে যাবে। রটন স্টাফ। না জানে ছন্দ, না একটা টলারেবলি ফেয়ার ইমেজ আছে।'

তুলসী বুঝতে পেরেছিল, এরা কেমন। তার ভাল লাগেনি। তার ঘৃণা হয়েছিল। ওদের সঙ্গে মেলামেশার মধ্যে তুলসী যা দেখেছে তাতে তার মনে হয়েছে· ওরা আড়ালে পরস্পরকে কুকুরের মতন কামড়ায়, দল বাঁধতে পারলে ঘেউ ঘেউ করে, একে অন্যের কুৎসা রটায়, প্রশস্তি গাইবার জন্যে ভাড়াটে গাইয়ে রাখে। সম্পাদকদের রাতারাতি দাদা তৈরী করে ফেলে, বাড়িতে বেনামা খিস্তির চিঠি দেয়, টেলিফোনে ডেকে মুখ খাবাপ করে।

তুলসী কলকাতা থেকে চলে আসার সময় গগনকে বলেছিল : "জ্যাকের লন্ডন যাওয়ার গল্প মনে আছে তোমার? আমার সেই অবস্থা।...নিজেব জায়গায় ফিরে যাই। একটা কিছু তো করতেই হবে।"

হেসে গগন বলেছিল, "তোমার নার্ভ নেই। থাকলে আরও কত দেখতে। কত রঙ কত রকম ভাবে বদলায় ভবিষ্যতে।"

"তুমি দেখো।"

তুলসী একটা রেল এঞ্জিনকে তীব্র আলো ফেলে, হুইসল দিতে দিতে সব কিছু কাঁপিয়ে আসতে দেখল। আকাশ আর মাটির মাঝামাঝি যেন অকস্মাৎ এক আলোর বিরাট ছটা পড়ে তার চোখের দৃষ্টি অন্ধ করে দিচ্ছিল। তুলসী আর দাঁড়াল না। ঘরে ফিরে গেল।

ক'দিন ধরে বিজয়া বাড়ির ঝি-চাকর, বাগানের মালী, কাউকে আর শুতে-বসতে দিচ্ছিল না। অত বড় বাড়িটা ধোওয়াচ্ছে, মোছাচ্ছে, ঝাড়াচ্ছে, জিনিসপত্র টানাটানি করে বাইরে বের করছে, সরাচ্ছে, আবার ঘরে ঢোকাচ্ছে। পুজো এসে গেছে, মহালয়াও পেরিয়ে গেল। বিজয়া সব সেরে-সুরে শেষে সূর্যর ঘরে এসেছিল। সূর্যর ঘর ঝাড়ামোছা পরিষ্কার হয়ে গেলে, মা'র ঘর। মা'র ঘর আব বাবার ঘর একই, তবু মা বেঁচে থাকতে বাবার ঘরের পাশে মা'র নিজের বসাটসা জিরোনোর একটা ঘর ছিল, পাড়ার মেয়েরা এলে বসত, গল্পগুজব করত; মা'র নিজের শখের জিনিসপত্র সাজানো থাকত ঘরটায়। মা'র সেই ঘর বাড়তি ঘরের মতন এখন পড়েই আছে, বাবা নিজের দরকারী জিনিসপত্র কাগজ-টাগজ কিছু রাখে, সিন্দুকটিন্দুকও রেখেছে। ওই ঘরটাও বৎসরান্তে একবাব ধোওয়া-মোছা পাবিষ্কার করতে হয়।

সূর্যর ঘর আজ শেষ করে কাল মা'র ঘরে হাত দেবে বিজয়া। সূর্যর ঘরে সকালেই হাত দিতে এসে বিজয়া দেখল, সূর্য বেরিয়ে যাচ্ছে।

বিজয়া বলল, "আড্ডা মারতে বেরোচ্ছিস যে, নিজে দাঁড়িয়ে থেকে নিজের কাজটা করিয়ে নিতে পারিস না।"

"আমার কোনো দরকার নেই।" সূর্য নিস্পৃহ গলায় বলল।

ভাইকে দেখল বিজয়া। "তোমার দরকারে তো হবে না; বাড়ির দরকারে হবে।"

"হবে হোক", সূর্য কোনো ভ্রূক্ষেপ করল না, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মাথার চুলে বারকয়েক চিরুনি টেনে নিল।

সূর্যর কথা শুনলে বিজয়ার গা জ্বলে যায় আজকাল। দিন দিন বাড়ছে। এত বেড়ে গেছে আজকাল যে কোনোরকম তোয়াক্কাই করে না বিজয়াকে। রুষ্ট হল বিজয়া; বলল, "এ বাড়িতে তুই ক' গণ্ডা চাকর পুষেছিস যে গলা ফুলিয়ে বড় কথা বলিস।"

সূর্য ঘুরে দিদির মুখ দেখল। সকাল বেলায় মুখ ভর্তি করে পান জরদা খেয়েছে। দু ঠোঁট রক্তের মতন লাল। পরনের থান-ধুতিতে ঠোঁট মুছেছে নিশ্চয়, কাঁধের কাছে আঁচলটায় লালচে দাগ। কদর্য লাগল দিদিকে। সূর্য বলল, "চাকর আমার বাবা পুষেছে।"

বিজয়া কেমন স্তম্ভিত হল। সূর্যর কথার ঝাঁকা অর্থটা সে বুঝতে পারল। কপাল এবং চোখে যেন আগুনের হলকা লাগল হঠাৎ। বিজয়া বলল, "কি বললি তুই?"

"বললাম চাকর আমার বাবা পুষেছে।"

"তার মানে?"

"বাড়ির চাকর আমারও চাকর; হুকুম মতন কাজ করবে।"

বিজয়ার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল, পাশেই দেওয়াল-আলনায় সূর্যর বেল্‌ট্‌ ঝুলছিল; প্রায় চোখের পলকে বেল্‌ট্‌টা টেনে নিয়ে বিজয়া ভাইয়ের দিকে ছুটে গিয়ে পাগলের মতন হাত ছুঁড়ল।

সূর্যর লাগেনি; গায়ে ডগাটা ছুঁয়েছিল মাত্র। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়িয়ে সূর্য বেল্‌ট্‌টা ধরে হেঁচকা টান মারতেই বিজয়ার হাত থেকে ছিটকে বেল্‌ট্‌ তার হাতে এসে গেল। বিজয়ার লেগেছিল, যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠল: উঃ! হাতের তালুটা সঙ্গে সঙ্গে তুলে ধরল। বেল্‌ট্‌-এর মুখের আঁকশি লেগে তার হাতের তালু সামান্য কেটে গেছে। শিরার মতন সরু আঁচড়ের দাগ ধরে লাল হয়ে পরে রক্ত বেরুতে লাগল। বিজয়া রক্ত দেখল। তারপর সূর্যর দিকে তাকিয়ে ঘৃণায় আক্রোশে রাগে চিৎকার করে উঠল, "তুই আমার গায়ে হাত তুললি। এত আস্পর্ধা তোর?"

সূর্য বলল, "মিথ্যে কথা বলো না; আমি তোমার গায়ে হাত তুলিনি, তুমিই আমার গায়ে হাত তুলেছ।" রাগে সূর্যর চোখমুখ লালচে হয়ে উঠেছিল।

বিজয়া বেহুঁশের মতন আশেপাশে তাকাচ্ছিল, যেন শক্ত ভারী মতন কিছু পেলে সূর্যর মুখে ছুঁড়ে মারবে। তেমন কিছু হাতের নাগালে নেই; ওদিকের টেবিলে কাচের গ্লাস রয়েছে একটা, ছুটে গিয়ে তুলে নেবার উপায় নেই, সূর্য তার আগেই গ্লাসটা সরিয়ে নেবে। ব্যর্থ আক্রোশে বিজয়া সূর্যর দিকে প্রতিশ্বন্দ্বির মতন তাকিয়ে থাকল। বলল, "আমি বাবার কাছে যাচ্ছি, বড় বোনের গায়ে হাত তুলিস তুই, ছোটলোক ইতর কোথাকার!"

"বলছি, মিথ্যে কথা বলবে না" –সূর্য ধমক দিয়ে উঠল, "তোমার গায়ে আমি হাত তুলিনি। যাও, বাবার কাছে যাও।"

"তুই আমায় চোখ রাঙিয়ে কথা বলছিস আবার!" বজিয়া হঠাৎ দু' পা ছুটে গিয়ে মাটি থেকে সূর্যর মোটা ভারী জুতো তুলে নিল। নিয়েই কাণ্ডজ্ঞানহীনের মতন সূর্যর মুখ লক্ষ্য করে ছুঁড়ল, প্রাণপণে। একটা জুতো সূর্যর কান আর গলার কাছে লেগেছে। পর পর দুটো জুতো ছুঁড়ে মারার পর সে স্পষ্ট করে কিছু বোঝবার আগেই—তার ঝাপসা দৃষ্টির সামনে সূর্যকে এগিয়ে আসতে দেখল; যেন পশুর মতন লাফ মেরে এগিয়ে এসে সূর্য বিজয়ার হাত ধরে ফেলে ভীষণ জোরে মুচড়ে দিল। টানাটানি, ধাক্কা, হেঁচড়াহেঁচড়ি, খামচাখামচি। বিজয়া লাথি মারার জন্যে পা ঝটকালো, সূর্যর গাল খামচে দিল। ঠেলাঠেলির মধ্যে কখন যেন বিজয়া দেখল, সূর্য তাকে ঠেলে বিছানার ওপর

ফেলে দিয়েছে, একেবারে গদির ছোবড়ার ওপর। সে বিছানার ওপর পিঠ মাথা দিয়ে পড়ে গেছে, পা মাটিতে, কোমরে টান লেগে টনটন করছে, আর সূর্য বিজয়ার দু হাত দু পাশে মাথার ওপর চেপে ধরেছে। বিজয়া পা ছোঁড়ার চেষ্টা করল; পারল না। তার ভারী শরীর যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে।

সূর্য আর বিজয়া এতক্ষণ পরস্পরকে খামচাখামচি, ধাক্কাধাক্কি করার সময় যেসব গালিগালাজ করেছে তার জের চলছিল তখনও। সূর্য বলল, "বাপের জমিদারী পেয়েছ বাড়িটা! ফুটানি! তোমায় আমি মেরে পুঁতে ফেলব......"

"মর তুই! মর—মর! জানোয়ার কোথাকার!"

"তুমি মরো। গলায় দাড়ি দিয়ে মরো।"

বিজয়া ঘৃণা-আক্রোশে অন্ধ হয়ে থুতু ছুঁড়ল, থুতুটা তার নিজের মুখে গালেই ছিটকে এসে পড়ল।

সূর্যও একমুখ থুতু বিজয়ার মুখের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে বলল, "তোমার রাজত্ব আর শালা বেশিদিন চলবে না: বাবা মরে গেলে আমি তোমায় লেংটো করে বাড়ি থেকে তাড়াব, মনে রেখো।"

সূর্য বিজয়ার হাত ছেড়ে দিয়ে উঠে পড়ল। উঠে পড়ার পর লক্ষ্য করল, বিজয়ার হাতের রক্ত তাব জামায় লেগেছে। জামাটা গা থেকে খুলতে গিয়ে ছিঁড়ে গেল। যাক্। জামাটা বিজয়ার মুখের ওপর ছুঁড়ে মেরে সূর্য আলনা থেকে অন্য একটা জামা উঠিয়ে নিয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

বাইরে এসে বাগানের কল থেকে মুখটা ধুয়ে নিল সূর্য। হাত দিয়ে মাথার চুলগুলো ঠিক করল। ছোকনু শরতের রোদ্দুরে পা টেনে টেনে এ-গাছ থেকে ও-গাছের কাছে যাচ্ছে, তার হাতে বন্দুক, বন্দুকটা সে ছুঁড়ছে না, প্রজাপতিকে ভয় দেখাচ্ছে। সূর্য ভাগ্নের এই ভয় দেখানোর খেলায় বিরক্ত হয়ে রেগে বলল, "কি রে, গাছের পাতায় খোঁচা মারার জন্যে তোকে বন্দুক কিনে দিয়েছি! মার-মার; ছরবা পুরে মার।"

ছোকনু বোকার মতন চোখ তুলে বলল, "কি মারব?"

"যা খুশি। মার, শালা—মেরে ফেল।"

বলতে বলতে সূর্য চলে গেল। সে আজ আর সাইকেল নিল না। হয়ত নেবার মতন ইচ্ছে বা মন তার ছিল না। যেতে যেতে গালের কাছে একবার হাত তুলে আঙুল দিয়ে ঘষল। জ্বালা করছে। জুতোটা তার চোখের তলা দিয়ে গাল ঘেঁষে পড়েছিল। আর একটু হলেই সোজা চোখে লাগত।

দিদিকে সত্যিই একদিন সে মেরে ফেলবে। মেরে ফেলতে তার আটকাবে না। কিছু যায় আসে না সূর্যর দিদি মরলে। কেন আছে ও এ বাড়িতে? কি অধিকার তার? চলে যাক ও বাড়ি ছেড়ে। এখনও যা গতর তাতে করে খেতে পারবে! সূর্যকে বলল জানোয়ার; তুমি কি? খচড়ি মাগী কোথাকার, তুমি কুত্তী! তুমি সেদিনও বেলফুলের মালা গেঁথে রুমালে বেঁধে ধনচন্দ্রের হাতে দিয়েছ; সন্ধ্যেবেলায় জানলায় বসে বসে, বারান্দায় দাঁড়িয়ে তুমি কার জন্যে

হাই তোল আমি জানি না? ধনচন্দর যে বাড়ি করছে, সেই বাড়ি তুমি তোমার নামে বানাতে চাও, বাবাকে মন্তর দিচ্ছ, ধনচন্দরকে দালাল লাগিয়েছ। তুমি কতবড় খলিফা মেয়েছেলে আমি জানি না? তোমার গায়ের গন্ধ পচা বেড়ালের মতন। কলঘরে গিয়ে খোলস ছাড়লে আর স্নো-পাউডার সেন্ট মাখলে সে গন্ধ উঠবে না। বাবা তোমায় নতুন বাড়ি দিলে আমি বাবাকে ছেড়ে কথা কইব না। এ বাড়িতে বসে বসে তোমার ডিমপাড়া আমি বের করছি।

রাস্তায় এসে সূর্য একটা রিকশাঅলাকে তার গায়ের পাশে এসে পড়তে দেখেই রিকশার হ্যান্ডেল ধরে ফেলে রিকশা থামাল। থামিয়ে টেনে একটা চড় মারতে যাচ্ছিল, মারতে গিয়ে দেখল, রিকশাঅলাটা তার চেনা, বুড়োগোছের, সারা মুখভর্তি বসন্তের দাগ। রোগা, হ্যাংলা। সূর্য মারল না। গালাগাল দিল; দিয়ে ছেড়ে দিল। লোকটা এক সময় তাদের বাড়িতে কিছুদিন কাজ করেছিল।

দুপুরে সূর্য নিজের ঘরে থাকতে পারল না। সমস্ত ঘর তছনছ। মেঝেতে চুন আর সোডার গাদা, ঘরের জানলাগুলো ভিজে, জিনিসপত্র টাল করা, বিছানা-পত্র উঠিয়ে রোদে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

খেতে বসার সময় দিদি কাছে ছিল না। দিদিকে একবার মাত্র সে দেখেছে। খেয়ে উঠে বেরিয়ে আসার সময়। বাবা তার ঘরে, ঘুমোচ্ছে। সূর্য বাগানে বেতের চেয়ার টেনে নিয়ে গিয়ে ছায়ায় বসল, বসে বসে সিগারেট খেল। তারপর তার ঘুম আসছিল।

জামগাছের ছায়ার তলায় বসে থাকতে থাকতে তার চোখের পাতা আলস্যে জড়িয়ে এসেছিল। তারপর কখন তন্দ্রা এল; তন্দ্রার মধ্যে ঘাড় হেলিয়ে চেয়ারের গায়ে মাথা রেখে সূর্য ঘুমিয়ে পড়ল। তার আশেপাশে দুপুরের চড়ুই ডাকছিল, বাড়ির পেছন দিকে কাক ডাকছে, আশ্বিনের রোদে প্রজাপতি আর ফড়িং গাছপালায় উড়ে উড়ে ঘুরছিল। সূর্যর গায়ে প্রজাপতি বসল, বসে উড়ে গেল।

আচমকা সূর্য দেখল: তার সামনে কে যেন দাঁড়িয়ে, মাথায় কাপড়। সূর্য চিনতে বা বুঝতে পারছিল না। আরও কাছে, প্রায় মুখের সামনে সেই মুখটি এগিয়ে এল। বুক পর্যন্তই দেখা যাচ্ছিল। বুকের দিকে চোখ পড়তে সূর্য কোঁচানো শাড়ির পাড়ে বড় একটা ব্রোচ দেখতে পেল, গলায় মফচেন; তারপর গলার ভাঁজ, মুখ, সিঁথি, মাথার কাপড়। এতক্ষণে চিনতে পারল সূর্য। বাবার ঘরে মেহগনি-পালিশ করা ফ্রেমে এই মুখ মস্ত করে বাঁধানো আছে, দিদির ঘরেও আছে—ছোট করে। মা।

'সূর্য...' মা'র মুখ নড়ল।

সূর্য অবাক। মা কেমন করে কথা বলছে? সূর্য অপলকে মাকে দেখতে থাকল।

'কি রে, সূর্য...' মা আবার কথা বলল। 'চিনতে পারছিস না?'

'মা।'

'পারলি! কি যে ছেলে তুই!'

'তুমি কেমন করে এলে?'

'এলাম।...কেন এলাম বল তো?'

সূর্য ভাবল। ভেবে পেল না মা কেন এসেছে। তাকে দেখতে? না, তাকে দেখার সাধ মা'র হবে কেন? সূর্য বলল, 'জানি না!'

'জানিস না!...তুই কি রে?'

'বাবার কাছে গিয়েছিলে?' সূর্য কি মনে করে শুধলো।

'না। উনি ঘুমোচ্ছেন!...'

'দিদি? দিদির কাছে গিয়েছিলে?'

'না, যাইনি।'

'শুধু আমার কাছে এসেছ?'

মা মাথা নাড়ল। শুধু সূর্যর কাছে কেন এসেছে মা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছে সূর্য, হঠাৎ গলার ওপর কি পড়তেই সূর্য চমকে শিউরে উঠে চোখ মেলল। জামগাছের ডাল থেকে একটা কাঠবেড়ালি তার গায়ে লাফিয়ে পড়েছিল। চেয়ারের পাশ দিয়ে পলকে নেমে মাটিতে লাল মোরম আর জামকাঠির ওপর দিয়ে কাঠবেড়ালিটা পালিয়ে গেল।

গাঢ় রোদ চারপাশে, জামতলার দিকে রোদ বেঁকে গেছে, পেয়ারা গাছের মাথার ওপর দিয়ে ফিঙে উড়ে গেল। মা কোথাও নেই। হঠাৎ সব নিস্তব্ধ; কাক চড়ুইও আর ডাকছে না, সমস্ত গাছপালা, মাটি, রোদ যেন মা চলে যাওয়ার পর সূর্যকে দেখছে।

সূর্য চোখ রগড়ে নিল। স্বপ্ন: এলো আর গেল। তবু সূর্য একবার চার পাশ ভাল করে তাকিয়ে দেখে নিল। পেছন বাবান্দার ছায়ায় বসে ছোকনু তার বন্দুক নিয়ে নিশানা ঠিক করছে। ছোকনুর নিশানা একটা ফুলের টব।

সূর্য হাই তুলল। তুলে ছোকনুকে ডাকল।

ছোকনু কাছে এলে সূর্য বলল, "কেউ এসেছিল নাকি রে?"

"না।" ছোকনু মাথা নাড়ল।

"তুই তখন থেকেই এখানে আছিস—শুতে যাসনি?"

"না।"

"দেখি, তোর বন্দুকটা দেখি।"

ছোকনু বন্দুক দিল। সূর্য ছররা চাইল। ছররা মানে কতক সিসের ছোট ছোট বল। হাতের মুঠো থেকে ছোকনু মামার হাতে ছররা দিল। সূর্য সিসের গুলিটা ঢুকিয়ে নিয়ে বন্দুকটা এক হাতে তুলে মুখের সামনে আনল। বলল, "ছেলেবেলায় আমার একটা বন্দুক ছিল, খুব ভাল, সেসব আজকাল আর পাওয়াই যায় না। আমার সেই বন্দুক দিয়ে আমি পটাপট গিরগিটি টিকটিকি

মেরেছি।"

"একেবারে মরে যেত?" ছোকনুর গলায় অগাধ বিস্ময়।

"দু-একটা; বাকি সব পালাত।...কি মারব বল?" সূর্য বন্দুকের ছোট নলটা ছোকনুর পাশ দিয়ে ঘুরিয়ে নিল।

ছোকনু দু' পলক যেন ভাবল। বলল, "দাঁড়াও". বলে পা টেনে টেনে কয়েক পা পিছিয়ে পেয়ারা গাছের গোড়ায় গিয়ে দাঁড়াল; নীচের একটা ডাল তার মাথার পাশে ঝুলে রয়েছে, পাতা-গলে আসা রোদ্দুর তার গায়ে মুখে। ছোকনু হঠাৎ তার ডান হাত রাস্তার ট্রাফিক পুলিসের মতন বাড়িয়ে দিল, দিয়ে বলল, "মামা, আমার হাতের চেটোতে মার।"

সূর্য কেমন অবাক। "লাগবে না তোর?"

"না, তুমি মার।"

"হাত ফুটো হয়ে যাবে, গাধা। আমি এমন জোরে ঝাড়ব..."

"হবে না, তুমি মারো।"

"খুব সাহস। আচ্ছা নে দাঁড়া। নড়বি না।"

ছোকনু মামার দিকে মুখ করে ডান হাত লম্বা করে পাশের দিকে বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকল স্থির হয়ে। সূর্য বন্দুকের নলটা ছোকনুর দিকে ফেরাল। নিতান্তই খেলা। সূর্য নিশানা করতে করতে বলল, "বাঁ হাতটাও ওইভাবে বাড়া। জিবটা বের করে দে..."

ছোকনুও মামার কথা মতন জিব বের করে দু' হাত ডানার মতন দু' দিকে মেলে দাঁড়াল। তার মাথার ওপর পেয়ারা গাছের ডাল, পেছনে গুঁড়ি।

সূর্য এক চোখ বন্ধ করে ছোকনুকে নিশানা করতে গিয়ে হঠাৎ যেন কি দেখল, দেখে বন্দুকটা স্থিরভাবেই ধরে থাকল। সাহেবদের কবরখানার মাথায় পোঁতা ছোট্ট ক্রুশের মতন দাঁড়িয়ে আছে ছোকনু। অবিকল সেই রকম, ছোট, ময়লা, চারপাশে গাছপাতা। কার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছে ছোকনু? কার কবরের ওপর?

সূর্য কেমন অন্যমনস্ক হয়ে বন্দুকটা সরিয়ে নিল। নিয়ে ছোকনুর দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে থাকল। তার মনের কোথায় যেন ভীষণ ফাঁকা লাগছিল, বোঝা যাচ্ছে না—তবু অস্পষ্ট কোনো দুঃখ গলার তলা দিয়ে বুকে নেমে যাচ্ছে। শেষে সূর্য ডাকল, "শোন, এদিকে আয়।"

ছোকনু বলল, "মারলে না?"

"মারব।"

"মারো।"

"এখন না।...তোকে না।"

"কাকে মারবে?"

"তোর মাকে।"

"কেন?"

"তোর মা'র মোটা চেহারা, টিপ ফসকাবে না," সূর্য হেসে বলল, অথচ হাসিটা সরল নয়।

ছোকনু কি যেন ভাবল, "তুমি একটা কাক মার।"

সূর্য বন্দুকটা ভাগেনর হাতে দিয়ে দিল। আর তেষ্টা পাচ্ছিল; সিগারেট খেতে ইচ্ছে করছিল। সূর্য গলাটা শুকনো অনুভব করে বলল, "ছোকনু, যা তো—কাউকে এক কুঁজো জল নিয়ে আসতে বল।"

"এক কুঁ—জো! কি করবে?"

"খাব," সূর্য হেসে বলল, "ভীষণ তেষ্টা। যা বেটা, খুব তেষ্টা পেয়েছে, জল আনতে বল।"

ছোকনু চলে গেল।

সূর্য মাটিতে পা দুটো টান টান করে ছড়িয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে থাকল। তার ঘর দেখা যাচ্ছে। ঘরে কাজ করছে চাকর-বাকররা। বোধহয় শেষ হয়ে এল ধোয়ামোছা। ঝাড়াটাড়া শেষ হবার পর আজ ওই ঘরটা কি রকম গন্ধ গন্ধ লাগবে। সোডা আর চুনের গন্ধে ভরা।...আবার আধখানা হাই তুলল সূর্য। মা কেন এসেছিল? হুট করে চলে এল, আবার চলে গেল! ব্যাপার কি? স্বপ্নের আবার ব্যাপার কি? স্বপ্নে যা খুশি দেখা যায়। স্বপ্নে সূর্য বাবাকে হাফ প্যাণ্ট পরে ফুটবল খেলতে দেখেছে একবার, দেখে সারা সকাল হেসেছে। একদিন দেখেছিল, দিদি আর জামাইবাবু গায়ে দুটো লেপ জড়িয়ে ঘরের মধ্যে ভেড়ার মতন গুঁতোগুঁতি করছে; বুললির বিয়ে হতে এবং অভয় শালাকে পায়ে ঘুঙুর বেঁধে চানাচুর বেচতেও দেখেছে সূর্য। কি হয়েছে তাতে? এসব হামেশাই স্বপ্নে দেখে মানুষ। সূর্য নিজেকেই কত রকম দেখেছে: উড়ছে হাঁটছে, পড়ছে, সাঁতার কাটার জন্যে ঝাঁপ দিচ্ছে, দিদির ব্লাউজ টাঙিয়ে পেচ্ছাপ করছে, বাবার সঙ্গে লাঠি খেলছে।.. আরে ওই সেদিনও তো সূর্য স্বপ্ন দেখেছে· মালাদি আর জয়ন্তী জড়াজড়ি করে তার চারপাশে কোমর দুলিয়ে দুলিয়ে নাচছে আর সূর্য হাতে তালি মারছে, ক্লাউনের পোশাক তার। সূর্য ছড়ির বেঁকানো মাথা দিয়ে একবার এর গলাটা টেনে এনে চুমু খাচ্ছে, একবার ওর গালে। ওরা সূর্যকে শুধু হাসাচ্ছে। অবশ্য শেষে সূর্য দেখেছিল মালাদি তাকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে সরবত খেতে দিল, সরবতটা সূর্য খেল না, না খেয়ে মালাদির বুকে ঢেলে দিল, দিতে ব্লাউজ ভিজে গিয়ে ব্লটিং পেপারের মতন চুপসে গেল। ঠাস করে চড় মারল মালাদি, সঙ্গে সঙ্গে সূর্য মালাদির পেছনে এক লাথি।

কিন্তু সূর্য এই স্বপ্নকে, তার মা'র স্বপ্নকে ঠিক সেভাবে দেখতে পারল না। তার মনে হল, মা কোনো কথা বলতে এসেছিল। কি কথা?

সূর্যর হঠাৎ মনে পড়ল, স্পষ্ট মনে পড়ল, ছেলেবেলায়, মা'র যখন খুব অসুখ—, অসুখটা চলছে—চলছে-চলছেই—তখন একদিন স্কুলের পেন্সিল কাটা ছুরিটা খুলে নিয়ে সূর্য ঠিক এই রকম এক দুপুরে কাঠবেড়ালি মারছিল।

কাঠবেড়ালি দেখছে দেখছে দেখছে, আর সট্ করে ছুরিটা ছুঁড়ে মারছে গাছের ডালে। কাঠবেড়ালি মারা খুব শক্ত। সূর্য পারছিল না। শেষে একটার একেবারে পিঠে।...ঠিক তখন মা বেরিয়ে এসেছিল বিছানা ছেড়ে। মাকে দেখে সূর্য ছুরিটা তাড়াতাড়ি পায়ে চাপা দিল। হাতে ছুরিটুরি দেখলে মা রেগে যেত ভীষণ। সূর্য পায়ের তলায় ছুরি চাপা দিয়ে দাঁড়িয়ে—সামনে মা, অথচ কি আশ্চর্য, মা তখন ঘরে—সেই সময় মারা যাচ্ছে-যাচ্ছে, দিদি চিৎকার করে কাঁদছিল।

জল নিয়ে এসেছিল বামুনদিদি, ছোকনু সঙ্গে ছিল। জলের গ্লাস হাতে নিয়ে এক নিশ্বাসে সবটুকু জল খেয়ে নিল সূর্য। আশ্বিনের রোদ বেশ তাতালো, সমস্ত শুকনো করে দিচ্ছে, বাগানেব বাতাসটাও বেশ শুকনো, গলার কাছে ঘাম হচ্ছিল বিন্দু বিন্দু। সূর্য পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরাল।

ছোকনু বলল, "মামা, মা তোমায় ডাকছে।"

সূর্য ভাগ্নের মুখের দিকে তাকাল: ছোকনু-বেটা তার মাকে কিছু বলে এল নাকি? না, তেমন ছেলে ছোকনু নয়। তবে? দিদি তাকে ডাকবে কেন? এভাবে বড় একটা ডাকাডাকি করে না; সূর্য পছন্দ করে না দিদি তাকে হুকুম করে ডেকে পাঠাক। আজ আবার যা ঘটে গেছে তাতে দিদির ডেকে পাঠানো কি সম্ভব? তবে কি দিদি বাবার কাছে রয়েছে? বাবার কাছে বসে বসে কাঁদুনি গাইছে?

"তোর মা কোথায়?" সূর্য বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল।

"ঘরে।"

"কোন ঘরে?"

"মা'র ঘরে।"

"দাদু রয়েছে ঘরে?"

"না—" ছোকনু মাথা নাড়ল।

সূর্য অবাক হল। দিদি তার ঘরে একলা, বাবার কা[illegible] কাঁদুনি গাইছে না; তবু সূর্যকে ডেকে পাঠাল কেন? বুঝতে পারল না সূ[illegible] সে দিদির চাকর নয় যে ডেকে পাঠালেই যেতে হবে। সিগারেটটায় ধীরেসু[illegible] টান মারতে লাগল সূর্য। ছোকনু খেলা করতে করতে ওপাশে চলে গেল।

সূর্য প্রথমে ভাবল, যাবে না। পরে ভাবল, গিয়ে [illegible]ব নাকি ব্যাপারটা কি? কি বলতে চাইছে দিদি? বাবার কাছে এর মধ্যেই কি বলেছে ও? গেলে ক্ষতি নেই। দিদিকে সে তোয়াক্কা করে না। হয়ত দিদি বাবার কাছে তার নামে খুব লাগিয়েছে। এখন নিজেই খানিকটা শাসাতে চায়। যদি শাসায় তবে সূর্য তাকে ছেড়ে কথা বলবে না। সকালের চোট এখনও দিদি নিশ্চয় ভোলেনি; সেও ভুলে যায়নি।

সিগারেটের শেষ টুকরোটা ছুঁড়ে দিয়ে সূর্য একটু বসে থাকল; তারপর উঠল।

বিজয়া বালিশের পাশ দিয়ে চুল ছড়িয়ে শুয়ে ছিল। এলো চুল কখন শুকিয়ে গেছে। পা ছড়ানো, আয়াস করে দু' পা দুদিকে সমস্ত পালঙ্ক জুড়েই প্রায় মেলা, চর্বিঅলা পেট ফুলে রয়েছে, কাপড় আলগা, এলোমেলো বাঁ হাত মাথার ওপর এলানো, ডান হাতে একটা সিনেমার রঙচঙে কাগজ। শুয়ে শুয়ে কাগজ পড়ছিল বিজয়া।

সূর্য আসতেই বিজয়া মুখের ওপর থেকে কাগজ সরিয়ে ভাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিল। মুখ গম্ভীর হল।

দিদির এই বিশ্রী রকম শোয়া সূর্যের চোখে বিষের মতন লাগল। কলাগাছের গোড়ার মতন গোদা গোদা পা দু' পাশে ফাঁক করে কি করে শোয় ও? লজ্জা করে না? ঘেন্না হয় না? সূর্য নিজেই ঘেন্নায় অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নিল। তার মুখে নানারকম খারাপ গালাগাল আসছিল।

বিজয়া কাগজটা ফেলে দিয়ে উঠল। কোমরের কাছে পাশ বালিশ, পাশ বালিশটা সরিয়ে কোলের ওপর টেনে নিয়ে কাত হয়ে বসে মাথার চুল জড়িয়ে নিতে লাগল। ওর কেটে যাওয়া হাতের তালুতে একটা সাদা পট্টি জড়ানো।

চুল জড়ানো হয়ে গেলে কোল থেকে পাশ বালিশটা সরাল বিজয়া। তারপর পা বাড়িয়ে পালঙ্ক থেকে উঠল। ওঠবার সময় তার পায়ের কাপড় হাঁটু পর্যন্ত গুটিয়ে গিয়েছিল। সূর্য জানলার কাছে দাঁড়িয়ে, জানলায় জালিকাপড়ের পরিষ্কার পরদা, বাতাসে নড়ছে, ওপাশে বাতাবিলেবু গাছে লেবু ঝুলছে, লেবুর মতন গন্ধও যেন। সূর্য ইচ্ছে করেই অন্যদিকে তাকিয়ে ছিল।

বিজয়া বিছানা থেকে নেমে তার ভারী আলমারিটার কাছে গেল। আলমারির ওপর দিকটায় আয়না বসানো পাল্লা; নীচের দিকটায় কাঠের পাল্লা; নীচের ভাগটাই বেশী চওড়া। মেহগনির রঙ আলমারিতে। আয়না দুটো ঝকঝক করছিল। বিজয়া আঁচল লুটিয়ে মাটিতে বসল, বসে নীচের পাল্লা খুলল। খুলে কী একটা বের করল। সূর্য আড়চোখে দেখছিল।

বিজয়া বলল, গলার স্বর গম্ভীর, "তোমার ঘরে এটা ছিল?"

সূর্য দেখতে পেয়েছিল : সেই ছবির বই। ভেতরে ভেতরে চমকাল। মুখে অবজ্ঞার গলায় বলল, "ছিল তো কি হয়েছে!"

"কি হয়েছে? এ সব বই তুমি ঘরে রাখ! মেয়েমানুষের ন্যাংটা ছবি!"

"তুমি রাখ না?"

বিজয়া কেমন থতমত খেয়ে গেল। মুখ বিবর্ণ হল। তারপর আস্তে আস্তে লাল হয়ে উঠতে লাগল। "আমি রাখি!"

"ফটোর বই। তোমার ঘরেই ছিল। আমি নিয়েছি।" সূর্য বেপরোয়াভাবে

বলার চেষ্টা করল, "আমি ফটো তুলতে শিখছি।"

বিজয়া রাগের মাথায় বইটার পাতা উলটে কি বের করে মেলে ধরল, "তুমি এই শিখছ?"

সূর্য তাকাল। বুঝতে পারল। সেদিন মালাদির কাছ থেকে ফিরে এসে সে যেন কিরকম বেহুঁশ আক্রোশে সিগারেটের আগুন দিয়ে ওই বইয়ের কয়েকটা ছবির মেয়েকে ছেঁকা দিয়ে দিয়ে পুড়িয়েছিল। তার ঘেন্না হয়ে গেছে মেয়েদের ওপর। ভীষণ ঘেন্না।

সূর্য বলল, "তোমার কাছে অনেক খারাপ বই আছে।"

"সূর্য।" বিজয়ার গলা যেন চিবে গেল, চোখ ঝলসে যাচ্ছে, "তুমি কার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছ, ভুলে গেছ।"

সূর্য দিদির রক্তচক্ষুর মধ্যে ধরা পড়ে যাওয়া ভীত চোরকে দেখতে পেল। বলল, "সত্যি কথা শুনলে সকলেরই মেজাজ হয়।"

বিজয়া সঙ্গে সঙ্গে কথার জবাব দিতে পারল না। রাগে তার গায়ের চামড়া জ্বলছিল, মাথা আগুন। পরে বলল, "আমার ঘরে তুমি এসব বই দেখেছ?"

"আমি নিয়ে গিয়ে পড়েছি। চুরি করে নিয়ে গেছি।"

বিজয়া স্তম্ভিত। সে জানত, এই বই সূর্য তার ঘর থেকে নিয়ে গেছে। জেনেও সূর্যকে উলটো চাপ দেবার চেষ্টা করছিল। বইটা পুরনো, এ-সব বই বিজয়া অনেকদিন থেকে রেখে দিয়েছে। কি করে এসেছিল তা বিজয়াই জানে। কতভাবে যোগাড় করেছে, স্বামীকে দিয়েও আনাত।

নিজেকে কোনো রকমে সামলে নিয়ে বিজয়া ঘৃণার চোখে ভাইকে দেখল। "তুমি আমার ঘরে ঢুকে চুরি করতে?"

সূর্য সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল "তুমি আমাদের বাড়িতে থেকে চুরি করছ না?"

অসহ্য হল বিজয়ার। তার চেয়ে অত ছোট সে ভাই তার মুখে এত বড় বড় কথা। বিজয়া হাতের বইটা ছুঁড়ে মারল। "আমি চোর?"

সূর্য মেঝের ওপর ছিটকে আসা বইটা দেখল মাঝখানটা ছড়িয়ে ছেতরে খুলে পড়ে আছে, একটা ছবি দেখা যাচ্ছে, তার নাকচোখ ফুটো, সিগারেটের আগুনে পোড়ানো, স্তনবৃন্ত যেন কেউ ছররা মেরে ফুটো করে দিয়েছে।

"কি, আমি চোর?" বিজয়া আবার বলল।

সূর্য দিদির দিকে তাকাল। দিদিকে একেবারে হাত পা ছড়িয়ে মড়া কান্না কাঁদতে বসা মেয়েছেলের মতন দেখাচ্ছিল। বিশ্রী লাগছিল সূর্যর। সূর্য বলল, "তুমি যুধিষ্ঠির?"

"হারামজাদা, আমি তোর কি চুরি করেছি?"

সূর্য জবাব দিতে পারল না। কি চুরি করেছে দিদি তার? অথচ একটা জবাব যে দেওয়া যায় সূর্য অনুভব করছিল।

বিজয়ার নাক ফুলে ফুলে উঠছিল। গাল টকটকে লাল হয়ে উঠেছে। চোখ

দপদপ করছিল। আলমারির মধ্যে ঝ‍ুঁকে বিজয়া যেন দ‍ু হাতে আকড়ে আরও কিছ‍ু বের করল। বের করে স‍ূর্যর দিকে দেখাল: "এ সব কি? তোমার ঘরে ছিল না?"

স‍ূর্য দেখল: সেই লম্বা ছ‍ুরি, ছোট চ্যাপ্টা একটা বাহারী বিলিতী মদের খালি বোতল, প্লাস্টিকের তাস, মালাদির ফটো, দিদির আলমারির ড‍ুপ্লিকেট চোরাই চাবি, আরও একটা চোরাই চাবি মা'র সিন্দ‍ুকের—এইসব।

বিজয়া বলল, "এ সমস্ত আমি বাবার কাছে নিয়ে যাব।"

স‍ূর্য অবজ্ঞার ম‍ুখে হাসবার চেষ্টা করল, "যাও।...আমিও তোমার মাল-মশলা টেনে বের করব।"

"কি করবি? কি করবি তুই?"

"তোমার ল‍ুকোনো মালমশলা।...অনেক আছে।"

"আমার যা আছে আমি ব‍ুঝব।"

"আমারটাও আমি ব‍ুঝব।"

বিজয়া তার হাতের জিনিসগ‍ুলো মাটিতে ফেলে দিয়ে এবার আলমারির মধ্যে থেকে একটা কাগজ বের করল। দেখাল স‍ূর্যকে। "এটা কি?"

স‍ূর্য দেখল।

বিজয়া কাগজটা খ‍ুলে আবার পড়ল। বলল, "এই চিঠি তোকে কে দিয়েছে? গণনাথ?"

স‍ূর্য জবাব দিল না।

বিজয়া বলল, "কি দিয়েছিস তুই গণনাথকে বেচতে? কার জিনিস চুরি করেছিস? আমার?"

"না।"

"তবে কার?"

"যারই দিয়ে থাকি, তোমার কি!...আমার বাড়ির জিনিস আমি দেবো। তুমি কথা বলার কে?"

"ও!...আচ্ছা, দে তুই। তোর বাড়ি!...দেখি কার বাড়ি।"

স‍ূর্য কিছ‍ু বলল না আর। চলে গেল।

১৩

মস্ত ঝিলটার জল-ঘেঁষে একটা কাঠের তক্তার ওপর সূর্য আকাশমুখো হয়ে শুয়ে ছিল। কৃপাময় তার পাশে। ঝিলের ওদিকটায় ছুটিছাটার দিনে শখের মাছ ধরা বাবুদের আসা-যাওয়া দেখা যায়। আজও দু-চারজন ছিল, বিকেলের আলো মরে যাবার পর ছাতা, ছিপ, চায়ের পাত্র, কিছু চুনোপুটি রুমালে বেঁধে তারা চলে গেছে। টর্চ মেরে মেরে ফাতনা দেখে শেষ পর্যন্ত যে বসেছিল, সেও উঠল, জিনিসপত্র গুছিয়ে সাইকেল চেপে চলে গেল। ঝিল এখন ফাঁকা। সন্ধ্যে হয়ে আসছে।

অন্ধকারের নরম ভাবটা কেটে আসছে দেখে কৃপাময় বলল, "জলের কাছে আর নয়, ওঠ, ওদিকে গিয়ে বসি।"

সূর্য সঙ্গে সঙ্গে উঠল না, আরও একটু শুয়ে থাকল। পাতলা পাতলা অন্ধকার ক্রমশই গাঢ় হয়ে আসছে, শিশু দেবদারু আর নিমের ঝোপঝাড় থেকে যেন অন্ধকার হালকা ধোঁয়ার মতন বেরিয়ে এসে ধীরে ধীরে চারপাশের কালচে ভাবটা ঘন করছিল। আশ্বিনের নীলচে আকাশ ধূসর হয়ে এসেছিল কখন, পশ্চিমের আকাশের প্রান্ত ঘেঁষে খুব ফিকে আলোর ভাবটুকুও টুপ করে অন্ধকারে খসে পড়ল, আকাশে তারা ফুটে উঠেছে।

শেষ পর্যন্ত সূর্য উঠে বসল। জলের শ্যাওলা কালো দেখাচ্ছে, ঝিলের জল কালির মতন রঙ হয়ে গেল। ট্রেন লাইনের দিক থেকেই মেঘের মতন মস্ত একটা অন্ধকারের ভাব উঠে এসে সব আঁধার করে দিল। শীর্ণ চাঁদ উঠেছিল আকাশে।

এখানকার বাতাসে জলের আর্দ্রতা, শ্যাওলা আর জলজ লতাপাতার গন্ধ। চারপাশ নিস্তব্ধপ্রায়; কিছু সন্ধ্যার পাখির গলা শোনা যাচ্ছিল, দূর দিয়ে ক্বচিৎ দু-একটি মোটর চলে যাচ্ছে, রেল লাইনে মাঝে মাঝে মালগাড়ি চলে যাওয়ার শব্দ আসছিল।

ওরা দুজনে উঠে এসে সাইকেলের কাছাকাছি একটা জায়গা বেছে বসল। চোরকাঁটা আর লম্বা লম্বা ঘাসের দিকে গেল না। নেড়া, বালি বালি জায়গা বেছে বসল, কারণ এ সময় ঝিলের কাছে ঘাসে বসতে নেই, সাপের উৎপাত রয়েছে।

সূর্য মাঠের দক্ষিণ দিকে তাকিয়ে বলল, "কি রে, ও-শালারা করছে কি?

আসবে, না আসবে না?"

কৃপাময় বলল, "আর খানিক দেখি। ব্যবস্থা করতে পারছে না বোধ হয়।"

সূর্য বিরক্ত হয়ে বলল, "এই জন্যেই অভয়শালাকে আমার মারতে ইচ্ছে করে। হারামী কোনো কাজের নয়। বুদ্ধু, গেঁড়ে শালা।"

কৃপাময় কিছু বলল না। চোরকাঁটার জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে থাকল। অন্ধকারে একটা কুকুর ছুটতে ছুটতে চলে যাচ্ছে।

সামান্য চুপচাপ বসে থাকার পর সূর্য বলল, "বুঝলি কৃপা, দিদিটা শালা এভাবে ফাঁসিয়ে দেবে ভাবিনি মাইরি।"

কৃপাময় জবাব দিল, "তুই বোকার মতন কাজ করেছিস।"

"বোকার মতন কি, টিট ফর ট্যাট, আমার পেছনে লাগল আমিও লাগলাম।"

"ও লাগল লাগুক, তোর বোঝা উচিত ছিল..."

"থাম্ শালা—" সূর্য বিরক্ত হয়ে কৃপাময়কে ধমক দিল, "তখন থেকে তোর কেবল এক কথা : তোর বোঝা উচিত ছিল, তোর বোঝা উচিত ছিল।.. কিসের কি বোঝা উচিত ছিল বে! অত বুঝতে গেলে আমার বাপ আমার জন্ম দেবে তাও বোঝা উচিত ছিল।"

কৃপাময় হেসে বলল, "তা হলে বুঝিস না। যা হবার হবে।"

"কি হবে! বাবা আমায় আজ কি বলল জানিস?"

"কি?"

"সে অনেক। ই—য়া লম্বা লেকচার।.. বুড়োর এখনও কি দম, গলাটা একেবারে আওরংজেব, মাইরি।"

"আসল কথাটা বল।"

"অত আসল কথা আমার মনে নেই।.. ব্রেন থাকলে তো লেখাপড়া করে ভাল ছেলে হতাম বে, তোদের ল্যাজ ধরে ঝুলতাম না।" সূর্য যেন কোনো কিছুকে ব্যঙ্গ ও উপেক্ষা করে হেসে হেসে বলার চেষ্টা করল কথাটা। তারপর বলল, "সোজা কথাটা কি জানিস, আমি আমার বাবার মান সম্মান খাতির—সব নষ্ট করেছি; ফাদার বলল, ফাদারদের বংশও আমি খতম করে ফেলব। মুখে চুনকালি মাখিয়ে দিয়েছি রে, বুঝলি, চোদ্দ পুরুষের মুখে লাইম্-ইংক্।" বলে আপনমনে কেমন সদুঃখে একটু হাসল সূর্য; অল্প চুপ করে থেকে লম্বা একটা নিশ্বাস ফেলল, "...মাইরি, দিদি আমায় কি ব্যাম্বুটাই দিল।...আর ওই শালা গণাদা।"

কৃপাময় বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। সূর্যর মুখ বেশ কালো দেখাচ্ছে অন্ধকারে। সামান্য পরে সূর্য বলল, "গণাদার কাছে কখন যাবি?"

"আজ।...একটু দেরি করে যাব। শালাকে কালও দোকানে পাইনি। আজ বাড়ি যাব।" বলে সূর্য থামল; তারপর কি ভেবে হঠাৎ ভীষণ আক্রোশে বলল, "বাবা মরে যাক, দেখ ওই দিদির আমি কি করি! কুত্তা দিয়ে খাওয়াব...অ্যারসা

ধাড়বাজ, ঠিক মাহার খ‍ুজে খ‍ুজে বের করল আমি কি হাতিয়েছি!...আমার মা'র সিন্দ‍ুক থেকে আমি যা-ই নিই, ওর কি..."

মাঠের অন্ধকার থেকে সাইকেলের ঘণ্টি শোনা যাচ্ছিল; অন্ধকার থেকেই হাঁক এল: স‍ূ—র্য। কৃপাময় সাড়া দিল। তারপর দেখতে দেখতে সোঁ সোঁ করে ওরা চলে এল।

সাইকেল থেকে নামল ওরা: ব‍ুলালি আর অভয়। অভয়ের আজ সাইকেল রয়েছে। প‍ুজোর সময় সাইকেল না হলে চলে না। ঘ‍ুরতে বেড়াতে টহল মারতে সাইকেল দরকার। ব‍ুলালির কাছ থেকে প‍ুরনো টায়ার দ‍ুটো চেয়ে নিয়েছে অভয়, তার টায়ারের চেয়ে এ দ‍ুটো ভাল। টিউবও মেরামত করেছে।

স‍ূর্য প্রথমেই অভয়কে খেঁকিয়ে উঠল, "কি করছিলি রে এতক্ষণ? রাত কাবার করে এলি? শালা।"

সাইকেলের রডে ঝোলানো কাপড়ের থলেটা খ‍ুলে নিয়ে ব‍ুলালি স‍ূর্যদের দিকে বাড়িয়ে দিল, "নে, আগে ধর। আরে ব্বাস, কী হয়রানি শালা।"

অভয়ও র‍ুমাল বাঁধা কি যেন সাইকেলের হ্যাণ্ডেল থেকে খ‍ুলছিল।

স‍ূর্য বলল, "অভয় বেটার জন্যে হয়রানি তো! মার না শালাকে, মেরে প‍ুঁতে দে।"

অভয় বলল, "আছিস বেশ, মাঠে শ‍ুয়ে শ‍ুয়ে ফ‍ুটানি মারছিস। যা না, নিয়ে আয় এক বোতল। তোর হিম্মৎ দেখি।"

"এক কি, আমি দশ বোতল আনতে পারি।"

"তোর প্যাণ্ট ফেটে যাবে।"

সাইকেল দ‍ুটো ওরা মাঠে ফেলে রেখে স‍ূর্যদের পাশে এসে বসল। ততক্ষণে কৃপাময় কাপড়ের থলির মধ্যে থেকে এক বোতল ছোট হ‍ুইস্কি বের করেছে, দ‍ু' বোতল সোডা। স‍ূর্য ছোট হ‍ুইস্কির বোতলটা নিয়ে বলল, "আরে, এ তো চমেত্তর হবে। এতক্ষণ ধ'রে রগড়ে এই আনলি?"

অভয় বলল, "ওই জোটাতেই আমার চিরে গেছে।...তুই শালা বসতে পেলে শ‍ুতে চাস।" বলে অভয় র‍ুমালের গিঁট খ‍ুলতে লাগল।

"ঠিক আছে, তুই বেটা খাবি না। আমরা খাব; খাবার আগে তোকে শ‍ুঁকিসে নেব।"

র‍ুমাল খ‍ুলে অভয় চানাচুরের প্যাকেট, ন‍ুন-ঝাল মাখানো ভাজা চিনে বাদাম, দ‍ু প্যাকেট সিগারেট বের করল। করে পকেট থেকে চারটি মাটির খ‍ুরি।

স‍ূর্য মাটির খ‍ুরি দেখে বলল, "মাটির ভাঁড় কি রে, ওতেই তো সব শ‍ুষে যাবে।"

ব‍ুলালি হ‍ুইস্কির বোতলটা খ‍ুলতে লাগল। কৃপাময় একম‍ুঠো চানাচুর নিয়ে চিবোতে লাগল। অভয় তার হ‍ুইস্কি সংগ্রহের বিবরণ দিতে লাগল. ইব্রাহিম ব্রাদার্সের ওআইনশপে ঢোকাই যায় না, শালা বাজারে কি ভিড়, প‍ুজোর ভিড়, খালি চেনা লোক, যাচ্ছে আসছে সামনে দিয়ে। তারপর শালা মদের

দোকানে আজ সেই দুরবীন-মারা বুড়ো বসে আছে, সব শালাকে চেনে। ওরই মধ্যে অভয় সট করে ঢুকে পড়ল, কিনেই ব্যাক, যা পেল তাই নিয়ে নিল। মাইরি. যতবার দোকানে ঢোকার জন্যে ট্রাই করতে যাচ্ছি, ঠিক একটা করে চেনা লোক সামনে, প্রফুল্ল মিত্তির থেকে শুরু করে সেই স্কুলের গীতা মাস্টারনী। সাত বার ট্রাই মেরে শেষে রকার্ট ব্রুস হয়ে দোকানে ঢুকতে পারলাম।

দাঁত দিয়ে বুলালি একটা সোডার বোতল খুলে ফেলল।

ভাঁড়গুলো ভিজে, অভয় বোধ হয় ভাঁড়গুলোকে খুব করে ভিজিয়ে ধুয়ে এনেছিল, যাতে শোষণ শক্তিটা কমে যায়।

ছোট ছোট মাটির ভাঁড়ে হুইস্কি আর সোডা ঢেলে ওরা খেতে লাগল। চানাচুর আর নোনতা ঝাল-বাদাম নিচ্ছিল মাঝে মাঝে।

মাথার ওপর শেষ আশ্বিনের আকাশ তারায় তারায় ভরে গেল. ঠাণ্ডা বাতাস বইছিল, শ্যাওলা আর জলজ উদ্ভিদের গন্ধ বাতাসে। চোরকাঁটায় ভরা মাঠ নিস্তব্ধ হয়ে চার বন্ধুর গলা শুনছিল।

সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসতেই ওরা উঠে পড়ল। মদের বোতলটা সূর্য প্রচণ্ড জোরে ঝিলের জলে ছুঁড়ে মারল। শব্দ হল। ওর দেখাদেখি বুলালি আরও জোরে একটা সোডার বোতল ছুঁড়ল জলে, আবার শব্দ হল। শেষ বোতলটা আকাশের দিকে উঁচু করে ছুঁড়ে অভয় বলল, 'যা শালা, ছ' আনা গচ্চা গেল।' সোডার বোতল দুটো ফেরত দেবার কথা ছিল।

সাইকেলে উঠে চারজনে ফিরতে লাগল, চারজনের হাতে মুখে সিগারেটের আগুন জ্বলছে টিপ টিপ করে।

ঝিলের মাঠ পেরিয়ে ওরা একটা কাঠের সাঁকোর ওপর এসে উঠল: পুরনো সাঁকো. কাঠের পাটাতনে শব্দ উঠল সামান্য, নীচে দিয়ে এক সময় বুঝি জলের একটি রেখা বয়ে যেত, এখন শুকনো, কিছু ময়লা আর ঝোপঝাড়ে ভর্তি; বুনো তুলসীর গন্ধের সঙ্গে কেমন একটা চাপা নোংরা গন্ধ মেশানো। সাঁকো ছাড়িয়ে এসে রাস্তা, ডান দিকে সাহেবের কবরখানা, কবরখানার ফটকের সামনে মস্ত মস্ত দুটো ইউকেলিপটাস গাছ, পাঁচিলের ওপাশে কবরখানায় ফুল ফুটেছে গাছে, শিউলি ফুলের গন্ধ। যেতে যেতে অভয়ের গলায় গান এসেছে, অভয় গলা ছেড়ে গান গাইতে শুরু করেছিল। বুলালি তার সাইকেল নিয়ে চক্কর মারার খেলা দেখাচ্ছিল: অভয়ের সামনে দিয়ে সোঁ করে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে আবার ফিরে এসে তিনজনকে বেড় দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছিল; যেতে যেতে আবার এগুচ্ছিল, পেছোচ্ছিল।

বড় রাস্তায় এসে হঠাৎ যেন চারজনে সাইকেল রেস লাগিয়ে দিল। সোঁ সোঁ করে শহরের এলাকার দিকে ছুটতে লাগল। মোটর গাড়ির আলো পড়ে মাঝে মাঝে ওরা ধুয়ে যাচ্ছে, আবার অন্ধকারে মিশে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে রাস্তার

আলো স্পষ্ট, লোকালয় নিকটবর্তী হল। আরও সামান্য এগিয়ে আসতেই নিউ টাউনের বারোয়ারি পুজোর মণ্ডপ চোখে পড়ল দূরে থেকে, এখনও কারা যেন ঢাক বাজাচ্ছে।

সূর্য বলল, "শর্ট কাট কর। তেঁতুলতলা দিয়ে যাব, ঘাঁটিপাড়া দিয়ে বাজারের মধ্যে, তারপর সোজা গণাদা..."

বুলালি তার সাইকেলসমেত একটা খানাখন্দের ওপর দিয়ে লাফ মারল, মেরে কাঁচা রাস্তা ধরল, অন্যরাও তার পিছু পিছু চলল। যেতে যেতে কৃপাময় বলল, "আমি একটা পান খাব মাইরি, একটু দাঁড়াস।"

পানের দোকান থেকে পান খেয়ে সিগারেট ধরিয়ে ওরা এ-রাস্তা সে-রাস্তা ধরে গলি দিয়ে দিয়ে ঘাঁটিপাড়ায় এসে গেল। ঘাঁটিপাড়ায় পুজোর প্যান্ডেলে আলো জ্বলছে, সাজানো গোছানো হচ্ছে তখনও, আজ ষষ্ঠীপুজো, একপাল বাচ্চা এখনও পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বাজারের একেবারে শেষ প্রান্তে এসে সদর রাস্তায় উঠতে ভিড়টা বেশ চোখে পড়ল। বাজার বেশ সরগরম; মানুষের ভিড়, দোকানের আলোগুলো যেন পাল্লা দিচ্ছে পরস্পরের সঙ্গে, ঝাঁকে ঝাঁকে রিকশা ছুটছে, প্রাইভেট গাড়ি-গুলো সার বেঁধে রাস্তার নালার পাশে দাঁড় করানো; বাস যাচ্ছে হর্ন মারতে মারতে ওরই মধ্যে রেডিয়ো বাজছে, ঝগড়াঝাটি চলছে। এক জায়গায় একপাল মেয়ে দঙ্গল বেঁধে রিকশা ভাড়া করছিল; সূর্য তাদের ঘাড়ের ওপর গিয়ে পড়ল প্রায়, সাইকেলের ঘণ্টি মেরে চেঁচিয়ে বলল, "রাস্তা ছেড়ে পাগলী, রাস্তা ছেড়ে, দমকল যাচ্ছে।" বলে হো হো করে হেসে উঠল।

বুলালি একেবারে সূর্যর পেছনে। মেয়েদের দিকে চেয়ে মহা ফূর্তির গলায় বলল, "আমি অ্যামবুলেন্স।"

চারজনেই অট্টরোলে হাসতে হাসতে মেয়েদের গা ছুঁয়ে চলে গেল। মেয়ের দল বলল, বাঁদর কোথাকার, কী অসভ্য সব।

আর খানিকটা এগিয়েই চৌমাথা, চৌমাথা ছাড়াতেই তুলসীর সঙ্গে দেখা। সূর্যরা যাচ্ছিল, তুলসী আসছিল; একেবারে মুখোমুখি হয়ে গেল। সাইকেলে ব্রেক মেরে সূর্য চেঁচাল, "অ্যাই—শালা!"

তুলসীও সাইকেলটা রাস্তার পাশের দিকে নিয়ে গিয়ে নেমে পড়ল। জায়গাটায় ভিড় থাকলেও, পেছনের দিকটায় গিজগিজে ভিড় নেই। সূর্য রাস্তার পাশে সরে এল, কৃপাময় আর অভয় সাইকেল থেকে নেমে দাঁড়াল; বুলালি সাইকেলটা এগিয়ে নিয়ে গিয়ে কৃপাময়ের কাঁধ ধরে সাইকেলেই বসে থাকল।

তুলসী বলল, "কি রে, কোথায় যাচ্ছিস সব?"

"যাচ্ছি এক জায়গায়, নে তুইও চল।" সূর্য হালকা গলায় বলল।

অভয় বলল, "কি রে, সেদিন তো এলি না? তোর জন্যে আমরা চায়ের দোকানে অনেকক্ষণ বসেছিলাম।"

বুলালি বলল, "একটা টাকা ফেল্, তোর জন্যে বসে থাকতে থাকতে এক্সট্রা

তুলসী হাসল; বলল, "সেদিন হল না, পোস্ট অফিসেই আসতে পারলাম না। সকালে একজন এসে এক জায়গায় নিয়ে গেল; কাজের ব্যাপার..."

"কি কাজ?" অভয় শুধলো।

"টিউশানি।...ক্লাব রোডের এক বাড়িতে নিয়ে গেল, কারখানার কোন অফিসারের মেয়ে, অঙ্ক শেখাতে হবে।"

"আরে সাবাস..." সূর্য সহর্ষে চেঁচাল, "বল্ শালা সরস্বতী মাঈ কি জয়!...তা কি রকম জিনিস রে? ফ্রক না শাড়ি?"

তুলসী হাসল। বলল, "টিউশানিটা হয়নি।"

"কেন?"

"কি জানি! হয়ত আমায় পছন্দ হয়নি।"

কৃপাময় এবার মুখ খুলল, বলল, "মাস্টার রাখবে, জামাই তো করবে না, পছন্দ না হবার কারণ?"

"কি করে বলব!...বাড়ির গার্জেন বললেন, একটা ক্যারেকটার সার্টিফিকেট আর হেলথ সার্টিফিকেট চাই!"

অবাক হল কৃপাময়রা। "বলিস কি রে? ভাগ্, গুল মারছিস।"

তুলসী হেসে জবাব দিল, "না রে, গুল নয়। ঠিক মুখেমুখে কথাটা বলেনি, তবে অ্যাটিচিউড্ সে রকম।" বলে একটু থেমে তুলসী যেন নিজেকেই বলল, "যা হেলথ্ আমার—লোকে বাড়ি ঢুকতে দিতে ভয় পায়।"

"গুলি মার শালা হেলথ্-এ!" সূর্য বলল, "তোর চরিত্তির তো সোনার জল করা রে, আমার বাপও তোকে সার্টিফিকেট দেবে।"

বুলালি রগড় করে বলল, "তা দেবে, তবে সূর্যকে সূর্যর বাপ সার্টিফিকেট দেবে না মাইরি।"

সূর্য মুখ ঘুরিয়ে বুলালিকে দেখে নিল। "মারব শালা এক লাথি.."

ওরা সকলেই হাসল।

কৃপাময় বলল, "তুই এখন কেমন আছিস?"

"ভাল", তুলসী জবাব দিল, সাধারণ গলায়।

"পেঁদানির ব্যথা গেছে?" সূর্য হেসে জিজ্ঞেস করল।

তুলসী হাসিমুখে বলল, "গেছে।"

বুলালি বলল, "সেই শুয়ারের বাচ্চাগুলো আবার রোয়াবী-টোয়াবী মারছে নাকি রে?...বল্ তাহলে একদিন—"

তুলসী মাথা নাড়ল, "না না, আর কিছু হয়নি।"

ওদের পাশ কাটিয়ে গাড়িঘোড়া চলে যাচ্ছিল, ভিড়ও হচ্ছে, একটা ঝকমকে গাড়ি সপ্তস্বর হর্ন বাজিয়ে পুচ্ছদেশে তিনচার রকমের আলো জ্বালিয়ে চলে গেল। ওরা দেখল, গাড়িটা শহরে নতুন এসেছে, কার গাড়ি এখন পর্যন্ত জানা যায়নি, অনুমান করা হচ্ছে কারখানার জেনারেল ম্যানেজারের। গাড়িটা চলে

পেলে ধুলোর সঙ্গে কেমন একটা গন্ধ উঠল।

তুলসী বলল, "তোরা বেড়াতে বেরিয়েছিস?"

"আমরা সেই ট্যাংকের মাঠে বসেছিলুম। একটু প্রসাদ চড়িয়ে বেরিয়ে পড়েছি। তোকে আগে পেলে শালা বিলিতী মাল খাওয়াতাম।" সূর্য হাসতে হাসতে বলল।

তুলসীও হেসে জবাব দিল, "খেয়েছিস যে সে বুঝতেই পারছি।"

"কি করে, গন্ধ পাচ্ছিস?"

মাথা নাড়ল তুলসী। "কই, তেমন না. .যাচ্ছিস কোথায়?"

"তুইও চল্।"

"আমি!...আমি কোথায় যাব, দেখছিস না উলটো দিকে যাচ্ছিলাম তোদের।" তুলসী হাসতে হাসতে বলল।

"চোপ্ শালা, সোজা চ, আমাদের সঙ্গে চল।...ভাল জায়গায় নিয়ে যাব, বড়কি. মেজকি, ছোটকি দেখবি. ." সূর্য বলল, বলে খপ্ করে তুলসীর সাইকেলের হ্যাণ্ডেল ধরে ফেলল।

"না রে—" তুলসী নরম গলায় বলল, "আমি আজ পারব না। আমার কাজ আছে।"

"পরে করবি, এখন চল। ..গণাদার বাড়ি যাচ্ছি। চোট্টা শালার কাছে। চল, কি রকম রামনায় চরছে গণাদা দেখে আসবি। তিন তিনটে বে, বুঝলি, ছুঁড়ির ট্রায়ো। কপাল শালা.."

তুলসী আস্তে করে সাইকেলটা টানল, বলল, "আমি তোদের খানিকটা এগিয়ে দিতে পারি, আমার যাওয়া হবে না।"

"কেন?"

"একবার বাড়িতে যাব—" বলে তুলসী তার সাইকেলের ক্যারিয়ারটা দেখাল। ক্যারিয়ারে একটা কাগজে মোড়া পুরু প্যাকেট দড়ি দিয়ে বাঁধা। তুলসী বলল, "আজ ষষ্ঠীপুজো, বাড়িতে মা'র কাছে এগুলো দিয়ে আসতে হবে, দু-একটা পুজোর কাপড়।"

ওরা চার বন্ধুই অবাক হয়ে তুলসীকে দেখল, তারপর ক্যারিয়ারটা আবার দেখল। শেষে তুলসীর মুখ দেখতে দেখতে সূর্য বলল, "তোর নতুন মা'র জন্যে পুজোর কাপড় কিনে দিয়ে আসতে যাচ্ছিস?"

তুলসী শান্ত নরম অথচ নিস্পৃহ গলায় বলল, "ওই মামুলী একটা করে, মা বাবা আর দুটো ভাইবোনের।"

বন্ধুরা কেমন চুপ। শেষে বুলালি কেমন খেপে গিয়ে রুক্ষ গলায় বলল, "তুই বাড়িতে থাকিস না, বাড়িতে যাস না, এত বাড়ির টান কিসের রে?"

তুলসী যেন খানিকটা অপ্রতিভ হল, অস্বস্তি বোধ করল। কয়েক মুহূর্ত কোনো কথা বলল না, পরে মৃদু গলায় বলল, "পুজোর সময়, সামান্য কিছু দেওয়া—মানে বাড়িতে দেওয়া কর্তব্য রে, ওরা রয়েছে..."

সূর্য কি যেন বলতে যাচ্ছিল মুখ খারাপ করে, কৃপাময় আড়ালে সূর্যর পিঠে কনুই দিয়ে গুঁতো মারল, তারপর তাড়াতাড়ি তুলসীকে বলল, "ঠিক আছে, তুই যা; কেটে পড়। আমরা যাই।...নে সূর্য চল..."

আবার সাইকেলে উঠল সবাই। তুলসীও উঠল। বলল, "চল, একটু এগিয়ে দিই তোদের।"

চার বন্ধুর পাশাপাশি তুলসীও এগুতে লাগল। ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, আড়ালে কোথাও ঢাক বাজছে, পাকা হাতের বাজনা নয়, পুজোমণ্ডপে কেউ শখ করে বাজাচ্ছিল। রাস্তায় আলো এবার কমে আসছে। আশ্বিনের আকাশে তারা। খুব মিহি আলোমাখানো আকাশতল। বাতাস ঠাণ্ডা। পথ দিয়ে সাইকেল রিকশা গেল, বাস গেল; একটা ট্যাক্সি ছেলেমেয়ে কর্তা-গিন্নী বোঝাই হয়ে চলে যাবার সময় কোনো বাচ্চা পোঁ-বেলুন বাজাতে বাজাতে চলে গেল।

খানিকটা এসে তুলসী কিসের একটা হাসির কথায় হাসছিল, কৃপাময় হঠাৎ বলল, "তুলসী, আর না, তুই এবার যা..."

তুলসীও দেখল সে চড়াইয়ের কাছে চলে এসেছে। সাইকেলটা ধীরে করে নিয়ে বলল, "আমি ফিরি রে, পুজোর মধ্যে একদিন যাব।"

"ধাপ্পা ছাড়! তুই আব এসেছিস..." বুলালি বলল।

"যাব বে, মাইরি যাব।"

"দেখি..."

"বাড়িতে একদিন আসবি, তুলসী", অভয় বলল, "কথা আছে।"

"যাব।.. সূর্য, চলি. ."

"যা শালা, যা "

কৃপাময় অস্পষ্ট করে বিদায় জানাল· "আয়, সামলে যাবি।"

সাইকেল ঘুরিয়ে নিয়ে তুলসী চলে গেল। সূর্যরা এগিয়ে যেতে লাগল। সামনে চড়াই, প্রথমটায় পায়ের জোরে সাইকেলের গতি সমান থাকলেও পরে কমে আসতে লাগল। সাইকেলগুলো এঁকেবেঁকে, কখনও মাঝমাঝিখানে, কখনও পাশ দিয়ে চলছিল। কোথায় যেন মস্ত একটা গাছের মাথায় বাতাস লেগে ডালপাতা কাঁপার শব্দ উঠছে, পারিজাত সিনেমার আলো দেখা যাচ্ছে দূরে, অন্ধকার থেকে বুনো ফুলের মৃদু গন্ধ এল, আলোর ফোয়ারা ছুটিয়ে পেছন থেকে গাড়ি আসছে, সূর্যরা একে একে পাশে সরে যেতে লাগল।

গাড়িটা পাশ দিয়ে চলে যাবার পর কৃপাময় পেছন দিকে তাকাল। তুলসীকে আর দেখতে পাবে এমন প্রত্যাশা তার ছিল না; তবু পিছু ফিরে তাকাল। তুলসীকে দেখতে পেল না। সে উলটো পথ ধরে চলে যাচ্ছে।

কি যেন ভাবল কৃপাময়, অনেকক্ষণ থেকেই ভাবছিল বোধ হয়, এবার দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলল, "বুঝলি সূর্য, তুলসীটার আলাদা রাস্তা। আমাদের সঙ্গে মিছে ওকে টেনে আনতে চাইছিলি..."

সূর্যও যেন কি ভেবে বলল, "ব্যাটা আবার আমাদের এগিয়ে দিতে

আসছিল..."

কৃপাময় জবাব দিল না। তুলসী ওদের সঙ্গে খানিকটা এসেছিল বই কি, কিন্তু আর না, আর আসতে পারবে না। ওর রাস্তা এটা নয়।

পিছনে তাকিয়ে কোথাও তুলসীকে দেখা না গেলেও কৃপাময় যেন অনুভব করতে পারছিল তুলসী আব তাদের মধ্যে কোথাও নেই, একলা রুগ্ণ শরীরটা টেনে নিয়ে নিয়ে তার নিজের রাস্তায় সে চলে যাচ্ছে।

তুলসীব জন্যে কৃপাময়ের কোথায় যেন মমতা ও আনন্দ জমছিল, ভাল লাগছিল। অথচ বেদনাও।

১৪

বাড়িতে গণনাথকে পাওয়া গেল। ডাক শুনে নীচে নেমে এসে গণনাথ সূর্যদের দেখল। বলল, "ও, তোরা! আয়, ভেতরে আয়।"

সদর দিয়ে ওরা সাইকেলগুলো ভেতরে ঢোকাল। দোতলার কাঠের সিঁড়ির গায়ে, পাশের দেওয়ালে সাইকেলগুলো ঠেস দিয়ে রাখল একে একে। নীচে আলো জ্বলছিল না, দোতলায় লণ্ঠন জ্বলছে।

গণনাথ বলল, "চল্, ওপরে চল্।"

কাঠের সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার সময় গণনাথ সাবধান করে দিল, সামনে উঠিস, খুব সরু সিঁড়ি। কাঠের সিঁড়িতে পায়ের শব্দ করে করে ওরা উঠল, দোতলার ফালি বারান্দার ছাদ কৃপাময় আর সূর্যর মাথায় লাগছিল প্রায়।

গণনাথের ঘরে লণ্ঠন জ্বলছে, পাশে নয়নার ঘরেও আলো ছিল। দরজার সামনে জুতো খুলে গণনাথের ঘরে এল ওরা; মেঝেয় শতরঞ্জি পাতা, গণনাথের ক্যাম্প খাট একপাশে সরিয়ে রাখা রয়েছে, শতরঞ্জির একদিকে কিছু কাটা ছিট কাপড়, ফিতে, লাল-নীল পেন্সিল, খাতা একটা। বড় দরজি-কাঁচিটা ছিট কাপড়ের ওপর চাপা দেওয়া। অন্য পাশে কয়েকটা বড় বড় বাঁধানো লম্বা লম্বা খাতা, কিছু কাগজপত্র, বিড়ির বাণ্ডিল, দেশলাই, ছাই ফেলার কৌটো।

সূর্যরা চারপাশে তাকিয়ে ঘরটা দেখছিল। টিনের ঘর, ছোট ছোট জানলা, বাতাস আসছে ফুর ফুর করে। শতরঞ্জির দিকে তাকিয়ে কৃপাময় বলল, "গণাদা কি দরজির কাজে লেগে গিয়েছ নাকি?"

"না রে, এখনও যাইনি; তবে যাব—" গণনাথ হাসিমুখ করে বলল, "নয়না কাজ করছিল, তার পুজোর অর্ডার. ষষ্ঠী হয়ে গেল আজ, দিতে পারছে না, গালাগাল খাচ্ছে।...কই, বোস তোরা—বোস।"

শতরঞ্জির ওপরই বসল ওরা। গণনাথ বলল, "একটু চা খা—"

সূর্য মাথা নাড়ল, "না, চা খাব না এখন।"

গণনাথ বলল, "পুজোর দিন এলি, শুধু মুখে যাবি—, খা একটু।"

বুলাল বলল, "শুধু মুখে নেই আমরা, একটু করে হয়েছে...।" কথাটা বলতে বুলালির কোথাও আটকাল না। আটকাবার কারণ ছিল না, গণাদা জানে, তারা মাল খায়।

গণনাথ মৃদু হাসল। "ভালই করেছিস। তবু একটু হোক—" বলে নয়নাকে

ডাকল।

ও ঘরে নয়না সেলাই করে একটা জামা ফেলেছিল সদ্য সদ্য। সময় অপব্যয় করার মতন অবস্থা তার নয় এখন। রত্নাকে দিয়ে সোজা সেলাইগুলো সারাচ্ছে, আর নিজে জামাগুলো কেটে নিচ্ছে। গণনাথের ঘরেই ছিল এতক্ষণ নয়না, কাজ করছিল, সেলাই মেশিন চালাচ্ছিল রত্না এঘরে; সূর্যরা আসায় নয়না এঘরে এসেছে; এসে বোনের হাত থেকে একটা ব্লাউজ নিয়ে হাতের পটিটা জুড়ে দিতে যাচ্ছিল। গণনাথের ডাক শুনে উঠল।

নয়না দরজার কাছে এসে দাঁড়াল।

গণনাথ ডাকল, "ভেতরে এস।...এদের চেনো তো?"

নয়না ভেতরে এল, চৌকাঠ ছাড়িয়ে দাঁড়াল। সকলকেই সে চেনে। নিতান্ত ভদ্রতার হাসি হেসে সূর্যদের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "বেশ চিনি। কি গো, চিনি না?"

অভয় আর কৃপাময় মুখের হাসি হাসি ভাব করল সামান্য; সূর্য অন্য দিকে তাকিয়ে থাকল, বুলালি নয়নার বেয়াড়া বুক দেখছিল।

নয়না অভয়কে লক্ষ্য করে বলল, "বাড়ির সবাই ভাল আছেন?"

অভয় মাথা নাড়ল। ভাল।

গণনাথ বলল, "তোমার উনুন তো নিবিয়ে রেখেছ। কেরাসিন-স্টোভে এদের একটু চা করে দাও না, আমিও খেতাম। পুজোর দিন মিষ্টি মুখ তো হবে না, চিনি-মুখ করে যাক।" বলে গণনাথ হাসল।

নয়না বলল, "রত্নাকে বলছি, করে দিচ্ছে।"

নয়না চলে গেল। বোঝাই যায়, সূর্যদের দেখে সে খুশী হয়নি। গণনাথ নিজেই উঠে গেল সদর দেখতে, নয়ত নয়না বোধ হয় এদেব বাড়ি ঢুকতে দিত না আগেব মতনই।

বারান্দা দিয়ে লণ্ঠন হাতে করে কে চলে গেল, হয়ত রত্না। পাশের ঘর অন্ধকার হয়ে থাকল। যমুনা কোথায়? যমুনাকে দেখার কৌতূহল বোধ করছিল অভয়।

গণনাথ একটা বিড়ি ধরাল। বিড়ি ধরিয়ে বলল, "তারপর? কি খবর বল? এবার পুজো কেমন হচ্ছে?"

গণনাথকে বেশ শীর্ণ দেখাচ্ছিল। চুলগুলো রুক্ষ। মুখ শুকনো, ক্লান্ত। চোখের তারা হলুদ হয়ে এসেছে। গায়ে একটা ময়লা গেঞ্জি, পরনে খয়েরী রঙের লুঙ্গি। দাড়িও বোধহয় কামায়নি গণনাথ, গাল ময়লা দেখাচ্ছিল।

কৃপাময় বলল, "পুজো তো বেশ জোরই লেগেছে। ..তোমার খবর কি?"

"এই তো একরকম।" গণনাথ উদাস গলায় বলল, বলে খাতাপত্রর দিকে তাকাল।

সূর্য গণনাথের দিকে তাকাল। "তুমি দোকানে যাও না?"

গণনাথ সূর্যর চোখমুখ দেখল। কিছুটা যেন অপ্রস্তুত। বলল, "না, আজ

ক'দিন আর যেতে পারছি না। তুই গিয়েছিলি দোকানে?"

"কাল গিয়েছি, পরশু গিয়েছি—"সূর্য অত্যন্ত বিরক্ত ও অধৈর্য। "যেদিনই যাই—তোমার দোকানে তালা ঝুলছে।"

"পরশু সকালে একবার গিয়েছিলাম," গণনাথ লজ্জিত, বিব্রত গলায় বলল। তারপর সামান্য থেমে বলল, "দোকানে তালাই ঝুলিয়ে দেব বরাবরের মতন, বুঝলি।...আর পারছি না, ধার-দেনা; যাতেই হাত দিই তাই পিছলে যায়। আমার সেই শ্রীবৎস রাজার অবস্থা, শনিতে ধরেছে..."

অভয় মুখ টিপে নোংরাভাবে হাসল, "তবু ভাল, হাত থেকে সোল মাছটা তো আর পালায়নি।" বলে অভয় বুলিকে আড়ালে টিপল। সোল মাছের ব্যাপারটা বুলি জানত না, অভয়ও ঠিক জানত কি না সন্দেহ! তবু এখানে কথাটার যে অর্থ বুলি তা বুঝল, বুঝে মজা পেল।

গণনাথ বোধ হয় অন্যমনস্ক ছিল, ভাল শুনতে পেল না, খেয়াল করল না। কৃপাময়ের দিকে তাকিয়ে হতাশ গলায় বলল, "এই দেখ না, খাতাপত্তর নিয়ে বসেছি। একটা হিসেব করছি। অনেক দেনা রে, পাওনা তো কেউ ঠেকায় না।... দোকান ভাড়া জমে গেছে ক'মাসের।...কেউ যদি কেনে সব বেচে দিই।"

সূর্য রুক্ষভাবে বলল, "আমাকে দেখলেই তোমার কাঁদুনি শুরু হয়।... আজ আমি কিছু শুনব না।"

গণনাথ শান্ত হয়ে থাকল। সূর্যর অপ্রসন্ন, বিরক্ত, ক্রুদ্ধ মুখ দেখতে দেখতে বলল, "তোকে দেখে কেন, এখন সকলের কাছেই কাঁদুনি গাইতে হচ্ছে।" গণনাথ নরম গলায় হাসি মুখে বলার চেষ্টা করল, যেন সূর্যর গরম মাথা ঠাণ্ডা রাখতে চাইছে।

সূর্য বলল, "সে তুমি কাঁদো গে যাও, আমার কি! আমি আমারটা বুঝি, সাফ কথা।"

গণনাথের বিড়ি নিবে গিয়েছিল, টুকরোটা কৌটোর মধ্যে ফেলে দিল। "তুই আমায় এ-রকম কেন করছিস, সূর্য?"

"আমি করছি, না তুমি করছ?...তুমি আজ ক'মাস ধরে আমার সঙ্গে স্যান্‌টিং করছ!"

বুলি বলল, "তুমি ওকে হায়রানি করছ, গণাদা। বললে তো হবে না, আমরা সাক্ষী রয়েছি।"

অভয় বলল, "স্ট্রেট কথা ওকে বলে দাও না, ধাপ্পা মারছ কেন!"

গণনাথ বলল, "স্ট্রেট কি বলব?"

"ধুঃ, সে তুমি জানো", অভয় জবাব দিল; "বলে দাও, তুমি দেবে না; তোমার এখন বহুত পুষ্যি, অনেক খরচ।"

অভয়ের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকল গণনাথ, "বহুত পুষ্যিটা কি, কিসের খরচ?"

অভয় কয়েক মুহূর্ত কথা বলতে পারল না; পরে বলল, "এস্তগুলো

লোক,—খরচা নেই!" বলে হাত নেড়ে ইশারাতে অভয় এ-বাড়ির লোকদের বোঝাল।

গণনাথ এবার বিরক্ত হল, বিদ্রূপ করেই যেন বলল, "তুই খরচের কথা বুঝিস?"

গণনাথ যেভাবে কথাটা বলেছিল, যে অর্থে, অভয় সেটা বুঝল কি না বলা যায় না। বুঝে থাকলেও তার গায়ে লেগেছিল। একেবারে অন্য দিক থেকে খোঁচা দিল অভয়। "বুঝি বই কি", অভয় বাঁকা করে হাসল, "পোষার খরচা কি কম!"

গণনাথের শুকনো ম্লান মুখ কেমন সঙ্কুচিত হল অপমানে। অভয়ের মুখের দিকে আর তাকিয়ে থাকতে পারল না। বলল, "মুখ আলগা করে কথা বলিস না, ভালভাবে কথা বল।"

সূর্য রুখিয়ে উঠল, "ভালভাবে কথা বলার কি আছে, তোমার সঙ্গে অনেক ভালভাবে কথা বলেছি।"

গণনাথ এবার কঠিন হল। "তুই কি আমার সঙ্গে খারাপভাবে কথা বলতে এসেছিস আজ? শাসাবি তোরা?"

"ভাল খারাপ জানি না", সূর্য তেরিয়া হয়ে বলল, "আমার জিনিস ফেরত দিয়ে দাও।"

গণনাথ ক্রমশই কঠিন হয়ে উঠছিল, উত্তেজিত হচ্ছিল। বলল, "তোকে আজ পর্যন্ত আমি কত টাকা দিয়েছি?"

"জানি না। পঁচিশ ত্রিশ টাকা ঠেকিয়েছ।"

"না; ষাট টাকা। আমার হিসেব লেখা আছে।"

"ও হিসেব তুমি দেখ গে যাও, আমার জিনিস আমায় দাও।"

"জিনিস ফেরত দেবার কথা ছিল না", গণনাথ এবার কেমন জেদ করে বলল, "তুই আর পনেরো বিশ টাকা পাবি, পরে দেব।"

"না", সূর্য সঙ্গে সঙ্গে রুক্ষ গলায় চেঁচিয়ে উঠল; "তুমি চোট্টা, তুমি আমার জিনিস ফেরত দাও।"

"বলেছি তো, জিনিস ফেরত দেবার কোনো কথা ছিল না।" গণনাথ শক্ত গলায় বলল।

সূর্যর চোখ মুখ লাল হয়ে ভীষণ হয়ে উঠছিল; বুলিলও রেগে উঠছে। কৃপাময় এতক্ষণ কোনো কথা বলেনি; ঘরের আবহাওয়া খারাপ হয়ে উঠছে দেখে সে অস্বস্তি বোধ করল। সূর্যরা যে মাতাল হয়ে এসেছে তা নয়, তবু বলা যায় না, মদের গরম খানিকটা হয়ত আছে; সূর্যই সবচেয়ে বেশি খেয়েছে, কৃপাময় প্রায় খায়নি। তাছাড়া জিনিসটা সূর্যর দরকার, বাড়িতে ধরা পড়ে গেছে।

কৃপাময় গণনাথকে বোঝাবার চেষ্টা করে বলল, "গণাদা, জিনিসটা ওর দরকার! সত্যিই দরকার।...তুমি কাকে বেচে দিয়েছ?"

গণনাথ কৃপাময়কে দেখল একটু, বলল, "যাকেই দিই, সেটা আলাদা কথা। ও পনেরো-বিশটা টাকা আর পাবে।...আমি দেখছি, নয়নার কাছে থাকলে এনে দিচ্ছি...নয়ত কাল-পরশু টাকাটা দিয়ে দেব।"

সূর্য রাগে দিশেহারা হয়ে চেঁচিয়ে বলল, "পনেরো-বিশটা টাকা!—আমায় তুমি ভিখিরী পেয়েছ! চোট্টা কাঁহাকার! আমি যা দিয়েছিলাম তার দাম সত্তর টাকা?"

গণনাথও এবার ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। "সূর্য, বেশি বাড়াবাড়ি করবি না।"

"আলবত করব!...তুমি সোনার পিদ্দিম বেচে আমায় শালা সত্তর টাকা দিতে এসেছ! জীবনে কখনও দেখেছ ওরকম পিদ্দিম!...হারামীগিরি!"

সোনার প্রদীপ! বুলালি জানত না, অভয় জানত না, কৃপাময় সামান্য জানত। অভয় আর বুলালি অবাক হয়ে সূর্যর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর তাকাল গণনাথের দিকে। আরে ব্বাস, গণাদা সোনার পিদ্দিম মেরে নিয়েছে সূর্যর কাছ থেকে!

গণনাথের চোখ আরও যেন হলদেটে হয়ে এল, রাগে তার হাত কাঁপছিল। গণনাথ নিজের সংযম হারাল, ধমকে উঠে বলল, "সূর্য, আমি তোর ইয়ারদোস্ত নই। আমায় চোখ রাঙাবি না। তুই ভাবিস না, আমি মরে গেছি।"

অনেকদিন পরে সেই পুরনো গণনাথের ঝলছে-ওঠা চোখ ও গলার স্বর যেন ধরা পড়েছিল, কিন্তু তা সাময়িক। সে গণনাথ আর নেই। সূর্যরাও আর পুরনো দিনের সূর্য নয়, গণনাথের ধমকানিতে তারা সঙ্কুচিত, ভীত হয় না।

বুলালি চটে উঠে বলল, "চোখ তো তুমি রাঙাচ্ছ!...বোর সময় নিলে এখন উলটে ওকেই রোয়াব দেখাচ্ছ।"

গণনাথ বলল, "শাট আপ।...তুমি কে? তোমাব সঙ্গে কথা হচ্ছে না।"

সূর্য মেঝেব ওপব থাপ্পড মারল জোরে, "আলবাত ও কথা বলবে।...শালা চোর চোট্টা কাঁহাকার "

"সূর্য—!"

"গরম দেখিও না; ভাল হবে না বলছি ."

"কি করবি, মারবি?"

"মেবে পুঁতে রেখে দিয়ে যাব।..."

গণনাথ বাগেব মাথায় কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়ে উঠে দাঁড়াল, রাগে হাত-পা থর থর করে কাঁপছে। সোজা দরজার দিকে আঙুল দেখাল, "যা, বেরিয়ে যা!...হঠ্। চলে যা এখান থেকে; বদমাশ, পাজী, লোফারের দল সব।...চলে যা, বলছি।"

মুহূর্তের জন্যে সূর্যর যেন কেমন হয়েছিল, তারপর লাফ মেরে উঠে দাঁড়াল। "আমরা লোফার, আর তুমি শালা তিনটে মাগী নিয়ে ঘরে হারেম বসিয়েছ। লোকের পয়সা মেরে খাচ্ছ! তুমি শালা কি?"

দেখতে দেখতে কেমন হয়ে গিয়েছিল সব। বুলালিরা উঠে দাঁড়িয়েছিল সকলেই; নয়না ওঘব থেকে ছুটে এল; রত্নাও এসে বাইরে দাঁড়িয়েছে।

গণনাথ আর বিন্দুমাত্র প্রকৃতিস্থ ছিল না; তার সর্বাঙ্গ কাঁপছিল, গলা বসে, ভেঙে, কিম্ভুত শোনাচ্ছিল। গণনাথ বলল, "মাতাল, লোফার, লোচ্চার দল কাঁহাকার!...বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা বলছি।"

"চোপ রাও, শালা চোট্টা, হারামী..." সূর্য বাড়ি ফাটিয়ে চিৎকার করল।

নয়না এই গোলমালের মধ্যে ভীত, বিহ্বল গলায় বলতে লাগল: "কি হচ্ছে কি তোমাদের! কি করছ তোমরা? একি ছোটলোকামি হচ্ছে বাড়ির মধ্যে? এটা কি গুণ্ডামি করার জায়গা?...যাও, যাও, তোমরা যাও। আমি টাকা দিয়ে দিচ্ছি! ছি ছি, কী ইতরোমি! গণনাথ, তুমি যাও—ওঘরে যাও..."

নয়নার কথায় কেউ কান করল না। গণনাথকে চারপাশ থেকে বুললিরা ঘিরে ফেলেছিল।

গণনাথ বেপরোয়া, মরিয়া। হিংস্র চোখে সূর্যর দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি চোট্টা? আচ্ছা, আমি তোর বাবার কাছে যাব..."

"বাবার কাছে কেন? আমার কাছে বলো..." সূর্য দাঁতে দাঁত ঘষে গণনাথের চোখের দিকে শয়তানের চোখে তাকিয়ে থাকল। তার হাতের মুঠো শক্ত; যে কোনো সময় গণনাথের মুখে নাকে পড়তে পারে।

"তোর সঙ্গে আমার কোনো কথা নেই—"

"আলবাত আছে। বাবার কাছ থেকে তুমি ভিক্ষে চেয়েছিলে না আমার কাছে! এখন বাবা দেখাচ্ছ—"

"না। আমি তোর বাবার কাছে গিয়ে ফেরত দেব।"

"পিদ্দিমটা?"

"হ্যাঁ।"

"আমার কাছে দাও" সূর্য খাঁ হাত বাড়াল। জানত না, জিনিসটা গণনাথের কাছে আছে কি না! এখন জানল, জেনে এমন ভাবে কথা বলল যেন জিনিসটা না নিয়ে সে আর নড়বে না। "তোমার চোট্টামি আমি জানি। আমাদের কাটিয়ে দিয়ে তুমি ভেগে থাকবে।"

নয়না বলল, "আছে তোমার কাছে? দিয়ে দাও, দিয়ে এই জঞ্জাল বিদেয় কর।"

অভয় সঙ্গে সঙ্গে নয়নাকে বলল, "জঞ্জাল বলবেন না; আমরা জঞ্জাল হলে আপনারা কি? হারেমের মাল?"

গণনাথ ঠাস করে এক চড় মারল অভয়ের গালে, "ইতর, জন্তু কোথাকার..." ঠেলে দিল অভয়কে, দিয়ে ঘরের ওপাশে দেওয়ালের কাছে গিয়ে তার বাক্সটা খুলতে বসল।

অভয় আচমকা চড় খেয়ে বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল, তারপর সেও ক্ষিপ্ত হয়ে মারার জন্যে এগুচ্ছিল, কৃপাময় হাত ধরে টেনে রাখল।

বাক্সর ডালা উঠিয়ে গণনাথ যা পারছিল বের করে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছিল, লণ্ঠনের আলো অতটা যেন পৌঁছোয়নি, ঘোলাটে হয়ে আছে। বাক্স থেকে

উন্মত্তের হাটকে জিনিসপত্র ফেলতে ফেলতে গণনাথ বলল, "আমি চোর!... তোরা আমায় চোর বললি!...আচ্ছা, এর জবাব আমি দেব। ঘরের অমন জিনিস তুই চুরি করে এনেছিলি, বেচে দিতিস।...আমি নিয়ে রেখে দিয়েছিলাম, তোকে নিজের থেকে টাকা দিয়েছি; ভেবেছিলাম তোকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে একদিন বাড়িতে রেখে আসতে বলব।...তোর বাবাকে আমি দিয়ে আসতে পারতাম শুয়োর, তোর দিদিকে দিয়ে আসতে পারতাম, দিইনি—তুই ধরা পড়ে যাবি বলে!...তুই আমায় চোর চোট্টা ভাবলি। আমি চোর চোট্টা, না তোরা!...আমি নিয়ে না রাখলে ও জিনিস তুই আর ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতিস, রাস্কেল স্কাউন্ড্রেল! বেচে দিতিস, দিয়ে মদ খেতিস...। অমন পুরনো সুন্দর জিনিসের মর্ম বোঝার ক্ষমতা আছে তোর, ইডিয়েট!...আঃ, দেখতে পাচ্ছি না। নয়না, আলোটা দাও।...দিয়ে দিই খুঁজে ওর জিনিস, নিয়ে বেরিয়ে যাক এ বাড়ি থেকে।..."

নয়না লণ্ঠনটা উঠিয়ে নিয়ে গণনাথের সামনে গিয়ে দাঁড়াল, ডালা-খোলা বাক্সর ওপর ধরে থাকল আলোটা। বাক্সর মধ্যে আর বিশেষ কিছু ছিল না; তলানির মতন কয়েকটা জিনিস পড়েছিল: সার্টিফিকেট, ডিগ্রীর কাগজ, নষ্ট-হয়ে-যাওয়া ইনসিওরেন্স পলিসি, পোস্টাফিসের পুরনো পাস বই, মা-বাবার একটা বিবর্ণ ফটো, দু-তিনটে বই, কর্মযোগ, সঞ্চয়িতা, পকেট সাইজের বাইবেল, দুটো ছেঁড়া ধুতি, একটা পাঞ্জাবি, ন্যাপথলিনের গুলি...। গণনাথ হাতড়ে দেখল, পেল না। বাক্স থেকে টান মেরে মেরে আগে যা বের করে মাটিতে ছড়িয়ে রেখেছিল, আবার সেগুলো খুঁজল। নয়না লণ্ঠন ধরে থাকল। এপাশ ওপাশ হাতড়ে হাতড়ে, জিনিসপত্র উঠিয়ে পাগলের মতন গণনাথ খুঁজছিল।

নয়না বলল, "পাচ্ছ না?"

"না।"

"কোথায় রেখেছিলে?"

"এই বাক্সে। একটা কাগজে মুড়ে রেখে দিয়েছিলাম একপাশে।"

"কি মুশকিল, যাবে কোথায় তবে?" কি রকম জিনিস...?"

"সোনার একটা পঞ্চমুখী পিদ্দিম..."

সূর্যরা সামান্য তফাতে দাঁড়িয়েছিল। তাদের পায়ের তলায় গণনাথ; অবনত, বিভ্রান্ত, বিহ্বল, ভীত। ব্যাকুল, বিস্মিত এবং উৎকণ্ঠিত গণনাথকে মৃগয়ার পশু বলে মনে হচ্ছিল। যেন আর সে পালাতে পারবে না, চারদিক দিয়ে ঘেরা পড়ে গেছে।

ব্যাকুল, অস্পষ্ট স্বরে গণনাথ নয়নার দিকে তাকিয়ে বলল, "কি হল নয়না? আমার এই বাক্সেই ছিল। ক'দিন আগেও আমি দেখেছি! কে নিল?"

সূর্য বলল, "কে নিল! ধাপ্পা মারছ!...ধুলো দিচ্ছ আমাদের চোখে! শালা, ফল্‌স্‌ প্লে করছ।"

গণনাথ উন্মাদের মতন বলল, "ছিল। বাক্সে ছিল।"

"চোট্টা কাঁহাকার। বেচে দিয়ে তুমি আমাদের কাছে যুধিষ্ঠির সাজছ।"

"না, আমি বেচিনি। ভগবানের দিব্যি।" গণনাথ শেষবারের মতন চেষ্টা করল বিশ্বাস করাতে। "ছিল, সত্যি ছিল; আমি রেখে দিয়েছিলাম।"

"ছিল তো উড়ে গেল—!" বুলালি বলল, "তুমি কেন বাজে ভাঁওতা মারছ! সোজাসুজি বল, বেচে দিয়েছ।"

"না।"

"হ্যাঁ; তুমি বেচে দিয়েছ।...এত বড় হারেম পুষছ তুমি তোমার এজেন্সির পয়সায়? গণেশ-ওলটানো এজেন্সি তোমার...আমরা জানি না!"

গণনাথ হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ছুটে বুলালিকে মারতে এল। "কি! ইতর, নচ্ছার লোফার। জুতো মেরে মুখ ছিঁড়ে ফেলব।...জিব ছিঁড়ে নেব তোর।"

গণনাথ কাণ্ডজ্ঞানহীনের মতন হাত ছুঁড়ছিল, গালাগাল দিচ্ছিল। তার আগেই বুলালি একটা ঘুঁষি চালাল। নয়না চিৎকার করে উঠেছিল। গণনাথ পাগলের মতন বুলালির গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বুলালি লাথি মারল। ঘুঁষি চালাল। সূর্য হঠাৎ পায়ের তলা থেকে ছিট কাপড়ের ওপর রাখা কাঁচিটা তুলে নিল মুঠোয়। টেনে একটা লাথি মারল গণনাথকে। ঘুঁষি এবং বার বার লাথিতে, জাপটাজাপটির মধ্যে গণনাথ টাল রাখতে না পেরে মাটিতে পড়ে গিয়েছিল।

গণনাথ টলতে টলতে উঠতে যাচ্ছিল। সূর্য বলল, "খুন করে ফেলব, শালা।...শয়তানি। চোর চোট্টা, হারামী কাঁহাকার। আয়..." সূর্যর গলার স্বর, চোখ কোনোটাই আর মানুষের মতন ছিল না। কাঁচিটা মুঠোয় শক্তভাবে ধরা, ছোরার মতন।

নয়না ছুটে গিয়ে গণনাথকে জাপটে ধরল। "ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও! খুনোখুনি করবে নাকি! তোমার পায়ে পড়ি..."

কৃপাময় সূর্যকে ধরে ফেলল। "আ, সূর্য...সূর্য..কি করছিস!"

"শালাকে আমি খুন করব।...হারামী কাঁহাকার।"

গণনাথের ঠোঁট কেটে রক্ত পড়ছিল, চশমাটা পড়ে ভেঙে গেছে, কাঁচে গাল কেটেছে। গণনাথ হাঁপাচ্ছিল।

কৃপাময় সূর্যকে টানতে লাগল, "চলে আয়...। সূর্য, আর না। চলে আয়।"

অভয়ও বুলালিকে ঠেলছিল।

নয়না কেঁদে ফেলেছিল। "তোমাদের পায়ে পড়ি—তোমরা যাও, তোমরা যাও।"

রত্না বারান্দায় কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে।

আসার আগে সূর্য বলল, "আমার জিনিস বেচে খেয়ে আবার রোয়াব! কুত্তার মতন পা চাটবি শালা, তা না বড় বড় বাত ঝাড়ছে! ওরকম যুধিষ্ঠির আমরা অনেক দেখেছি বে! শালা এখানে এসে বসে মাগী নিয়ে কারবার

ফে'দেছে, আবার চেল্লায়।"

সূর্যকে টানতে টানতে নিয়ে চলে গেল কৃপাময়। বারান্দায় এসে হাতের কাঁচটা অন্ধকারে ছুঁড়ে দিল সূর্য।

ঘরের ভেতরে নয়না উৎকণ্ঠা-উদ্বেগে কাঁদছিল। "এ কি করলে তুমি! এখন আমি কি করি! ইস...মুখটা চাপা দাও, কী ভাবে কেটেছে, জল দেবে চলো।... রত্না...রত্না..."

গণনাথ কে'দে ফেলেছিল। "নয়না, কে চুরি করে নিল...কে নিল?"

নয়না বলল, "তোমার ঘরদোর জিনিসপত্র সবই যমুনা গোছ করত।... যমুনাকে দেখছ না আজ ক'দিন কেমন করছে...তার আপিসের ছোঁড়াকে নিয়ে...।"

ওরা ততক্ষণে জুতো পায়ে গলিয়ে কাঠের সি'ড়ি কাঁপিয়ে নীচে নেমে গেছে। তারপর সাইকেল তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল। মাঠকোঠা বাড়িটা হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে এল, যেন বাড়িটা একেবারে ফাঁকা হয়ে গেছে।

অনেকটা রাত পর্যন্ত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরল ওরা, উদ্দেশ্যহীন; এ-গলি ও-গলি, বড় রাস্তা, ছোট রাস্তা, বাজারের পেছন দিককার গণেশ শাউয়ের দোকান থেকে দিশী মদ খেল খানিকটা, মুখ ভর্তি করে পান চিবোতে লাগল। তারপর আবার ফাঁকায় এসে পড়ল।

কৃপাময়ের ইচ্ছা ছিল না, সূর্য আর বেশি ঘোরাঘুরি করে. রাত হয়ে গেছে, প্রায় দশটা। কৃপাময় বলল, "বাড়ি যা, রাত হয়ে গেছে।"

"যাব," সূর্য জড়ানো গলায় বলল, "দাঁড়া না। পুজো তো এখন।"

চারটে সাইকেল আস্তে আস্তে এক পুরনো গলির পথ ধরল। সরু, ছোট গলি; বোধহয় এ-শহরের সবচেয়ে পুরনো। রাত হয়ে যাওয়ায় পাড়াটা নিস্তব্ধ হয়ে আসছিল। যেতে যেতে সূর্য বলল, "বাবা মাইরি আবার ডাকবে।"

"কেন?" বুললি শুধলো।

"ওই শালার পিদ্দিম।" সূর্য এখন যেন সত্যিই ক্লান্ত, প্রদীপের চিন্তাটা আর করতে পারছে না, ভালও লাগছে না। প্রদীপটার এত ইতিহাস আছে সে কি জানত! জানত না। তার জানার কথাও নয়। বাবা বলল, তাই জানল সূর্য! সামান্য চুপচাপ থেকে বলল, "আমি বলেছি, আছে; এনে দেব।...এখন শালা কি বলব।"

বুললিরা কোনো জবাব দিল না। তারা এতদিন স্পষ্ট করে কিছুই জানত না; এমন কি আজ গণনাথের বাড়ি যাবার আগে পর্যন্ত নয়। তারপর এখন সব জেনেছে, সূর্য আস্তে আস্তে বলে ফেলেছে। ওই প্রদীপটা সোনার, পাঁচ পাঁচটা মুখ সলতে দেবার, পদ্মপাতার মতন দেখতে। আজ চার-পাঁচ পুরুষ সূর্যদের বাড়িতে রয়েছে। ওকে বলে 'জন্মসুখী প্রদীপ'। এ-বাড়িতে ছেলেমেয়ে

ভূমিষ্ঠ হলে আঁতুড় ঘরের চৌকাঠের সামনে প্রদীপটা জ্বালিয়ে দেওয়া হয়, ঘিয়ের সলতে দিয়ে। বংশানুক্রমে এই চলেছে। নতুন শিশুর জন্মকে এ-বাড়িতে এইভাবে অভ্যর্থনা করে এসেছে ঠাকুমা, ঠাকুমার শাশুড়ী, তার শাশুড়ী...। এ প্রদীপ মঙ্গলের চিহ্ন, মর্ত্যে যে আসে তাকে বরণ করে নেওয়ার প্রদীপ। সারা রাত জ্বলে জ্বলে প্রদীপটা নবজাতকের সুখ, সৌভাগ্য, মঙ্গল কামনা করে ভগবানের কাছে। সূর্য হবার সময় জ্বলেছিল তাদের বংশে শেষ। দিদির ছেলেরা অন্য বংশ, তাদের জন্মের বেলায় জ্বলা উচিত না. তবু বাবা দিদির ছেলেদের জন্মের সময় প্রদীপটা বের করে দিয়েছিল। শেষ জ্বলেছে ছোকনুর জন্মের সময়। জ্বলেছে, কিন্তু কি ফল হয়েছে? পঙ্গু, দুর্বল. রুগ্ণ একটা ছেলে হয়ে বেঁচে আছে ছোকনু। "সব শালা বাজে, ভাঁওতা, বুঝলি! কিচ্ছু না। ওই শালা একটা সোনার পিদ্দিম সিন্দুকে পুরে রেখে দিয়েছে...।" সূর্য যতটা তিক্ত বিরক্তভাবে বলবার চেষ্টা করল, ততটা তিক্ততা ওর গলায় ফুটল না।

অভয় কেমন নিষ্প্রাণ ঠাট্টা করে বলল, "তোর ছেলে হলে এবার তাহলে কি জ্বলবে রে আঁতুড় ঘরে?"

সূর্য প্রথমটায় জবাব দিতে পারল না; তারপর বলল, "ধুনি জ্বলবে শালা।...না, ধুনি নয়, একটা চিতাফিতা জ্বালিয়ে দেব. .। দিদির ছেলের বেলায় জ্বলে, ওই ছোকনু, আমার ছেলের বেলায় জ্বললে শালা আর দেখতে হবে না. . ঠ্যাং মাথাফাতা আর দেখতে পাবি না!" সূর্য হাসবার জন্যে গলা টেনে কেমন শব্দ করতে লাগল। শব্দটা শুকনো, সামান্য জড়ানো।

কৃপাময় আর অভয় আর-একটু বাদেই চলে গেল।

সূর্য আর বুলালি ঘুরে ঘুরে রামকৃষ্ণ মিশনের রাস্তায় এল, তারপর ফাঁকা নির্জন নিরিবিলি রাস্তায়। আলো জ্বলছিল। দেখতে দেখতে হঠাৎ সূর্যর বালব্ ফাটানোর খেলা খেলতে ইচ্ছে হল আবার। পকেটে তার গুলতি নেই। হতাশ এবং বিরক্ত বোধ করে সূর্য আলোগুলো দেখতে লাগল, যেন সূর্যকে ফাঁকি দিয়ে ওরা জ্বলছে।

আরও খানিকটা রাত পথে পথে ঘুরে পরিশ্রান্ত হয়ে ওরা বাড়ি ফিরে গেল।

১৫

নবমী পুজোর দিন শেষ বিকেলে সূর্য তার ঘরে দাড়ি কামাবার জন্যে সাবান ব্রাশ ব্লেড-ফ্লেড বের করে গুছিয়ে নিচ্ছিল। বিকেল মরে আবছা আঁধার হয়ে আসছে, নরম সিস্ পেন্সিলের দাগের মতন দাগ পড়ছে বাইরে। বিছানার ওপর তার নতুন ধুতি, নতুন পাঞ্জাবি, গেঞ্জি। কাল নতুন ট্রাউজার্স আর রেয়ন টি-শার্ট পরেছিল সূর্য; আজ ধুতি পাঞ্জাবি পরবে, আজকাল আর ধুতিটুতি পরা হয় না। পাঞ্জাবিটার বুকের কাছে বোতাম-ঘর নেই, বুকের পাশে খানিকটা চেরা, ওপরের দিকে একটিমাত্র কাপড়ের বোতাম।

সূর্য নতুন একটা ব্লেড বের করে নিল। খুব পরিষ্কার করে দাড়ি কামাবে আজ। দাড়ি কামিয়ে বাথরুমে যাবে। হেভী মান্‌জা দেবে আজ সূর্য; দিয়ে চারু বেটাদের পুজো প্যাণ্ডেলে যাবে। আজ ওখানে খুব রোশনাই ছুটবে। মা দুর্গার মুখ তেমন একটা দেখাই হয়নি এ-বছর; আজ দেখবে, দুর্গা দেখবে— দুগ্‌গোও দেখবে। তারপর বুলালির সঙ্গে যাবে কোথাও কৃপাময় আর অভয়ও থাকবে।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গালের দাড়িতে হাত বুলিয়ে সূর্য তার গাল, নাক, চোখ লক্ষ্য করছিল। তার চোখের তলার কালচে ভাবটা আরও বেড়ে যাচ্ছে যেন। শেষ পর্যন্ত কি শ্যাওলার মতন রঙ ধরে যাবে! বিচ্ছিরি শালা! চোখের তলায় এই ময়লা বিচ্ছিরি।

ভেজানো ব্রাশটা সাবানের বাটিতে দিচ্ছে সূর্য, হালকা একটা ঝুম ঝুম শব্দ উঠল। ছোকনু ঘরে এল। তার দু' হাতে নারকোলের মালার মতন দুটো যন্ত্র, ম্যারাকাস। ম্যারাকাস বাজাতে বাজাতে ছোকনু এল।

এই বাজনা দুটো সূর্যর। তাদের কনসার্ট ক্লাবের সময় সূর্য কিনেছিল, বাজাত। তারপর ফেলে দিয়েছিল। তার ঘরদোর ঝাড়ামোছার সময় বাজনা দুটো কোনখান থেকে আবার বেরিয়েছে, তারপর ছোকনু চেয়ে নিয়েছে। আজ ক'দিন ছোকনু তার বন্দুক ভুলে এই বাজনা দুটো নিয়ে আছে। এটাই যেন তার বেশি পছন্দ। সূর্য ছোকনুকে বলেছে, তোকে বাজাতে শিখিয়ে দেব।

ছোকনু ঘরে এসে বলল, "মামা, দাদা পুজো দেখতে চলে যাচ্ছে। আমায় তুমি নিয়ে যাবে?"

সূর্য বলল, "আমি অনেক জায়গায় যাব; অ-নেক রাত হবে। তুই তোর

মা'র সঙ্গে যা, তোর মা গাড়ি করে যাবে। আমি কাল সকালে তোকে সাইকেলে করে সব ঠাকুর দেখিয়ে আনব।"

ছোকনু মা'র সঙ্গে যেতে খুব প্রসন্ন হল না। বলল, "মা আমায় গাড়ি থেকে নামতে দেয় না।"

"নেমে পড়বি তুই। জোর করে নেমে পড়বি!"

ছোকনু আর কিছু না বলে খাটের দিকে চলে গেল, গিয়ে তার অভ্যাসমতো হাতের বাজনা দুটো বাজাতে লাগল: ঝুম্ ঝুম্...।

সূর্য ব্রাশটায় সাবান মাখিয়ে রেখে দিল, রেখে ছোকনুকে বলল, "দূর ব্যাটা, ওভাবে বাজায় না, আমায় দে।"

ছোকনু বাজনা দিল।

সূর্য বাজাতে লাগল। অনেকদিন আর অভ্যেস নেই, ভুলচুক হয়ে যাচ্ছিল, দুহাত আর ঠিক সমান চলছিল না। তারপর চলতে লাগল। সূর্য আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দু' হাত বুকের কাছে তুলে দু' পাশে সরিয়ে বাজনাটা বাজাতে লাগল, বাজাতে বাজাতে তার শরীর দুলতে লাগল আস্তে আস্তে, পা দুলতে লাগল। একমুঠো মটরদানার মতন পাথর, শূন্য পাতলা টিনের মালার মধ্যে পুরে বাজালে যেমন ঝিনঝিনে শব্দ হয়, অনেকটা সেইরকম্ কিন্তু তার চেয়ে সুন্দর ঝিমঝিমে শব্দ হচ্ছিল। মালার হাতল দুটো ধরে সূর্য ক্রমশই যেন কোমর থেকে কাঁধ পর্যন্ত দুলিয়ে নাচতে শুরু করে দিল। নাচতে নাচতে সূর্য বলল, "বুঝলি ব্যাটা, এ হল তোর মেক্সিক্যান নাচ"...

ছোকনু বুঝল না, বলল, "মে...মে...কি বললে মামা?"

"মেক্সিক্যান।"

"সেটা কি?"

"কে জানে শালা কি! একটা দেশ...মেক্সিকো...। আছে কোথাও।"

এমন সময় বাগানের মোরম দিয়ে শব্দ তুলে একটা সাইকেল এসে থামল। বেশ জোরেই এসেছিল। ঘণ্টি বাজল। তারপরই প্রায় উর্ধ্বশ্বাসে অভয় এসে ঘরে ঢুকল। হাঁপাচ্ছে। চোখমুখের ভীত, শঙ্কিত, বিহ্বল মূর্তি!

সূর্য বাজনা থামিয়ে দিয়েছিল।

অভয় দম নিতে নিতে যেন কোনোরকমে বলল, "সূর্য! গণাদা ডেড্। আফিং খেয়েছিল।"

সূর্য যেন বুঝতে পারল না। অপলকে বোকার মতন তাকিয়ে থাকল।

অভয় আবার বলল, "গণাদা আজ দুপুরে মারা গেছে।"

"মারা গেছে...! ভাগ্..." সূর্য যেন বিশ্বাস করতে না পেরে বলছে, অথচ চোখ কেমন বিমূঢ় হয়ে আসছিল।

"মাইরি বলছি, তোর দিব্যি।" অভয় হাঁপাচ্ছিল, তার চোখ কেমন ঘোলাটে, ঠোঁট মুখ শুকনো। "কৃপা আমায় তোর কাছে পাঠিয়ে বুলিলর কাছে গেছে।"

"কে বলল তোদের?" সূর্য বলল, তার মুখের চেহারা কালচে হয়ে

আসছিল।

"বাঃ, খবর পেলাম। কৃপা আমায় এসে বলল, বলে বুললির বাড়ি গেল।"

সূর্য হঠাৎ কেমন রেগে গেল। "ফট্ করে মরে গেল কি রে, সেদিন দেখে এলুম।...এত সস্তা নাকি মরা।"

"আত্মহত্যা করেছে"...অভয় ভীত গলায় বলল, "বিষ—মানে আফিং খেয়েছিল কাল। সকালের পর মারা গেছে। পুলিস নিয়ে গেছে...পেট চিরছে হাসপাতালে।"

সূর্যর মাথাটা কেমন দুলল যেন, চোখ ঝাপসা। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে বুকের কাছটায় ধকধক করছিল, ভীষণ জোরে।

অভয় বলল, "বুললির বাবাকে বলে হাসপাতাল থেকে মড়াটা ছাড়িয়ে দিতে হবে বলে লোক গেছে, কৃপাও গেল। ওদের পোড়াবার লোক পেয়েছে দু-চারটে। কৃপা তোর কাছে পাঠাল।"

সূর্য হঠাৎ চিৎকার করে বলল, "আমি কি করব! আমি শালা দারোগা?"

"না—তোর বাবাকে একবার বলে রাখ।"

"বাবাকে বলে কি হবে!"

"তবু বলে রাখ।" অভয় মুহূর্তকয় চুপ করে থেকে বলল আবার, "কৃপা জিজ্ঞেস করেছে, শ্মশানে যাবি কি না।"

"না", সূর্য রুক্ষ নিষ্ঠুর গলায় বলল।

অভয় দাঁড়িয়ে থাকল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সূর্যর মুখের পাংশু, নির্মম, ক্রুদ্ধ ও অসহিষ্ণু ভাবটা দেখতে লাগল। দেখতে দেখতে এক সময় নিশ্বাস ফেলে বলল, "ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে, জল খাব।"

সূর্য ছোকনুকে বলল, "যা, এক গ্লাস জল দিয়ে যেতে বল।"

ছোকনু শুধলো, "কে মরেছে মামা?"

সূর্য ভাগ্নের ওপর চটে গেল। "পাকামো মারতে হবে না, ভাগ্ এখান থেকে।"

ছোকনু চলে গেল।

সূর্য হাতের বাজনা দুটো ছুঁড়ে বিছানার ওপর ফেলল। ফেলার পর অনুভব করল তার তালু ঘামে ভিজে গেছে। হাতটা দেখল একপলক। মুছে নিল। বলল, "আফিং খেয়ে মরেছে তোকে কে বলল?"

"শুনলাম। কৃপা বলল।"

"কৃপা শালা সব জানে?"

"এসে বলেছে কেউ।"

"আফিং খেয়েছিল কেন?"

"কে জানে!"

সূর্য সামান্য সময় চুপচাপ দাঁড়িয়ে এগিয়ে সাবানের ব্রাশটা নিল। আয়নার দিকে তাকাল। "শ্মশানে যাবার কথা তোকে কে বলল?"

"কৃপা বলছিল..."

"না, আমরা শ্মশানে যাব কেন? আমরা কি গণাদার লোক। ওর লোকরা যাবে।...ওর পাড়ায় খবর দিক, মেসে দিক...।"

অভয় একটু চুপ করে থেকে বলল, "পোড়াবার লোক পেয়ে যাবে দু-পাঁচজন।...তবে পুজোর দিন কিনা, ক'জন পাবে কে জানে।...আমাদের যাওয়া উচিত কিনা ভাবছি..."

"কেন, আমরা যাব কেন, গণাদা আমাদের বাপ?" সূর্য লাল রুক্ষ চোখে অভয়কে ধমকে উঠল।

অভয় আর কিছু বলল না। সূর্য গালে সাবান ঘষতে লাগল। অথচ পুরো ঘষল না: একটু ঘষে আবার মুছে ফেলল। জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল। বিকেলটাকে যেন দু' হাতে কেউ তাড়াতাড়ি মুছে ফেলছে, সিস-রঙ আরও একটু গাঢ় লাগল। বাগানে পাখির ঝাঁক নেমেছে, বাতাস দিচ্ছে, শিউলি ফুলের ঝোপটার মাথা দুলছে। সূর্য ব্রাশ রেখে বিছানায় গিয়ে বসল। অভয়ও গিয়ে বসল।

"আফিং খেল কেন রে? তুই জানিস?" সূর্য বসে থাকতে থাকতে অন্য-মনস্কভাবে শুধলো।

"না।"

"কি সাসপেক্ট করছিস?"

"শুনেছি যমুনা কেটে পড়েছে।"

"কে—টে?...মেজকিটা?"

"হ্যাঁ।"

"সেদিন মেজকিটাকে বাড়িতে দেখিনি।"

"না। ও শালী আগে থেকেই কাটছিল; আমরা যেদিন গেলাম তার পরের দিন একেবারে কাট।"

চাকর জল নিয়ে এল। অভয় জলের গ্লাস নিয়ে এক চুমুকে শেষ করে হাঁপ ফেলল। চাকর চলে গেল।

অভয় বলল, "একটা সিগারেট দে।"

সূর্য সিগারেট দিল। দিয়ে বলল, "যমুনা কোথায় কেটে পড়েছে রে?"

"কে জানে! আশেপাশেই কোথায় আছে। ঝগড়াটগড়া হয়েছিল...কেটে গেছে।"

"কিসের ঝগড়া?"

"জানি না।...শুনেছি তো যমুনার একটা ইয়ে ছিল...তার সঙ্গে..."

সূর্যও একটা সিগারেট ধরাল। "যমুনার জন্যে গণাদা আফিং খায়নি তো রে?"

"হতে পারে।...জানি না।" অভয় যেন অত্যন্ত ক্লান্ত, সূর্যর বিছানায় পিঠ এলিয়ে শুয়ে পড়ল।

সূর্য এদিক ওদিক তাকাল, জানলা আয়না আলমারি দরজা—তারপর অভয়ের মুখের দিকে তাকাল আবার। "সেদিন আমরা শালাকে মেরে ফেললে পুলিসে ধরত।"

অভয় জবাব দিল না। তার ভাবতে খারাপ লাগছিল, গণাদাকে সেদিন অতগুলো কিল চড় ঘুঁষি মারা হয়েছে। গণাদার ওপর অভয়ের একটা পুরনো রাগ ছিল, রাগটা আর কিছু নয়, গণাদা অভয়কে একবার ভীষণ অপমান করেছিল অনেকের সামনে, রেল ষ্টেশনে একটা মেয়েকে শিস মারার জন্যে গালে থাপ্পড় মেরেছিল। সে অনেক দিনের কথা।...তুচ্ছ ঘটনা, চটে গিয়েই মেরেছিল গণাদা, তবু অভয় কথাটা ভুলতে পারত না। কিন্তু সে-রাগে নিশ্চয় গণাদার টুঁটি টিপে মারা যায় না। অভয় গণাদাকে বাস্তবিক পক্ষে মারতে হাত তুলত না, যদি না গণাদা আগে তাকে ওভাবে আচমকা চড় না মারত।

সূর্য সিগারেটের একমুখ ধোঁয়া বাতাসে উড়িয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "ফট্ করে আফিং খেয়ে ফেলল মাইরি! শালা কি রে?"

অভয় ছাদের দিকে তাকিয়ে টেনে টেনে বলল, "ভেতরে কিছু আছে...। কারবার আছে কিছু।"

"কি?"

"কে জানে!"

দুজনেই তারপর চুপচাপ হয়ে গেল। ক্রমশ বাইরের অন্ধকার গাঢ় হচ্ছিল, ঘরের ভেতর ছায়া জমে কালো হয়ে আসছিল।

শেষে অভয় বলল, "আমি উঠি রে! কৃপাকে গিয়ে বলতে হবে।"

"কোথায় পাবি কৃপাকে!"

"বুললির বাড়ি যাই প্রথমে, ওখানে ব্যাপারটা জানতে পারব। তারপর কৃপাকে না পেলে দেখি...কৃপার বাড়ি।—মোট কথা আমরা শ্মশানে যাচ্ছি না, এই তো?"

"না, আমরা গিয়ে কি করব?"

"তুই কোথায় থাকবি? আগের প্রোগ্রাম?"

"না, আমি বাড়িতে আছি। তোরা আমায় ডাকিস।"

"আচ্ছা, আমি চলি।" অভয় উঠে পড়ল, "পুজো ফিনিশ হয়ে গেল মাইরি, কোথায় আজ একটু ইয়ে করব, তা না...যত..."

অভয় চলে যাবার পর সূর্য বিছানার ওপরই বসে থাকল। গালের ডানদিকে সাবান লেগেছিল সামান্য, শুকিয়ে জায়গাটা চড়চড় করছিল। ঘরের মধ্যে বেশ ছায়া জমে গেছে। দিদির গলা শোনা গেল একবার, তারপর চুপ। সূর্যর মনে হল, তার শরীরটা কেমন অবশ লাগছে, আলস্যের মতন অনেকটা; ভাল লাগছে না। বড় বড় নিশ্বাস পড়ছিল। শূন্য চোখে সূর্য কি দেখছিল কে জানে। গণাদার সঙ্গে সেদিনের রাত্রের ঝগড়াটা মনে পড়ছিল। গণাদার আগের কথাও এক-আধবার বাতাসের দমকার মতন মনে আসছিল। গণাদা আফিং খেল কেন?

আফিং খেয়ে মানুষ মরে সূর্য শুনেছে, কিন্তু কাউকে মরতে দেখেনি। এ শহরে গলায় দাড়ি দিয়ে, গায়ের কাপড়ে তেল ঢেলে পুড়ে মরার ঘটনা বেশ কয়েকটা ঘটেছে, ট্রেনের লাইনে কাটা পড়ে, ঝিলের জলে ঝাঁপ দিয়েও দু-একজন মারা গেছে, কিন্তু আফিং খেয়ে কে মরেছে সূর্যর মনে পড়ছে না। গণাদা আফিং খেল কেন? যমুনার জন্যে? নাকি নয়নার জন্যে? সূর্য বুঝতে পারছিল না। অথচ ক্রমশই তার মনে কেন, কেন, কেন, এই প্রশ্ন প্রবল হয়ে উঠেছিল। কৌতূহল ও বিস্ময় শেষে কেমন বিভ্রান্তির মতন হয়ে উঠেছিল। গণাদা আত্মহত্যা করল কেন? শালা আফিং খেল কেন? গণাদা কি আজকাল আফিংয়ের নেশা শুরু করেছিল, চেহারাটাও তাই কি আফিংখোরের মতন হয়ে উঠেছিল? বলা যায় না, গণাদার যেরকম হাল হয়ে এসেছিল, তার ওপর তিন তিনটে মাগী সামলানো, তাতে আফিং-টাফিং হয়ত চালাচ্ছিল গণাদা, তারপর বাড়িতে তিন তিনটের সঙ্গে নিশ্চয় লড়ালড়ি হয়েছে; রাগের মাথায় বেশী খেয়ে ফেলেছে; ফেলে একেবারে খালাস হয়ে গেছে।

সন্ধ্যে হয়ে যাচ্ছিল দেখে সূর্য উঠে বাতি জ্বালাল ঘরের। তারপর দাড়ি কামাতে শুরু করল। দাড়ি কামাবার সময় তার হাত স্থির থাকতে পারছিল না, কখনও মাংসপেশী কাঁপছে, কখনও কেমন একটা অসাড় ভাব লাগছে, আঙুলগুলো দুর্বল, হাত কেঁপে যাচ্ছিল, অন্যমনস্ক হচ্ছিল। গালের কয়েকটা জায়গায় ছাল ঘষে গেল, কাটল। ফিটকিরি ঘষে, পাউডার দিয়ে কোনো রকমে কাটা-ঘষাগুলো সামলে নিল সূর্য, তারপর বাথরুমে গেল।

প্রায় স্নান করে ফিরে সূর্যর খানিকটা ভাল লাগল। মাথার চুল ভিজে, ঘাড় ভিজে, চোখ জলে জলে ঠাণ্ডা। আর-একবার তোয়ালে দিয়ে মুখ মাথা মুছে সূর্য তার নতুন পাঞ্জাবি পরতে লাগল। আজ চড়া মাঞ্জো দেবে সূর্য। সে দেখতে সুন্দর, আরও সুন্দর করে সাজবে। চোখের কালচে ভাবটা দিদির মতন আঙুলে পাউডার দিয়ে ঢেকে ফেলবে, স্নো পাউডার মাখবে, সেণ্ট ছড়াবে গায়ে। তারপর চারু শালার পুজো প্যাণ্ডেলে যাবে। আজ প্যাণ্ডেলে কয়েকটা ছুঁড়ির মাথা ঘোরাতে হবে। তারপর পিনাকি...

পিনাকির ওখান থেকে বেরিয়ে বেশ মালদার হয়ে মালাদির বাড়ি গেলে কেমন হয়? সেই ইতিহাসের দিদিমণির পুজোর ছুটি, কলকাতায় চলে গেছে। সেদিন একবার ঘুরতে ঘুরতে মালাদির কাছে গিয়েছিল সূর্য। গিয়েছিল, কেননা দিদি তার কাছে মালাদির ফটো পাবার পর বাবাকে কিছু বলতে পারত, উসকে দিতে আর কি, দিদি তা পারে। তারপর মালাদিকে দিদি এবাড়িতে ডেকে পাঠাতেও পারত, বাবার নাম করেও পারত। বাড়িতে মালাদিকে ডাকিয়ে এনে দিদি কি বলত কে জানে। একটা ঝামেলা করতে পারত দিদি। সূর্য এই ঝামেলাটা প্যাঁচ মেরে কাটাতে চেয়েছিল। নয়ত আর কি!...মালাদির বাড়ি গিয়ে সেদিনই সূর্য

দেখল, ইতিহাসের দিদিমণি কলকাতা যাবার জন্যে জিনিস গুছোচ্ছে। মালাদি সূর্যর প্যান্টের পকেটে সেদিন বেমক্কা একটা রুমাল গুঁজে দিয়ে হাত ঢুকিয়ে রেখেছিল সামান্য। পরে বলেছিল—'একেবারে একলা থাকব সূর্য, পুজোর সময় একদিন এসো, ঠাকুর-টাকুর দেখব দুজনে...' বলে মালাদি চোখ মটকে হেসেছিল। হাসিটা সূর্যর মাঝে মাঝে মনে পড়ছে। আজ মালাদি একলা আছে। আজ মালাদির সঙ্গী নেই, একলা ফাঁকা বিছানায় শুয়ে আছে। সূর্যকে জায়গা দিতে পারে খানিকটা। সূর্য নিজেও নিতে পারে।.. কিংবা, সূর্যর হঠাৎ মনে হল, সে মালাদিকে আজ তার চারপাশে নাচাতে পারে, স্বপ্নে যেমন নেচেছিল মালাদি; সূর্য দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ম্যারাকাস বাজাবে। তারপর নাচ শেষ হয়ে গেলে সূর্য ওই ঘোড়ামার্কা পাছায় গোটা কয়েক লাথি ঝাড়বে। খচড়া মেয়েছেলে, ইয়ের আর টিয়ে নেই, ইয়েতে ইয়েতে...। শালী, খানকী কাঁহাকার!

শালা গণাদাটা আফিং খেল। পিন্দিমটা গেল মাইরি। চোদ্দ-পুরুষের ইয়েতে দেবার সলতে আর পাকাতে হবে না। সূর্যর হঠাৎ কি রকম ছেলেমানুষের মতন হাসি-কান্নার দমক এল: যাও, শালা, আমায় তুমি ধাপ্পা মেরে গেলে, ঠকিয়ে গেলে। চোট্টা কাঁহাকার!

আর এবার হঠাৎ সূর্যর কেমন করে যেন সন্দেহ হল, গণাদা তাদের জন্যেই আফিং খেল না তো!...মনে পড়ার পরই সূর্য মাথা নাড়ল, না—না, তাদের জন্যে কেন খাবে!

পিনাকির দোকানে ছোট ঘরে ওরা বসে ছিল। লণ্ঠন জ্বলছে। কাঁচের ছোট ছোট গ্লাস, সোডার কয়েকটা বোতল, দিশী মদের দুটো পাঁইট শেষ হয়ে তিন নম্বরটা চলছিল। পিনাকি শালা বেশি রকম হিন্দু, শালার এখানে সব নিরামিষ চাট। মুখ বিস্বাদ লাগছিল, বড়া আর ছোলা বাদাম চিতিয়ে কতক্ষণ পারা যায়। সূর্য জিভে একটু লেবু রগড়ে নিল।

কৃপাময় সচরাচর যৎসামান্য খায়; আজ তার তুলনায় একটু বেশিই খেয়েছে। বুলালিও বেশ খেয়েছে; অভয় চুক-চুক করে মন্দ খায়নি। সূর্য বাকী বোতলটা শেষ করে আবার একটা আনার জন্যে পিনাকিকে ডাকতে বলল।

চার বোতলে অল্পবিস্তর নেশা হয়ে এসেছিল। সূর্য একটা সিগারেট ধরিয়ে কি খেয়ালে যেন তপ্ত লণ্ঠনের কাচে হাতের চেটো ঠেকাতে লাগল।

বুলালি বলল, "পুজোর প্যাণ্ডেলে তোরা গেলি না, আমার মন খারাপ লাগছে।"

"তুই তো গেলি না"—অভয় বলল।

"আমি যাচ্ছিলাম তোরা যেতে দিলি না...।"

"শালা মাতাল হয়েছে!" অভয় অন্যদের বলল।

চারজনেরই কথা জড়ানো; বুলালির একটু তোতলামি আসছিল। সূর্যর

গলা বেশ জড়িয়ে এসেছে। ওদের চোখ অল্প অল্প টেনে এসেছে, সামান্য ফোলা ফোলা।

পিনাকি এল। "মালিক..."

"আওব একঠো"—ঢেকুর তুলে বুলালি বলল।

পিনাকি চলে গেল।

সূর্য বলল, "পিনাকিকে একটা চুমু খেতে পারিস অভয়? দুটো টাকা দেব।"

"দে।"

"আগে খা।"

"কোথায় খাব?"

"তোরা পুজোর প্যাণ্ডেলে গেলি না...। আমার জন্যে ছটফট করবে..." বুলালি বলল।

"কে?"

"একজন।"

"তোর বাবা।"

"যা শাল্‌লা, বাবা কেন, বাবার বউমা।"

"তোর বউদি?"

"বউদি নেই। চলে গেছে। আমার একটা প্রাইভেট টক্‌ আছে, তোদের বলব..."

"মাতাল শালা, চুপ কর।"

পিনাকি এল। বোতলটা নামিয়ে দিল। অভয় উঠে দাঁড়িয়ে পিনাকির গালে চুমু খেল। খেয়েই সূর্যর দিকে হাত বাড়াল।

পিনাকি কিছু বলল না; হাসল। হেসে টেবিল থেকে সিগারেটের প্যাকেট থেকে দুটো সিগারেট নিয়ে চলে গেল।

সূর্য চারটে গ্লাসে খানিকটা করে ঢেলে দিল। কৃপাময় হাত নাড়ল, "আমায় আর দিস না।"

"খা শালা, খেয়ে নে!" সূর্য বলল।

"আমার প্রাইভেট কথা শুনবি না?" বুলালি বলল, "সকলের সামনে আমি বলছি, অভয় আমায় পরে কিছু বলতে পারবে না।"

"বল শালা তোর প্রাইভেট কথা।"

"আমি অভয়ের বোনকে লাভ্‌ করছি।"

"কর।" অভয় বলল।

সূর্য আর একটু খেল। খেয়ে পকেট থেকে ম্যারাকাস বের করল। করে আওয়াজ করল ঝুমঝুমির মতন।

কৃপাময় বলল, "ও দুটো নিয়ে বেরিয়েছিস কেন?"

"নাচব শালা, মালার বাড়ি গিয়ে নাচব।"

আসলে বেরোবার সময় সূর্য খেয়াল করেনি অতটা। বাড়িতে একা, অন্যমনস্ক থাকতে থাকতে বা ভাবতে ভাবতে আর ভাল না লাগায় মনটা হালকা করার জন্যে বিছানা থেকে ম্যারাকাস দুটো তুলে নিয়ে অন্যমনে বাজাচ্ছিল। এমন সময় বুলালিরা এসে ডাকল। পকেটে পুরে নিয়েই বেরিয়ে পড়েছে সূর্য।

অভয় তার গ্লাসে চুমুক দিল; বলল, "আমার আর কৃপার লাভ্ করার কেউ নেই। আমরা কাকে লাভ্ করব?"

বুলালি বলল, "তোরা পি প্লাস পি কর।"

সূর্য বাজনা দুটো মৃদু করে বাজাতে বাজাতে বলল, "মেয়েরা হারামী হয়। সবচেয়ে বড় হারামী।" বলতে বলতে বাজনা দুটো থামিয়ে সূর্য হঠাৎ কান পেতে কি শোনার চেষ্টা করল, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে, ছোট্ট জানলাটার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে কান পেতে থাকল।"

"এই, শুনছিস?" সূর্য বলল।

বুলালিরা তাকাল।

"যাচ্ছে রে!"

"কি?"

"হরিবোল।...গণাদাকে নিয়ে যাচ্ছে!"

কৃপাময় উঠে জানলার কাছে এল। বুলালি আর অভয় তাকিয়ে থাকল।

সামান্য পরে কৃপাময় বলল, "হ্যাঁ...যাচ্ছে।" গণনাথকে যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এ সম্পর্কে তাদের সন্দেহ নেই।

বুলালি বলল, "পুরনো রাস্তায় যাচ্ছে কেন? শর্টকাট করলে পারত।"

"এদিকের রাস্তাটা ভাল।" কৃপাময় বলল।

সূর্য আরও একটু জানলায় দাঁড়িয়ে সরে এল টেবিলের কাছে, তারপর আধভর্তি গ্লাসে আরও খানিকটা মদ ঢেলে নিল। নিয়ে বলল, "গণাদা আফিং খেল, মাইরি!"

বুলালি তার গ্লাস শেষ করতে লাগল। গণাদার মরা শরীরটা পোড়াবার জন্যে ছাড়াতে খুব কষ্ট হয়নি। বাবা বলে দিয়েছিল।

কৃপাময় কি যেন ভাবছিল, "নয়না খুব কান্নাকাটি করছিল। দেখে যা কষ্ট হচ্ছিল..."

"তুই তো কেঁদে ফেলেছিলি।"

কৃপাময় কিছু বলল না।

সামান্য পরেই বাইরের অন্ধকার থেকে হরিধ্বনিটা স্পষ্টভাবে ভেসে এল।

চারজনের মধ্যে আর কোনো কথা হচ্ছিল না, চুপচাপ। অয়েলক্লথ মোড়া নড়বড়ে টেবিলটা নিষ্প্রভ আলোয় কালচে দেখাচ্ছে, লণ্ঠনের শিখাটা জ্বলতে জ্বলতে দপদপ করে উঠছে, চারপাশে কিছু উচ্ছিষ্ট, গ্লাস, সোডা আর মদের বোতল, সিগারেটের ছেঁড়া চ্যাপ্টানো প্যাকেট, ছাই, দেশলাইকাঠি। চারজনেই টিনের চেয়ারে বসে, পরস্পরের মুখের দিকে তেমনভাবে কেউ তাকাচ্ছিল না,

অথবা শূন্য চোখে তাকাচ্ছিল।

বাইরের হরিধ্বনি তেমন প্রবল নয়, মৃদু ধীর আস্তে আস্তে কাছে এগিয়ে আসছে। অন্ধকার দিয়ে যেন রাতের বাতাসে টলতে টলতে আসছিল দুর্বলভাবে। এই পথ দিয়েই শ্মশানে যেতে হবে, পিনাকির দোকানের প্রায় সামনে দিয়ে, তারপর খানিকটা এগিয়ে কুলঝোপ, কুলঝোপ ডাইনে রেখে সবু কাঁচা পথে নামতে হবে, তারপর মাঠ, ঝোপ, পাথর নুড়ি, পলাশ ঝোপ, কাঠের সাঁকো...! সূর্যরা যেন সব জেনেশুনেই এসে বসে আছে এখানে।

দেখতে দেখতে হরিধ্বনি পিনাকির দোকানের সামনে এসে গেল। শব্দটা সবচেয়ে যখন স্পষ্ট ও নিকট হল তখন চার বন্ধু চোখ তুলে পরস্পরের দিকে তাকাল। মুখগুলো নিষ্প্রাণ; দৃষ্টি শূন্য; ঠোঁট জুড়ে আছে চোখের পাতা পড়ছিল না।

বাইরের হরিধ্বনি আবার কখন আস্তে আস্তে মিলিয়ে আসতে লাগল; তবু শোনা যাচ্ছিল। চারজনের দীর্ঘশ্বাস পড়ল আবার। সূর্য যেন তৃষ্ণার্ত হয়ে গ্লাসটা টেনে নিয়ে মস্ত চুমুক দিল।

কৃপাময় অস্বস্তির গলায় বলল, "আমার কি রকম লাগছে! একবার যাওয়া উচিত ছিল।"

অভয় ভাবুকের মতন বলল, "গেলে হত।"

বুলিল সূর্যর দিকে তাকাল। বলল, "ওরা বেশিদূর যায়নি।"

সূর্য বলল, "কেন যাব? গণাদা আমাদের কে?"

কৃপাময়রা কোনো জবাব দিল না। অভয় বোতলের শেষটুকু হঠাৎ লণ্ঠনের গায়ে ছুঁড়ে মারতে ছ্যাঁক করে শব্দ হল; তারপর কাঁচটা চিরে ফেটে গেল।

সূর্য হঠাৎ উঠে পড়ল। তার বাজনা দুটো পকেটে ভরে নিল।

গণনাথের মৃতদেহ নিয়ে বাহকরা ততক্ষণে মাঠে নেমে গেছে। নবমীর চাঁদ আকাশে। কালোর ভাবটা মোছা। মাঠ-ঘাট চোখে পড়ছে।

সূর্যরা অনেকটা পেছনে, চার বন্ধু হাঁটছে, সাইকেলগুলো পিনাকির দোকানে পড়ে আছে। থাক।

গণনাথকে পোড়াতে নিয়ে যাবার লোকজন হয়নি তেমন, সবসমেত মাত্র আট-ন'জন, তার মধ্যে নয়নাও আছে। বিধবার মতন দেখাচ্ছিল নয়নাকে, সাদাটে একটা শাড়ি পরা। দুজনের হাতে লণ্ঠন, একজনের হাতে একটা কি দুটো হাঁড়ি। এতটা তফাত থেকে স্পষ্ট কিছু বোঝা যাচ্ছিল না আর।

শূন্য মাঠে আবার হরিধ্বনি উঠল।

সূর্য বলল, "কারা কাঁধ দিচ্ছে রে, গলায় শব্দ উঠছে না।"

বুলিল জবাব দিল, "ওর পাড়ার লোকজন হবে।"

পায়ে যেন ভাল জোর পাচ্ছিল না সূর্য, তবু জোরে জোরে পা ফেলার চেষ্টা

করতে লাগল। অভয় হোঁচট খেল। কৃপাময় আকাশের দিকে তাকিয়ে চাঁদ দেখার চেষ্টা করল।

জংলা উঁচুনীচু মাঠ ঝিমঝিম করছে, হেমন্তের স্পর্শ লেগেছে বাতাসে, শিরশিরে ভাব, পলাশঝোপ দিয়ে শেয়াল চলে গেল ডাকতে ডাকতে, হঠাৎ চারদিক ভরে শিবারব উঠল। শিবারব থেমে গেলে কেমন স্তব্ধতা নামল, তারপর একটানা ঝিঁঝিরব। জোনাকি উড়ছে ক'টা, হরিধ্বনি গুনগুন করছে মাঠে। কাঠের সাঁকোর ওপর দিয়ে নয়না চলে গেল, তার হাতেই বুঝি লণ্ঠন এখন।

সূর্যরা জোরে জোরে হাঁটতে শুরু করল। বুলালি পায়ে খানিকটা জোর পেয়েছে। কৃপাময় কি যেন বলল বিড়বিড় করে।

"বুলালি?" সূর্যর গলা জড়ানো।

"উঁ!"

"গণাদা আফিং খেল!...পেটে আফিং ছিল?"

বুলালি জবাব দিল না।

"পেট কেমন করে চেরে রে?"

"কি জানি!"

"আমরাই তো চিরে দিতাম সেদিন।...শালা আমরা চিরলে তোর বাবা আমাদের ধরত।"

কৃপাময় সূর্যকে কাঁটাঝোপের ওপর টলে পড়তে দেখে ধরে ফেলল, সামনে ঠেলে দিল।

অভয় বলল, "কাঠের গাড়ি কখন আসবে রে?"

পেছন ফিরে তাকাল কৃপাময়। "আসবে।"

নোংরা জলের গন্ধ উঠল বাতাসে, সাঁকো পেরিয়ে চলে এল ওরা, এবার ফাঁকা মাঠ, গাছ নেই, ঝোপঝাড় সামান্য, পাথর আর নুড়ি। চাঁদের আলো সমস্ত প্রান্তর জুড়ে চোখের জলের মতন লেগে আছে। এখানে মাঠ আর মাটির গন্ধ, শুকনো বাতাস বইছে অঢেল।

বল হরি, হরি বোল! বল হরি, হরি বোল।

হঠাৎ যেন চারজনকে একই সঙ্গে কিছু টানল, অদ্ভুত কোনো আকর্ষণ। চারজনেই জোরে জোরে পা চালাতে লাগল। প্রায় যেন ছুটছে। ঢালু মাঠ দিয়ে তর তর করে নেমে যেতে লাগল।

এবারে কাছাকাছি, পাশাপাশি প্রায়। নয়নাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মিলের নোংরা কাপড়, আলুথালু চুল, পিঠের পাশ দিয়ে আঁচলটা লুটিয়ে পড়ছে, হাতে একটা লণ্ঠন। পাশে সত্যনারায়ণ, কোমরে গামছা বাঁধা, হাতে হাঁড়ি, কলসি, পাটকাঠি। ওপাশে নয়নাদের পাড়ার কোনো মাঝবয়সী লোক, হয়ত বামুন পুরুত। আরও একজন কে, সূর্যরা চেনে না।

বাঁশ দিয়ে আর দড়ি বুনে খাট বানানো হয়েছে গণনাথের। ইউনিভার্সাল এজেন্সির গণনাথ পলকা নড়বড়ে বাঁশের মাচায় করে পুড়তে চলেছে। নিয়ে

যাচ্ছে গণনাথের পুরনো মেসের যতীনদা আর বিভূতি গড়াই, পেছনে গণনাথের নতুন পাড়ার দুটো টিঙটিঙে ছোকরা।

বল হরি, হরি বোল!

ওরা বোধ হয় আর পারছে না, বার বার কাঁধ বদলাচ্ছে, ধীরে চলো ধীরে চলো বলছে। অনেকটা পথ হেঁটে এসেছে, ক্লান্ত হবে বইকি।

হঠাৎ কৃপাময় নয়নার পাশ দিয়ে ছায়ার মতন এগিয়ে গেল, গিয়ে পেছনের এক ছোকরাকে সরিয়ে দিয়ে নিজে কাঁধ দিল।

নয়না কি দেখল? বোঝা গেল না।

সামান্য পরে দেখা গেল, অভয়ও কিছু বলল না, জোরে জোরে হেঁটে নয়নাকে পেরিয়ে গিয়ে কৃপাময়ের অন্য পাশে খাটে কাঁধ দিল। ছোকরাটা যেন বেঁচে গেল, কাঁধ টিপতে লাগল নিজের।

সূর্য বা বুলালি কেউ কিছু বলছিল না। তারা কৃপাময় অভয়কে দেখছে, নাকি শবযাত্রা, বোঝা গেল না। চুপচাপ হাঁটিতে হাঁটতে এবং আবার একবার হরি-ধ্বনির মধ্যে কৃপাময়ের গলা কানে আসতে বুলালি যেন চঞ্চল হয়ে উঠল।

শেষে বুলালি; যাবার আগে বুলালি বলল, "যাই শালা, একটু কাঁধ দিইগে।"

সূর্য একা। সূর্য একা চলেছে! নয়না এতক্ষণে যেন দেখতে পেয়েছে, বুঝতে পেরেছে। কই, কিছু বলল না তো? নয়না কেন এসেছে? গণাদা তার কে?

ওরা চলে গেল! কেন গেল? সূর্য কিছু ভাবতে পারছিল না। কেমন একটা আচ্ছন্নতা এসেছে, কাটা গাছের ছায়াগুলো যেন লাফ মেরে মেরে পেরোতে লাগল সূর্য। গণাদা আমাদের কে? ও শালা কে?

শেষ পর্যন্ত সূর্যও গেল। তার তিন বন্ধু যেখানে কাঁধ দিয়েছে, সেখানে সূর্য না দিয়ে পারল না।

গণনাথের শব নতুন গ্রাহক পেল। চার যুবক, চার বন্ধু। নতুন কাঁধ পেয়ে গণনাথের শরীরটা যেন নাচতে নাচতে চলল।

নতুন গলা উঠল: বল হরি, হরি বোল। এ গলার স্বরে মাঠঘাটে যেন সাড়া ছড়িয়ে পড়ল।

সূর্য আর বুলালি সামনে, কৃপাময় আর অভয় পেছনে। কাঁধের বাঁশটা নাচছে, দড়ির শয্যাটা দুলছে, গণনাথ আকাশের দিকে চোখের পাতা বুজে শুয়ে আছে। নবমীর চাঁদ আকাশে। কত দূরে, যেন কোনো সুদূর লোকালয়ে নবমী পুজোর আরতি শেষ হয়ে আসার পর সব নিস্তব্ধ হয়ে গেছে।

"বল হরি, হরি বোল", সূর্য চিৎকার করে উঠল। কৃপাময়রা ধুয়ো গাইল, বল হরি, হরি বোল।

সূর্যর শরীরে নেশার আলস্য ঘুচে গিয়েছিল কিনা কে জানে, সে বেশ জোরে জোরে যাচ্ছিল। শান্তিপুরী ধুতি মালকোঁচা মেরে পরা, আদ্দির পাশ-কাটা পাঞ্জাবি, পায়ে চপ্পল। বুলালির পরনে পাজামা আর সিল্কের পাঞ্জাবি,

অজয় আর কৃপাময় ধুতি পাঞ্জাবি পরেছে।

সূর্য জোরে নেচে নেচে চলছিল বলে তার দু' পকেটে রাখা সেই ম্যারাকাস বাজছিল—ঝুম ঝুম করে। আহা, বেশ লাগছিল। চাঁদের আলো আরও বিষণ্ণ এখন, জনপ্রাণীহীন মাঠ, পায়ের তলায় কাঁকরনুড়ি মচমচ করছে। সূর্যর কানের কাছে ঝিঁঝি ডাকছিল।

পায়ের জোর ক্রমশই বাড়াচ্ছে সূর্য, তার দেখাদেখি বুলালি। শ্মশানের আর অল্প পথ বাকি।

যেতে যেতে সূর্য কেমন উল্লাস আর উন্মাদনা অনুভব করছে। পেছন থেকে যতীনদা যেন চেঁচিয়ে বলল, আস্তে যাও—আস্তে।

সূর্য আরও জোরে পা বাড়াতে লাগল; শেষে যেন ছুটছে। গণাদা আফিং খেয়েছে। কেন শালা, আফিং কেন?...আফিং খেয়ে আত্মহত্যা করলে তুমি! কেন? প্লে করলে?

"বল হরি, হরি বোল"—সূর্য হঠাৎ আকাশ বাতাস ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল। বুলালিরাও চেঁচাল। শব্দটা অনেকক্ষণ ধরে বাতাসে ছড়িয়ে ভাসতে লাগল।

পকেটে ম্যারাকাস বাজছে: ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ ঝুম। পায়ের তালে তালে বাজছে। সূর্য এই বাজনার মধ্যে যেন উন্মাদনা খুঁজে পাচ্ছে। ঝুম্ ঝুম, ঝুম্ ঝুম্। বাঃ! বেশ। সামনে ধুধু, অনেকটা দূরে বটতলা, বটতলা পেরিয়ে আদ্যিকালের একটু নদী, গোড়ালি জল, আর বালি; সেখানে শ্মশান।

সূর্য কিসের এক উন্মাদনায় প্রায় ছুটতে শুরু করল; সঙ্গের লোকজন পিছিয়ে পড়ছে। লণ্ঠনের আলো দেখতে পাচ্ছে না সূর্য—তার মুখ সামনে, তার মুখের সামনে ধুধু নিস্তব্ধ মাঠ, আর নেড়া শ্মশান। পেছন থেকে যতীনদারা চেঁচিয়ে ডাকছে, অ্যাই ধীরে—পাগলা হয়ে গেলি নাকি? যাচ্ছিস কোথায়?

সূর্য খেপার মতন বলল, "বুলালি ছোট, শালা শ্মশানে নিয়ে গিয়ে ফেলুন একেবারে।"

কৃপাময় বলল, "ছুটিস না।"

সূর্য শুনল না, ছুটতে লাগল প্রায়। তার টানে অন্য তিনজনেও দৌড়তে বাধ্য হচ্ছিল। যেতে যেতে, পকেটের বাজনা শুনে শুনে সূর্য আর পারল না, ডান হাত দিয়ে একটা বাজনা বের করে নিল, নিয়ে বাজাতে বাজাতে চলল। যেন নেচে নেচে, বাজনা বাজাতে বাজাতে চলছে: ঝুম্ ঝুম্, ঝুম্ ঝুম্।

শালা গণাদা, তুমি চোট্টা; তবু শালা তোমায় বাজনা বাজাতে বাজাতে পোড়াতে নিয়ে যাচ্ছি। দেখ শালা, দেখ।

সূর্য যেন গণনাথকে কাঁধের ওপর থেকে মুখ বাড়িয়ে তাকিয়ে দেখছে—এরকম অনুভব করছিল। অনুভব করে বলছিল: তুমি চোট্টা নও? আমার চোদ্দ পুরুষের পিদ্দিমটা বেচনি? সত্যিই রেখে দিয়েছিলে নিজের কাছে? আমায়

পাট থেকে টাকা দিতে? গুল মের না, গণাদা, এখন তুমি মরে গেছ! স্বর্গে যাচ্ছ না কোথায় যাচ্ছ শালা কে জানে! কিন্তু মরে গেছ। মরে গিয়ে মিথ্যে বল না। তুমি রেখেছিলে পিদ্দিমটা? রেখেছিলে? বাজে কথা! ওটা রেখে কি হত তোমার? আমাদের বংশের কথা তুমি জানতে না। শুধু পুরনো বলে রেখে দিয়েছিলে? কেন? কবেকার শালা পুরনো মাল, বেচে দিলে দু' পয়সা আসে।.. মাইরি, বিশ্বাস করো গণাদা, আমি শালা পিদ্দিমের কথা জানতাম না। বাবা বলল। ও পিদ্দিমে আমার দরকার নেই, আমি শালা বেচেই দিতাম।...কিন্তু তুমি কেন রেখেছিলে? কি লাভ হল তোমার? যে মারবার সে মেরে বেচে দিয়েছে। তুমি শালা মাঝখান থেকে কলা চুষলে।...গণাদা, মাইরি গণাদা, আমরা তোমায় মারিনি। মেরেছি? আমাদের জন্যে তুমি মরলে? কেন মরলে? মানে লেগেছিল? সম্মানে লেগেছিল? আমাদের কাছে চোট্টা বনে গিয়ে সহ্য করতে পারনি! বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গিয়েছিল? তুমি মাইরি, আজব মাল! কেন যে এই পিদ্দিমটা রেখেছিলে কে জানে! ওটা গেল তো কি হল তোমার, তা বলে আফিং খাবে...? গণাদা, গণাদা, এই শালা গণাদা.. .

সূর্য যেন হঠাৎ আর কিছু দেখতে পেল না। সব ঝাপসা। আকাশ মাটি শ্মশান গাছ সমস্ত প্লাবিত করে কিসের যেন এক দুঃখের স্রোত বয়ে এল। সূর্য কাঁদবার আগে প্রাণপণে তার হাতের ঝুমঝুমি বাজিয়ে এই দুঃখকে অস্বীকার করতে চাইল, অবজ্ঞা করতে চাইল, উপহাস করতে চাইল। পারল না। ঝম্ ঝম্ ঝম্ ঝম্ শব্দটা হারিয়ে গিয়ে তার বুকফাটা ছেলেমানুষী কান্না গোঙাতে গোঙাতে বেরিয়ে এল।

ভাঙা গলায় সূর্য শেষবারের মতন চেঁচাল, "বল হরি, হরি বোল।"

কৃপাময়বাও আর গলা দিতে পারছিল না। শ্মশানটা সামনে। মাত্র কয়েক পা। শেয়ালের দল বটতলার অন্ধকার থেকে ডেকে উঠল। পেছনের লণ্ঠন কোথায় যেন হারিয়ে গেছে, সামনে খাঁ খাঁ শ্মশান। নবমীর চাঁদ আকাশ থেকে হেলে পড়ছিল।